সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

ভিক্টর কুজ্যাঁ প্রণীত

ফরাসী-গ্রন্থ হইতে

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

ভাষান্তরিত।

মূল্য ১৲ টাকা।

অবতরণিকা।

বঙ্গীয় পাঠকের নিকট, "সত্য-সুন্দর-মঙ্গল"-গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ ফরাসী-দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁর * কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, তাঁহার জীবনী ও দার্শনিক গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভিক্টর কুজ্যাঁ, একজন ঘড়ি-নির্ম্মাতার পুত্র। ইনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে পারী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, 'নর্ম্ম্যাল'-বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-বিভাগে দর্শনসম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। পরে, তিনি জর্ম্মান-ভাষা শিখিয়া, Kant-এর গ্রন্থ, Jakobi-র গ্রন্থ ও Scilling-এর "প্রকৃতির দর্শন" নামক গ্রন্থের অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে হেগেলের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন।

ফ্রান্সে রাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রবাহ কিছুকালের জন্য নিরুদ্ধ হয়। ১৮১৪-১৫ এই দুই বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স-রাজ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই সকল ঘটনার সময়ে তিনি রাজকীয় পক্ষ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ-পক্ষ গ্রহণ করিলেও তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। কিছুকাল পরে, উদারনীতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, 'নর্ম্ম্যাল'-বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাঁহার যে কর্ম্ম ছিল সেই কর্ম্ম হইতে তিনি বিচ্যুত হন। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার শাপে বর হইল। এই অবসরে, আরও সম্যক্‌রূপে দর্শনের অনুশীলন করিবেন মনে করিয়া তিনি জর্ম্মানদেশে যাত্রা করিলেন। ১৮২৪-২৫ এই সময়ে যখন তিনি বর্লিনে অবস্থিতি করিতেছিলেন,

---

* কুজ্যাঁর "জ" ইংরাজী z অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হইবে।

বাক্যালাপপ্রসঙ্গে অসাবধানে কোন একটা আইনবিরুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলায়, ফরাসী-পুলিসের অভিযোগে তিনি কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হন। ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইলেও, তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ফরাসী রাজসরকারের সন্দেহ-দৃষ্টি নিপতিত ছিল। যাহা হউক, দর্শন-ঘটিত তাঁহার নিজস্ব মতগুলি এই সময়ে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বেশ পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সমন্বয়বাদ, তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা, তাঁহার ইতিহাসের দর্শন, এই সকলের মূলতত্ত্ব ও খুটি-নাটিগুলি তিনি তাঁহার "দার্শনিক টুক্‌রা" নামক গ্রন্থে বিবৃত করেন (১৮৩৮)। "সত্য-সুন্দর-মঙ্গল," "লকের দর্শন," তাঁহার এই শেষ প্রণীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি—তিনি ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই একপ্রকার প্রতিসংস্করণ মাত্র।

তাঁহার "দার্শনিকটুক্‌রা" নামক গ্রন্থে, বিভিন্ন দর্শনের সংমিশ্রিত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল দর্শনের প্রভাব-বশে তাঁহার মতগুলি চরম পরিপক্কতা লাভ করে। কারণ, দার্শনিক মূলতত্ত্ব ও দার্শনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কুজ্যাঁ যেরূপ সমন্বয়বাদী ছিলেন, তাঁহার চিন্তাপ্রণালী ও দার্শনিক অভ্যাসও তদনুরূপ ছিল। এই "দার্শনিক টুক্‌রা" প্রকাশিত হইবার পর হইতেই তাঁহার খ্যাতির বিস্তার আরম্ভ হয়। ইহার পরেই তাঁহার দর্শনের ইতিহাস প্রকাশিত হয়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কুজ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার পর তিন বৎসর কাল, দর্শনের সর্ব্বোত্তম ব্যাখ্যাতা বলিয়া তিনি যার পর নাই সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি যে বিষয়ে উপদেশ দিতেন তাহার একটা মোটামুটি রেখাপাত করিয়া পরে তাহার খুটিনাটিগুলি সুপ্রণালীক্রমে ও বিশদরূপে পূরণ

করিয়া দিতেন। কি করিয়া আলোচ্য বিষয় ক্রমশ ফুটাইয়া তুলিতে হয়, বাড়াইয়া তুলিতে হয়, তাহার কৌশলটি তিনি বেশ জানিতেন। তাঁহার দার্শনিক ব্যাখ্যায়, পরিপুষ্ট পরিস্ফুট শব্দঝঙ্কৃত বাক্যবিভবের একটা অনর্গল প্রবাহ থাকিত। তাঁহার বাক্যপ্রয়োগের রীতিটিও বিশদ, সুললিত ও ওজস্বী। সমস্ত জিনিস একটা সাধারণ নিয়মের সামিল করিবার দিকে ফরাসী মানস-প্রকৃতির যেরূপ একটা প্রবণতা দেখা যায়, কুজ্যাঁর রচনার মধ্যেও সেইরূপ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দর্শনের ব্যাখ্যানকার্য্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ব্যাখ্যা-শক্তির সহিত তাঁহার কল্পনাশক্তি ছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ভাবে ছাত্রদিগকে সহজে অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন। তিনি যেরূপ দর্শনচর্চ্চার জন্য, বিশেষত দর্শনের ইতিহাস অনুশীলনের জন্য লোকের একটা রুচি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর পরে সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজসরকারের অনুগ্রহে তিনি ফ্রান্সের অভিজাত-শ্রেণীতে উন্নীত হন। অবশেষে ১৮[illegible] খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী তিয়েরের (Thiers) আমলে তিনি নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের পরিচালকের পদে নিয়োজিত হন ও কার্য্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহারই যত্নে, ফ্রান্সে লোকশিক্ষার সুব্যবস্থা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

তাঁহার জীবনের শেষদশায়, কোন এক গৃহের অন্তর্গত এক প্রস্ত কাম্‌রা ভাড়া করিয়া সাদাসিধাভাবে ও বিনা আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার এই আবাস-ঘরে, তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট লাই-ব্রেরী ছিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাধের গ্রন্থগুলি এই লাইব্রেরীতে রক্ষিত

হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কুজ্যাঁর দর্শনে তিনটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রণালী, তাঁহার প্রণালী-প্রসূত কার্য্যফল বা সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাসে বিশেষতঃ দর্শনের ইতিহাসে ঐ প্রণালী ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ। তাঁহার প্রণীত দর্শন সাধারণত সমন্বয়বাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা গৌণভাবে সমন্বয়াত্মক। সমন্বয়বাদ একটা বিশেষ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, নিষ্ফল হয়। কুজ্যাঁ নিজেই বলিয়াছেন, সেরূপ সমন্বয়বাদকে প্রকৃত সমন্বয়বাদ বলা যায় না, উহা দর্শনের একটা নিষ্ফল ও অন্ধ সংগ্রহ মাত্র। সমন্বয়-বাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা বিশেষ দর্শনপদ্ধতি আবশ্যক। তাঁহার মতে পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক দর্শন— ইহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

পর্য্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়—ইহাই তাঁহার দার্শনিক প্রণালী। কুজ্যাঁ বলেন, এই পর্য্যবেক্ষণপ্রণালীই, দর্শনের প্রকৃত প্রণালী। আমাদের আত্মচৈতন্য—যাহাতে অনুভবসিদ্ধ সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রকাশ পায়, সেই আত্মচৈতন্যক্ষেত্রে এই প্রণালী বিশেষরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই প্রণালীর প্রয়োগফলেই মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি। কি তত্ত্ববিদ্যা, কি মনো-বিজ্ঞান, কি ইতিহাসের দর্শন, সমস্তেরই প্রকৃত পত্তনভূমি মানসিক পর্য্যবেক্ষণ। কুজ্যাঁ বলেন, আত্মচৈতন্যে অনুভূত প্রত্যক্ষ তথ্যগুলি হইতেই বৈধ অনুমানের দ্বারা, দার্শনিক সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

মানসিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা, অন্তঃকরণের এই তিনটি তত্ত্ব

উপলব্ধ হয়। ইন্দ্রিয় বোধ, স্বৈচ্ছিকক্রিয়া বা স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা (Reason)। এই তিনটি ব্যাপার বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইলেও আত্ম-চৈতন্যে উহাদের পৃথক্ সত্তা নাই। ইন্দ্রিয়বোধ বা ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। উহাদের ক্রিয়া আমাদের নিজের উপর আরোপ করিতে পারি না। প্রজ্ঞার বিষয়গুলিও এইরূপ অবশ্যম্ভাবী (Necessary)। ইন্দ্রিয় বোধের ন্যায় প্রজ্ঞাও আমা-দের ইচ্ছা-সম্ভূত নহে। আত্মচৈতন্যের দৃষ্টিতে, আমাদের স্বেচ্ছা-মূলক ক্রিয়াগুলিই ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। ইচ্ছাবৃত্তিই আমার অন্তরস্থ "ব্যক্তি," আমার "আমি"। এই "আমি"ই আমাদের মানসিক জগতের কেন্দ্র, উহাকে ছাড়িয়া চৈতন্য অসম্ভব। আমা-দের সমস্ত চৈতন্য প্রজ্ঞার আলোকেই আলোকিত। এই প্রজ্ঞা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, ইন্দ্রিয়বোধকে উপলব্ধি করে, ইচ্ছাবৃত্তিকে উপলব্ধি করে। অতএব উক্ত তিন অবিচ্ছেদ্য মূল উপাদান লইয়াই আমাদের চৈতন্য। কিন্তু প্রজ্ঞাই আমাদের জ্ঞানের—এমন কি আত্মচৈতন্যেরও অব্যবহিত পত্তনভূমি।

প্রজ্ঞা সম্বন্ধীয় মতবাদটিই, কুজ্যাঁর দর্শনতন্ত্রের একটি মুখ্য বিশেষত্ব। তাঁহার মতে, মানসিক পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা যে প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করি, সেই চৈতন্যগত প্রজ্ঞার প্রকৃতি নির্ব্বি-শেষ, অর্থাৎ—অ-ব্যক্তিগত। আমরা উহার প্রবর্ত্তক নহি। উহার প্রকৃতি ব্যক্তিত্বধর্ম্মের ঠিক বিপরীত। উহা অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্ব-ভৌমিক। জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বগুলি মনো-বিজ্ঞানক্ষেত্রে স্বীকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা আবশ্যক যে, এই তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে অ-ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ। Kant তাঁহার মানসিক বৃত্তিসমূহের

বিশ্লেষণে, এই কথাটির উল্লেখ করেন নাই। কুজ্যাঁর বিশ্বাস, চৈতন্যপর্য্যবেক্ষণপদ্ধতির সাহায্যে, এই মুখ্য তত্ত্বটি দর্শনে সন্নিবেশ করিয়া, তিনি দর্শনের পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। স্বেচ্ছাশক্তিসম্পন্ন স্বাধীন আত্মার সম্বন্ধসূত্রেই প্রজ্ঞা বিষয়ীস্থানীয় বা ব্যষ্টিস্থানীয়। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিশেষ। ইহা বিশ্বমানবের অন্তর্ভূত কোন আত্মারই নিজস্ব নহে; এমন কি, বিশ্বমানবেরও নিজস্ব নহে। যথাযথরূপে বলিতে গেলে, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবই প্রজ্ঞার নিজস্ব। কেননা, প্রজ্ঞার নিয়মগুলি ব্যতীত, উভয়েরই উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সেই নিয়মগুলি কি? কুজ্যাঁর মতে, প্রজ্ঞার দুইটি মুখ্য নিয়ম;—এক কার্য্যকারণের নিয়ম; আর এক বস্তুসত্তার নিয়ম। এই দুই নিয়ম হইতে অন্য নিয়মগুলি প্রবাহিত হয়। এই দুই নিয়ম হইতে, একদিকে, আমরা একটি ব্যক্তিগত সত্তায় আসিয়া—স্বাধীন আত্মসত্তায় আসিয়া উপনীত হই। এবং অন্য দিকে অব্যক্তিগত "আমি-না"-তে আসিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিতে আসিয়া, একটি শক্তিজগতে আসিয়া উপনীত হই। মনোযোগের ক্রিয়া ও ঐচ্ছিকক্রিয়ার হেতু বা মূলপ্রবর্ত্তক যেরূপ আমরা নিজেকে মনে করি, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়বোধসমূহের হেতু আমার বাহিরে অবস্থিত এরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। তাই এই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আমার নিজের অস্তিত্বেরই ন্যায় বাস্তব ও নিশ্চিত বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়।

কিন্তু এই "আমি" ও "আমি-না" এই দুই শক্তি, পরস্পরের সম্বন্ধে সসীম—উভয়ই উভয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই দুই শক্তির সসীমতা হইতে আমরা একটি পরম কারণের ধারণায়—

অসীমের ধারণায় উপনীত হই। এই কারণটি আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, এবং এই কারণে উপনীত হইয়া আমাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়। এই কারণই ঈশ্বর। তিনি বিশ্বমানবের সহিত, বাহ্য জগতের সহিত, এই কারণসূত্রে আবদ্ধ। যে হিসাবে তিনি ঐকান্তিক কারণ, সেই হিসাবেই তিনি ঐকান্তিক বস্তু। কিন্তু সৃষ্টি করিবার শক্তি তাঁহার স্বরূপগত—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ মত দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বিশ্বব্রহ্মবাদী বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে এইরূপ বলেন :—"বাহ্যজগতের নিয়মাবলীকে ঈশ্বরের সহিত একীভূত করা, জগৎকে ঈশ্বরে পরিণত করা—ইহাই প্রকৃত বিশ্বব্রহ্মবাদ। কিন্তু আমি, আত্মা ও বাহ্যজগৎ এই সসীম কারণদ্বয়ের পার্থক্য এবং উভয়ের সহিত অসীম কারণের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই দুই সসীম কারণ—অসীম কারণের বিকার বা প্রকার-ভেদ মাত্র, এইরূপ Spinoza-র মত। কিন্তু আমার মত তাহা নহে। আমি বরং এই কথা বলি, উহারা স্বাধীন শক্তি, উহাদের ক্রিয়াশক্তি উহাদের আপনাদের মধ্যেই নিহিত। স্বাধীন সসীম-সত্তার সম্বন্ধে এইটুকু ধারণাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে, আমার মতে, এই দুই সসীম সত্তা সেই পরমকারণ-প্রসূত কার্য্য; উহারা পরম কারণের সহিত কার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। আমি যে ঈশ্বরের কথা বলি, সে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মবাদের ঈশ্বর নহেন, অথবা Eleacties সম্প্রদায় যেরূপ ঈশ্বরের ঐকান্তিক একতা প্রতিপাদন করিয়া বলেন যে, ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির বা বহুত্বের কোনপ্রকার সংস্রব থাকা অসম্ভব—আমার ঈশ্বর সেরূপ ঈশ্বরও নহেন। আমি যে ঈশ্বরের

প্রতিপাদন করি, সে ঈশ্বর ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল, তাঁহার সৃজনশীলতা অবশ্যম্ভাবী। স্পিনোজা ও ইনিয়্যকৃটিক্সদের ঈশ্বর বস্তুমাত্র। এইরূপ ঈশ্বরকে কোন অর্থেই কারণ বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের ক্রিয়া বা সৃষ্টিকার্য্য যদি তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে ত তিনি এই অবশ্যম্ভাবিতার অধীন। ইহার উত্তরে আমি বলি, প্রকৃতপক্ষে এই অধীনতা অধীনতাই নহে। ইহা স্বাধীনতার উচ্চতম রূপ। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা। ইহা চিন্তা-নিরপেক্ষ বা অচিন্তিত ক্রিয়াশীলতা। তাঁহার ক্রিয়া,—প্রকৃতি ও ধর্ম্মবুদ্ধির সংগ্রাম হইতে উৎপন্ন নহে। তিনি অসীমভাবে স্বাধীন। মানুষের বিশুদ্ধতম স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ক্রিয়াও ঐশ্বরিক স্বাধীনতার ছায়ামাত্র। ঈশ্বর স্বাধীনভাবে কার্য্য করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা যদৃচ্ছাসম্ভূত নহে; অথবা, অন্যরূপ কার্য্য করিলেও করিতে পারিতাম—এইরূপ বিকল্প-বুদ্ধিও তাঁহার কার্য্যে নাই। আমাদের ন্যায় তিনি চিন্তা করিয়া, কিংবা আমাদের ন্যায় ইচ্ছা করিয়া তিনি কাজ করেন না। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া, ইচ্ছাজনিত আয়াস ও কষ্ট হইতে যেরূপ বর্জ্জিত, অবশ্যম্ভাবিতার যান্ত্রিক ক্রিয়া হইতেও সেইরূপ বর্জ্জিত। আমাদের উপনিষদেও ঠিক্ এই কথাই আছে। উপনিষদ বলেন—"স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ", অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

তাঁহার মতবাদের উপর উপনিষদের কিছু প্রভাব ছিল কি না ঠিক্ বলা যায় না। তবে ভারতীয় দর্শনাদির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার নিম্নলিখিত বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়:—"ভারতের পুরাকীর্ত্তিস্বরূপ কাব্য দর্শনাদি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে এত তত্ত্ব—এত গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় এবং

য়ুরোপীয় প্রতিভা যেখানে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে সেই সব সিদ্ধান্তের ক্ষুদ্রতার সহিত তুলনা করিয়া এতটা তফাৎ মনে হয় যে, আমরা প্রাচ্য প্রতিভার সম্মুখে নতজানু হইতে বাধ্য হই, এবং দেখিতে পাই এই মানবজাতির আদিম নিবাসই উচ্চতম দর্শনের জন্মভূমি।”

তাঁহার সমন্বয়বাদের অর্থ এই যে, তিনি মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি দর্শনের ইতিহাসে প্রযোগ করিয়াছেন। চৈতন্যোপলব্ধ তথ্য সকলের সহিত, সকল প্রকার দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ-গুলি মিলাইয়া, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছেন তাহা এই :— প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দর্শনে যে সকল মানসিক ব্যাপার ও তত্ত্বের কথা আছে তাহা সত্য হইলেও, চৈতন্যে যে কেবল ঐগুলিই অবস্থিত এরূপ বলা যায় না; কিন্তু তাঁহাদের মতে, কেবল ঐগুলিই চৈতন্যেকে অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং প্রত্যেক দর্শন একেবারেই মিথ্যা নহে, পরন্তু অসম্পূর্ণ। এই দর্শনগুলিকে সম্মিলিত করিলে, চৈতন্যের সমগ্রতার অনুরূপ একটি সমগ্র দর্শন সংগঠিত হইতে পারে। কেহ কেহ অজ্ঞানবশত মনে করেন, এইভাবে দর্শন রচিত হইলে কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ মাত্র হইরে, তাহার অধিক নহে। কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। প্রত্যেক দর্শনের মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা কিছু অসম্পুর্ণ তাহা বাদ দিয়া, তাহার সত্যাংশকে সম্পূর্ণ ক রয়া তুলিয়া এইরূপ দর্শনের দ্বারা, একটি অখণ্ড সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

কুজ্যাঁর একজন ঘোরতর প্রতিপক্ষ Sir William Hamilton কুজ্যাঁর সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ;—ভিক্টর কুজ্যাঁ একজন সুগভীর ও মৌলিক তত্ত্বদর্শী, একজন প্রাঞ্জলতাগুণবিশিষ্ট বাগ্‌বিভবসম্পন্ন সুলেখক; কি প্রাচীন, কি অর্ব্বাচীন উভয়-

কালের বিদ্যাতেই সুপণ্ডিত। দেশ, কাল, সম্প্রদায়, ও ব্যবসায়গত সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এইরূপ একজন দার্শনিক; এবং যাঁহার সমুন্নত সমন্বয়বাদ, সর্ব্বত্র সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, অতীব বিরুদ্ধ পক্ষীয় দর্শনের মধ্যেও সত্যের অখণ্ডতার সন্ধান পাইয়াছে।”

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড

সত্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

সুন্দর।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।

প্রথম খণ্ড।

সত্য।

প্রথম উপদেশ।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের সত্তা।

শুধু আজ বলিয়া নহে, সর্ব্বকালেই মনুষ্যগণ দুইটি তত্ত্বের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া আসিতেছে।

এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটি অধিকতর প্রবল ও দুরতিক্রমণীয়। সেটি কি?—না, কতকগুলি ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় মূলতত্ত্ব, যাহা কালের উপর নির্ভর করে না, স্থানের উপর নির্ভর করে না, অবস্থার উপর নির্ভর করেনা, এবং যাহা মানব-চিত্তের অসীম বিশ্বাস ও বিশ্রামের স্থল। যে কোন বিষয়েরই গবেষণা হউক, যতক্ষণ শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অসম্বদ্ধ তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যতক্ষণ সেই তথ্যগুলিকে কোন-একটা মূলতত্ত্বে উপনীত করা না যায়, ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞানের সামিল হয় না—তাহা বিজ্ঞানের উপকরণ মাত্র।

এমন কি, ভৌতিক বিজ্ঞান তখনি আরম্ভ হয়, যখন আমরা প্রকৃতির রাজ্যে নানা তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই সকল তথ্যকে কতকগুলি নিয়মের সঙ্গে বাঁধিয়া দিই। প্লেটো বলিয়াছেন:—"শুধু ঘটনা লইয়া বিজ্ঞান হয় না।"

এই-ত গেল আমাদের প্রথম আবশ্যকতা। আর একটি তত্ত্বেরও আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিয়া থাকি;—উহাও প্রথমটির ন্যায়

বৈধ। যাহাতে আমরা মনঃকল্পিত কতকগুলি খেয়ালের দ্বারা,—নিপুণ অথচ কৃত্রিম কতকগুলি যোগাযোগের দ্বারা প্রবঞ্চিত না হই, যাহাতে বাস্তবের উপর—প্রত্যক্ষ অনুভব ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করিতে পারি, এরূপ কোন একটি তত্ত্বেরও আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ভৌতিক বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও বিজয়কীর্ত্তি সন্দর্শনে অজ্ঞ জনের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; তাহারা জানে না, এই উন্নতি পরীক্ষা-প্রয়োগ-পদ্ধতিরই ফল। অধুনা, এই পদ্ধতিটি এতটা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাকে এতটা অতিরিক্ত সীমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, যদি কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই পদ্ধতিটি অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র মনোযোগ করা হয় না।

পর্য্যবেক্ষণ ও প্রজ্ঞাকে একত্র মিলিত করা,—কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে অভিলাষী হইলে, সেই বিজ্ঞানের আদর্শকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে না দেওয়া, এবং পরীক্ষার পথে উহাকে অনুসন্ধান ও লাভ করা—ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা।

গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি তাহা এক্ষণে স্মরণ কর:—কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে ইহা কি সিদ্ধ হয় নাই যে, জ্ঞানী-অজ্ঞান-নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে এরূপ কতকগুলি জ্ঞান, ধারণা, প্রতীতি, মূলতত্ত্ব আছে যাহা—ঘোর সংশয়বাদী মুখে অস্বীকার করিলেও, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ও ব্যবহারকে নিয়মিত করে? একটু আত্ম-জিজ্ঞাসা করিলেই এইগুলি প্রত্যেকেরই অন্তরে অনুভূত হইবে। এমন কি, অতীব গ্রাম্য ইতর জনেরাও নিজ নিজ পরীক্ষায় এইগুলি উপলব্ধি করিয়া থাকে। এইগুলি শুধু যে পরীক্ষার সীমার মধ্যেই বদ্ধ তাহা নহে—ইহা পরীক্ষাকেও অতিক্রম করে—পরীক্ষার উপর

কর্ত্তৃত্ব করে। বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার-সমূহের মধ্যে থাকিয়াও এইগুলি সার্ব্বভৌমিক,—ইহা বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; আগন্তুক ব্যাপারের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও, এগুলি নিত্য ও অপরিহার্য্য; আমরা স্বয়ং আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ হইলেও, আমাদের সমক্ষে এগুলি অসীম ও নিরপেক্ষ বলিয়া উপলব্ধি হয়। আমি তোমাদের সম্মুখে পরস্পর-বিরুদ্ধ কতকগুলা দুর্ব্বোধ কথা উপস্থিত করিতেছি না, আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা আমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উপদেশেরই সিদ্ধান্ত ফল।

সকল বিজ্ঞানেরই মূলে কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব যে আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শন করিতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

ইহা-ত স্পষ্টই পড়িয়া আছে—এমন কোন গণিত শাস্ত্র নাই যাহার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র নাই—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণা নাই—অর্থাৎ যাহার কতকগুলি নিরপেক্ষ মূলতত্ত্ব নাই।

যাহা চিন্তার গণিত সেই ন্যায়শাস্ত্রের দশা কি হয় যদি আমরা তাহা হইতে কতকগুলি মূলসূত্র সরাইয়া লই—সেই সব সূত্র যাহা সকল যুক্তি ও সকল সিদ্ধান্তের মূলীভূত।

কোন ভৌতিকবিজ্ঞান কি সম্ভব হইত, যদি তৎসংক্রান্ত তাবৎ ঘটনা ও ব্যাপারের মূলে কোন-একটা হেতু কিম্বা নিয়ম না থাকিত?

চরম হেতু-রূপ কোন মূলতত্ত্ব না থাকিলে, শারীরবিজ্ঞান কি একপদও অগ্রসর হইতে পারিত? তাহা হইলে কি আমরা কোন-একটি দেহ-যন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিতাম—কোন দৈহিক যন্ত্রের প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিতাম?

যে মূলতত্ত্বের উপর সমগ্র ধর্ম্মনীতি নির্ভর করে—যাহার উপর সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহাও কি এই প্রকৃতির নহে ?

স্থান-কাল-নির্ব্বিশেষে, নীতিবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই কি এই সকল মূলতত্ত্বের শাসনাধীন নহে ? নীতিবোধ-বিশিষ্ট এমন কোন জীব কি কল্পনা করিতে পার যাহার বিবেক-বুদ্ধি এই কথা বলে না যে,—অন্তরের রিপুদিগকে প্রজ্ঞার অধীনে রাখা কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, স্বার্থের প্রবল প্ররোচনা সত্ত্বেও, যে বস্তু আমার নিকট কেহ বিশ্বাস পূর্ব্বক গচ্ছিত রাখিয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য ?

এ সমস্ত দার্শনিকদিগের কুসংস্কার কিম্বা ন্যায়বাগীশদিগের কতকগুলি শাস্ত্রীয় বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। অতিসামান্য জ্ঞানেও ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যদি আমি তোমাকে বলি, একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, অমনি কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর না,—কোথায় হইয়াছে, কাহা-কর্তৃক হইয়াছে এবং কেন হইয়াছে ? তাহার তাৎপর্য্য এই:—কাল, স্থান, হেতু-ঘটিত—এমন কি, চরম হেতু-ঘটিত এমন কতকগুলি মূলতত্ত্ব তোমার অন্তরে নিহিত আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সকল মূলতত্ত্ব দ্বারা চালিত হইয়াই তোমার মন এইরূপ জিজ্ঞাসায় তোমাকে প্রবৃত্ত করে।

যদি আমি বলি, কোন প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার কিম্বা উচ্চাকাঙ্খা এই হত্যাকাণ্ডের হেতু,—তুমি কি তৎক্ষণাৎ, কোন প্রেমিক কিংবা কোন উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তির কল্পনা কর না ? তাহার তাৎপর্য্য এই;—তুমি জান, কোন কর্ত্তাভিন্ন কোন কার্য্য নাই,—কোন বস্তুভিন্ন কিংবা বাস্তবিক সত্তাভিন্ন কোন গুণ নাই, কিংবা কোন ঘটনা নাই। যদি আমি তোমাকে বলি, ঐ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ

বলিতেছে যে, তাহার অভ্যন্তরস্থ যে ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের কল্পনা করিয়াছিল, সঙ্কল্প করিয়াছিল, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল সে এক ব্যক্তি নহে,—সময়ান্তরে তাহার ব্যক্তিত্ব অনেকবার নবীকৃত হইয়াছে, তাহা হইলে—সে যদি অকপট-ভাবে এই কথা বলিয়া থাকে —তাহাকে কি তুমি পাগল বলিবে না? এবং যদিও তাহার বিবিধ কার্য্য ও অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, তবু কি তুমি তাহাকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া অবধারিত করিবে না?

মনে কর, যদি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ সাফাই করিবার জন্য এইরূপ বলে :—আমি নিজ সুখের জন্য এই হত্যা করিয়াছি; তা ছাড়া, এই নিহত ব্যক্তি এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে তাহার জীবন তাহার পক্ষে ভার-স্বরূপ হইয়াছিল; ইহাতে দেশেরও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কেননা একজন অকর্ম্মা নাগরিকের পরিবর্ত্তে, এমন একজন লোক পাওয়া যাইতেছে যে দেশের অধিকতর কাজে আসিতে পারে; তা ছাড়া, এক ব্যক্তির অভাবে সমস্ত মনুষ্যজাতি কিছু-আর নষ্ট হয় না, ইত্যাদি। এই সকল যুক্তির প্রত্যুত্তরে, তুমি কি সহজভাবে শুধু এই কথা বল না যে—সম্ভবতঃ সেই হত্যাকারীর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ড সুবিধাজনক, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য এবং সেই হেতু কোন ব্যপদেশেই এই হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন করা যাইতে পারে না।

যে বুদ্ধির দ্বারা কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়, সেই একই বুদ্ধির দ্বারা - কোন্‌গুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী নহে, কোন্‌গুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থাৎ ন্যূনাধিক স্থলে প্রযুক্ত হয় মাত্র—তাহাও নির্ণীত হইয়া থাকে।

একটা ব্যাপক সত্যের দৃষ্টান্ত দিইঃ যথা—রাত্রির পর দিন

আইসে। কিন্তু এ সত্যটি কি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী? ইহা কি সর্ব্বদেশে বিস্তৃত?—হাঁ, আমাদের বিদিত সর্ব্বদেশেই বিস্তৃত। কিন্তু যত প্রকার দেশ সম্ভবত থাকিতে পারে—সমস্ত দেশেই কি ইহা বিস্তৃত?—না; যেহেতু, অন্য কোন জগতের বিধানানুসারে এমন কোন দেশও আমরা কল্পনা করিতে পারি যাহা চির-নিশায় নিমজ্জিত। যে জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর তাহার নিয়মগুলি আমরা যেমনটি দেখি তাহাই, তাহার অধিক নহে; তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে। ঐ সকল নিয়মের যিনি প্রণেতা, তিনি অন্য নিয়মও নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। জগতের অন্য কোন বিধানানুসারে অন্য প্রকার ভৌতিক ব্যাপারেরও কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্য প্রকার গণিততত্ত্ব কিংবা অন্য প্রকার নীতিতত্ত্বের কল্পনা করা যায় না। তেমনি, রাত্রি ও দিবসের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে সম্বন্ধ স্থল-বিশেষে নাও থাকিতে পারে—এরূপ কল্পনা করা অসম্ভব নহে। অতএব, রাত্রির পর দিন আইসে—এই যে সত্য, ইহা একটি ব্যাপক সত্য—সম্ভবতঃ সার্ব্বভৌমিক সত্য; তাই বলিয়া, ইহা অবশ্যম্ভাবী সত্য নহে।

মন্টেস্কুয় বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা গ্রীষ্ম দেশের ফল নহে"। মানিলাম উত্তাপে আত্মা নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে,—উষ্ণ দেশে স্বাধীন শাসনতন্ত্র পরিচালন করা কঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও হইতে পারে না। বাস্তবপক্ষেও কতকগুলি ব্যতিক্রম-স্থল আছে। অতএব এই নিয়মটিও একেবারে সার্ব্বভৌমিক নহে, এবং ইহার অবশ্যম্ভাবিতাও আরো কম। কিন্তু এইরূপ ভাবে তুমি কি কারণতত্ত্বের কথা বলিতে পার? কোনো স্থানে কিংবা কোন কালে, তুমি কি এমন

কোন ব্যাপার কল্পনা করিতে পার যাহা কোন ভৌতিক কিংবা নৈতিক কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে ?

যদি কল্পনা-বলে জগতের সমস্ত সত্তা ধ্বংস করিয়া, সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শুধু একটি মনকে অধিষ্ঠিত রাখা যায়, আর সেই মনের বৃত্তিগুলিকে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, সেই মনের মধ্যে কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব নিবিষ্ট করিতে আমরা বাধ্য হই।

এই সকল মূলতত্ত্বের ভিত্তিকে টলাইবার জন্য এবং উহাদের কার্য্য-প্রসর কমাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাবাদিরা কতই চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু সেই চেষ্টা যে বৃথা চেষ্টা হইয়াছে তাহা আমরা কতবার দেখাইয়াছি। প্রত্যক্ষবাদিরা কি বলেন শুনা যাক্।

যাহাকে আমরা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী বলি সেই কারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন—ইহা মনের একটা আভ্যাস-মাত্র। তাঁহারা বলেন—প্রকৃতি-রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই, একটা ঘটনা আর একটা ঘটনাকে অনুসরণ করে, এবং এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের মন, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে; এই সম্বন্ধকেই আমরা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বলি। এইরূপ ব্যাখ্যা, শুধু যে কারণের মূলতত্ত্বকে উচ্ছেদ করে তাহা নহে, কারণ-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে তাহারো মূলোচ্ছেদ করে! মনে কর দুইটি গোলা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। একটি চলিতে আরম্ভ করিল; তাহার পরেই আর একটি চলিল। এইরূপ পারম্পর্য্য যখন সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকে, তখন সেই পারম্পর্য্যের সহিত নিত্যতার যোগ হয় এইমাত্র। অল্পমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমরা যে কারণ-শক্তির পরিচয় পাই, পূর্ব্বোক্ত পারম্পর্য্যের

দ্বারা সেই কারণশক্তি-সম্ভূত কার্য্য-কারণের বিশেষ সম্বন্ধটি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যিনি আত্মমতের সুসঙ্গতি বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সেই পরীক্ষাবাদী হিউমও এই কথা সহজেই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, কোনো প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দ্বারা, বৈধভাবে কারণ-তত্ত্বের ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

কারণ-জ্ঞান-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ঐ জাতীয় অন্যান্য জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে।

অন্ততঃ, বস্তুত্ব ও একত্ব-জ্ঞানের উদাহরণ এইখানে দেওয়া যাউক।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, শুদ্ধ কতকগুলি গুণ ও ঘটনামাত্র আমরা উপলব্ধি করি। আমরা বিস্তৃতি স্পর্শ করি, বর্ণ দর্শন করি, গন্ধ আঘ্রাণ করি। কিন্তু বিস্তৃত, রঞ্জিত, গন্ধিত বস্তুকে কি আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে? এই বিষয়ে হিউম একটু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোঠায় বস্তু-জ্ঞানকে ফেলিতে পারা যায়? তবে, তাঁহার মতে– তাঁহার পরীক্ষাবাদ-অনুসারে, এই বস্তুজ্ঞানটি কি?—কারণ-জ্ঞানের ন্যায় ইহাও একটা বিভ্রম মাত্র। একত্বের জ্ঞানও আমরা ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রাপ্ত হই না। কেননা একতা কি?—না,—তাদাত্ম্যতা, অ-বহুলতা; পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে যাহা কিছু প্রকাশ পায় তৎসমস্তই, পারম্পর্য্য-বিশিষ্ট—সমস্তই, যৌগিক। কোন কারুকার্য্যের মধ্যে যে একতা দৃষ্ট হয় উহা কারু-কার্য্য-সম্ভূত, মানব-মনের রচনা-সম্ভূত। কোন পদার্থের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা অঙ্গ-সংস্থানের একতা। জ্ঞান-মূলক ও নীতি-মূলক একতা কেবল আত্মারই গ্রাহ্য—উহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, যদি সামান্য ধারণাগুলিরই ব্যাখ্যা না হয়, তবে

ঐ ধারণা-সমূহের মধ্যে যে মূলতত্ত্ব নিহিত—যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী—তাহার ব্যাখ্যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হওয়া ত আরো অসম্ভব। "এই একটী তথ্য, ঐ আর একটি তথ্য"—এইরূপ বিশেষ-ভাবেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যে মূলতত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক তাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। অমুক অমুক তথ্যটি কি?—প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা শুধু তাহারই পরিচয় দেয়; কিন্তু, "উহা না হইলেই নয়", "উহার না হওয়াটা অসম্ভব"—এবম্বিধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা পৌঁছিতে পারে না।

আর একটু বেশি দূরে যাওয়া যাক্। পরীক্ষাবাদ, শুধু যে সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে না তাহা নহে; আমরা আরো এই কথা বলি, এই সব মূলতত্ত্বকে ছাড়িয়া, পরীক্ষাবাদ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

কারণের মূলতত্ত্বকে উঠাইয়া লও—দেখিবে, মানব-মন আপনা হইতে ও আপনার বিকারগুলি-হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না। ঐ ইন্দ্রিয়বোধগুলির কারণ কি, অথবা উহার কোন কারণ আছে কি না তাহা শ্রবণ আঘ্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, স্পর্শ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা জানিতে পারিবে না। কিন্তু এই কারণতত্ত্বকে মানব-মনে আবার প্রতিষ্ঠিত কর,—স্বীকার কর যে, প্রত্যেক আবির্ভাব, প্রত্যেক পরিবর্ত্তন, প্রত্যেক ঘটনার ন্যায়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বোধেরও একটা কারণ আছে, (কেননা ইহা-ত স্পষ্টই দেখা যায়, আমাদের কতকগুলি অনুভূতির কারণ আমরা নিজে নহি—অবশ্যই তাহার অন্য কারণ আছে)—তাহা হইলে, এমন কোন কারণে তুমি স্বভাবত উপনীত হইবে যাহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র। বাহ্যজগতের ধারণা প্রথমে এইরূপেই আমাদের মনে উদয় হয়। কারণ-সমূহের এই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব হইতেই

আমরা বাহ্য জগতের সত্তা উপলব্ধি করি এবং এই ধারণাটিও উক্ত মূলতত্ত্বের দ্বারাই সমর্থিত হইয়া থাকে। তবে-কিনা, ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মূলতত্ত্বও এই ধারণাটিকে আরো পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলে।

আমি জিজ্ঞাসা করি—যখনি তুমি জানিলে, কতকগুলি বাহ্যবস্তু আছে,তখনি তোমার মনে হয় কি না—সেই সকল বস্তু কোন-না-কোন স্থান অধিকার করিয়া আছে? তাহা যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহা হইলে, কোনো বস্তু কোনো স্থানে যে অবস্থিতি করে ইহাও তোমাকে অস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে এমন একটা ভৌতিক সত্যকে তোমার অস্বীকার করিতে হয়—যাহা মনোবিজ্ঞানেরও একটি মূলতত্ত্ব—যাহা সাধারণ জ্ঞানেরও একটি মূলসূত্র। কিন্তু, কোন বস্তু যেখানে থাকে, অনেক সময় সেইস্থানটিও একটা বস্তু—কেবল প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এই মাত্র। এই নূতন বস্তুটিও আবার আর একটা স্থানে অধিষ্ঠিত। এই যে নূতন স্থান ইহাও কি একটা বস্তু? যদি বস্তু হয়, এই বস্তুটিও আর একটি স্থানে অধিষ্ঠিত যাহা অপেক্ষাকৃত আরো বৃহৎ;—এইরূপ পরপর। এইরূপে তোমার মন একটা অসীম ও অনন্ত স্থানের ধারণায় উপনীত হয়—যাহার মধ্যে, সমস্ত সসীম স্থান ও সমস্ত বস্তু সন্নিবিষ্ট। এই অসীম ও অনন্ত স্থানই আকাশ॥

ইহা-ত অতি সহজ কথা। দেখ—এই জল যে এই জল-পাত্রের মধ্যে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? এই জল-পাত্রটি যে একটা ঘরের মধ্যে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? এই ঘরটি যে আর একটি বৃহত্তর স্থানে আছে তাহা কি তুমি অস্বীকার কর? আর সেই বৃহৎ স্থানটিও যে আর একটা বৃহত্তর স্থানের অন্তর্গত তাহা কি তুমি অস্বীকার কর?—এইরূপে তোমাকে আমি অনন্ত আকাশ-

পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারি। উক্ত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে তুমি যদি একটা প্রতিজ্ঞা অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে সমস্ত প্রতিজ্ঞাই অস্বীকার করিতে হয়। যদি প্রথমটিকে স্বীকার কর, তাহা হইলে শেষটিকেও স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য হইবে।

যাহা হইতে গোড়ায় বস্তুজ্ঞানই উৎপন্ন হয় না—শুধু সেই ইন্দ্রিয়-বোধ কি করিয়া তোমাকে আকাশের ধারণায় উপনীত করিবে? অতএব দেখা যাইতেছে, এস্থলেও একটা উচ্চতর মূলতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক।

যেমন আমরা বিশ্বাস করি, বস্তুমাত্রই একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেইরূপ আমরা বিশ্বাস করি, ঘটনামাত্রই কোন-না-কোন সময়ে সংঘটিত হয়। এমন কোন ঘটনা কি কল্পনা করিতে পার যাহা কোন কালাংশেরই অন্তর্গত নহে? তোমার মানস-চক্ষে, এই কালের স্থায়িত্ব পর-পর প্রসারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অবশেষে আকাশের ন্যায় কালকেও অসীম বলিয়া তোমার উপলব্ধি হয়। কালকে যদি তুমি অস্বীকার কর,—যে সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র কালের পরিমাপক, সেই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রকেও তোমার অস্বীকার করিতে হয়; যে সকল স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর মানব-জীবন বিশ্রাম করে, সেই সকল বিশ্বাসকেও তোমার উচ্ছেদ করিতে হয়। যে দুইটি মূলতত্ত্ব বাহ্যজগৎ-জ্ঞানের অন্তর্নিহিত ও সহজাত সেই আকাশ ও কালের ধারণা কেবল ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

তাই, পরীক্ষাবাদীরাও বেশ বুঝিয়াছেন,—এরূপ কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব আছে যাহা অপরিহার্য্য, অথচ পরীক্ষাবাদ যাহার ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ।

এইখানে থামা যাক্ঃ—আমরা তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত

যাহা কিছু নির্ণয় করিয়াছি, হয় তাহা আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত হইয়াছে, নয় আমরা এইটুকু নিশ্চিত জানিয়াছি—মানব চিত্তে এরূপ কতকগুলি মূলতত্ত্ব বস্তুতই মুদ্রিত রহিয়াছে যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী।

কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সত্তা সপ্রমাণ ও সমর্থন করিয়া আমরা এক্ষণে এই-প্রকৃতির মূলতত্ত্ব মানবজ্ঞানের সকল বিভাগেই অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, এবং খুব যথাযথভাবে এই মূলতত্ত্বগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেও চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু কতকগুলি প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে—তাহাতে ভয় হয় পাছে বহুমূল্য ধ্রুব তত্ত্বের সহিত কতকগুলি অপ্রমাণিত অনুমান মিশ্রিত করিয়া সেই তত্ত্বগুলির মর্য্যাদা লাঘব করি। ঐরূপ শ্রেণীবন্ধনে তত্ত্ববিদ্যা আপাততঃ খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিবে বটে, কিন্তু প্রাজ্ঞ-জনের চক্ষে উহার প্রামাণিকতা কমিয়া যাইবে। ক্যাণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, গত বৎসরে আমারাও তোমাদের সমক্ষে, মূলতত্ত্বগুলির শ্রেণীবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; যে সকল মূলতত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি এবং যে সকল ধারণা সেই সকল মূলতত্ত্বের অনুবন্ধী—সেই সকল মূলতত্ত্ব ও ধারণার সংখ্যা কমাইতেও চেষ্টা পাইয়াছিলাম। এই কার্য্যের গুরুত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলেও, এস্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। একটা মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী-প্রতিভার সহিত যে মতবাদ মিশ খায়, সেই মতবাদকে যাহাতে সুদৃঢ় ও সারবান্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহাই আমাদের চেষ্টা। এই হেতু, যাহা কিছু ব্যক্তিগত ও অনিশ্চয়াত্মক তাহা আমরা পরিহার করিব। কনিংসবর্গের দার্শনিক ক্যাণ্ট,

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব-সমূহের যে শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন তাহার পরীক্ষা ও বিচার করিতে আমরা চাহি না; আমরা এই সকল মূলতত্ত্বের প্রকৃতির অভ্যন্তরে আরো অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চাহি; আমাদের কোন্ বৃত্তি এই সকল মূলতত্ত্বকে প্রকাশ করে—কোন্ বৃত্তির সহিত উহাদের যোগ আছে তাহাই তোমাদের নিকট দেখাইতে চাহি।

এই মূলতত্ত্বগুলির বিশেষত্ব এই,—চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারি, এই মূলতত্ত্বগুলি আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা উহাদিগকে উৎপাদন করিতে পারি না—আমরা উহাদের জন্মদাতা নহি। আমরা উহাদিগকে মনে ধারণা করি, কার্য্যে প্রয়োগ করি, কিন্তু উৎপাদন করি না। আমাদের সাক্ষীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। যেমন আমি কোন বস্তু নিজ বলে সঞ্চালিত করিয়া বুঝিতে পারি—আমিই ঐ গতিক্রিয়ার কারণ, সেইরূপ, জ্যামিতিক লক্ষণাগুলির কারণ আমি স্বয়ং—এইরূপ কি আমার প্রতীতি হয়? যদি আমরাই এই লক্ষণাগুলি প্রণয়ন করিয়া থাকি, তাহা হইলে উহা ত আমাদের নিজস্ব ধন। তাহা হইলে আমরা উহাদিগকে ভাঙ্গিতে পারি, বিকৃত করিতে পারি, পরিবর্ত্তন করিতে পারি, এমন কি, উচ্ছেদ করিতেও পারি। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, আমরা তাহা পারি না। তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা উহাদের উৎপাদক নহি। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে,—যে-ইন্দ্রিয়বোধ পরিবর্ত্তনশীল, সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্ব কখনই উৎপন্ন অথবা সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এই অপরিহার্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই:—মূলতত্ত্বগুলি আমাতে আছে কিন্তু আমার নহে। আর যেমন ইন্দ্রিয়-

বোধ বাহ্যজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেইরূপ আর কোন চিত্তবৃত্তি, সেই মূলতত্ত্ব-সমূহের সহিত আমাদের যোগ নিবদ্ধ করে ;—সেই সকল মূলতত্ত্ব, যাহা বাহ্যজগতের উপরেও নির্ভর করে না, আমার নিজের উপরেও নির্ভর করে না। সেই চিত্তবৃত্তিটি কি ?—না, প্রজ্ঞা।

মানব-অন্তঃকরণে তিনটি সাধারণ বৃত্তি আছে, যাহা পরস্পর বিমিশ্রিত—যাহা প্রায় একসঙ্গেই কাজ করে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য, উহাদিগকে আমরা বিশ্লেষণ করি, বিভাগ করি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা জানি,—উহাদের ক্রিয়া একসঙ্গেই সম্পাদিত হয়—উহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ-বন্ধন আছে—অবিভাজ্য একতা আছে। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রথম ধর্ত্তব্য—কর্ত্তৃশক্তি ;—ইচ্ছাধীন ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনী শক্তি। ইহার দ্বারাই মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে প্রকটিত হয় ; এবং ইহার অভাবে, অন্যান্য বৃত্তিগুলি না-থাকার সামিল হইয়া পড়ে ; কেন না, তাহা হইলে, আমাদের নিজত্বই থাকে না। যে মুহূর্ত্তে, আমাতে কোন ইন্দ্রিয়বোধ প্রকাশ পায়, সেই মুহূর্ত্তের অবস্থাটি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে—একটু মনঃসংযোগ না করিলে, কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মনের এই কর্ত্তৃশক্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি যে মুহূর্ত্তে রহিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অবসান হয়। সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছিত অবস্থার কথা আমাদের স্মরণ হয় না ; কারণ, সে সময়ে আমাদের কর্ত্তৃশক্তি স্তম্ভিত থাকে, - কাজেকাজেই আত্মচৈতন্য অন্তর্হিত হয়—কাজেকাজেই স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। এমন কি, অনেক সময়ে, রিপুর আবেগ বশতঃ, যখন আমাদের স্বাধীনতা চলিয়া যায়,—যখন আমাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না,—সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়—তখন আমরা কি

করিয়াছি, কিছুই জানিতে পারি না। এই কর্তৃশক্তি—এই স্বাধীনতা থাকাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই স্বাধীনতা থাকা প্রযুক্তই, মনুষ্য আপনাকে সংযত করে, নিয়মিত করে, শাসিত করে। এই স্বাধীনতা—এই কর্ত্তৃশক্তির অভাবে, মানুষ আবার প্রকৃতির বশীভূত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই অংশটি যেরূপ শ্লাঘ্য ও সুন্দর, এরূপ আর কোন অংশই নহে। কিন্তু যেমন একদিকে, আমাদের কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা আছে, তেমনি আবার অন্য বিষয়ে আমরা পরাধীন,—আমরা বাহ্য জগতের নিয়মাধীন। এস্থলে আমি কর্ত্তা নই—আমি ভোক্তা। আমি আমার সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নই—আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করি মাত্র। আমার অন্তরে, কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা, কতকগুলি বাসনা, কতকগুলি প্রবৃত্তি নিয়ত উত্থিত হইতেছে বলিয়া আমি অনুভব করি, কিন্তু আমি উহাদের জন্মদাতা নহি। আমি ইচ্ছা না করিলেও, উহারা স্বতঃ উত্থিত হইয়া আমার জীবনকে সুখ-দুঃখে পূর্ণ করে।

ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধ—এই দুইটি ছাড়া আমাদের আর একটি বৃত্তি আছে;—সেটি, জ্ঞানবৃত্তি—বুদ্ধিবৃত্তি—প্রজ্ঞা। (যে নামেই অভিহিত হউক না, তাহাতে কিছু যায়-আসে না) এই বৃত্তির দ্বারা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর এমন কতকগুলি সত্যকে উপলব্ধি করি;—যাহা প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে নিহিত বলিয়া অনুমিত হয়—যাহা জ্ঞানক্রিয়ার সহিত অনুবদ্ধ—যাহা ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব ও ইচ্ছা-সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এবং এই বৃত্তির দ্বারাই সেই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বগুলিকেও আমরা উপলব্ধি করি। *

---

* আমার প্রদত্ত এই সকল উপদেশের পূর্ব্বে মানব-চিত্তবৃত্তির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। আজ-কাল এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ অবলম্বিত হইয়াছে। আজ-কাল এই ভিত্তির উপরেই আধুনিক অধ্যাত্মবিদ্যা স্থাপিত।

ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধ ও প্রজ্ঞা—এই তিন বৃত্তি এক্ষণে নিশ্চিত-রূপে অবধারিত হইয়াছে। যে সকল মূলতত্ত্বের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি চালিত হয়—সেই মূলতত্ত্বের সত্তা, এবং ইন্দ্রিয়বোধ ও ইচ্ছাশক্তির সত্তা—এই তিনেরই সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষীচৈতন্য সাক্ষ্য দেয়। আমাদের পর্য্যবেক্ষার মধ্যে যাহা কিছু আসিয়া পড়ে, তৎসমস্তই আমরা বাস্তবিক বলিয়া অভিহিত করি। আমরা যে সুখ দুঃখ ভোগ করি সেই সুখ দুঃখের ভোগও বাস্তবিক, কেন না উহা আমাদের আত্মচৈতন্যের বিষয়ীভূত। আমাদের ইচ্ছাশক্তি-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অথবা প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও, এবং যে সকল মূলতত্ত্বের দ্বারা এই প্রজ্ঞা প্রকাশিত সেই মূলতত্ত্বের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। অতএব আমরা এইরূপ প্রতিপাদন করিতে পারি যে, সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সত্তা, আমাদের পর্য্যবেক্ষার উপর বিশ্রাম করে, এবং যে পর্য্যবেক্ষণ আরো অব্যবহিত ও সুনিশ্চিত সেই সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্যের উপর বিশ্রাম করে।

কিন্তু আমাদের সাক্ষীচৈতন্য সাক্ষী ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে জিনিসটি যাহা তাহাই সাক্ষীচৈতন্য প্রকাশ করে মাত্র—তাহা সৃষ্টি করে না। এই-এই গতিক্রিয়া তুমি উৎপাদন করিয়াছ, এই-এই ইন্দ্রিয়বোধ তুমি অনুভব করিয়াছ,—ইহা আত্মচৈতন্য কিংবা সাক্ষী-চৈতন্য তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই যে তাহা সত্য এরূপ নহে। অথবা, "এই-এই তত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য"—এই কথা সাক্ষীচৈতন্য বলিতেছে বলিয়াই যে উহা সত্য তাহা নহে। আসল কথা, উহাদের বাস্তবিক সত্তা আছে বলিয়াই, উহা অস্বীকার করা প্রজ্ঞার পক্ষে অসম্ভব। প্রজ্ঞা-নিহিত সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি

মূলতত্ত্বের সাহায্যে প্রজ্ঞা যে সকল সত্য প্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত নিরপেক্ষ সত্য—আত্যন্তিক সত্য। প্রজ্ঞা উহাদিগকে সৃষ্টি করে না—উহাদিগকে প্রকাশ করে মাত্র। প্রজ্ঞা স্বকীয় মূলতত্ত্বের বিচারকর্ত্তা নহে; প্রজ্ঞা উহাদের সম্বন্ধে কোন হিসাব দিতে পারে না। কারণ, প্রজ্ঞা উহাদের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকে এবং উহাদেরি নিয়মাধীন। তা-ছাড়া, সাক্ষীচৈতন্য প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করে না, উহার মূল তত্ত্বগুলিকেও উৎপাদন করে না। কারণ, সাক্ষীচৈতন্যের আর কোন কাজ নাই, আর কোন ক্ষমতা নাই—উহা প্রজ্ঞার এক প্রকার দর্পণ বই আর কিছুই নহে। অতএব নিরপেক্ষ সত্যগুলি প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা ও সাক্ষীচৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র; প্রত্যক্ষপরীক্ষা ও আত্মচৈতন্য উহাদের সত্তা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় মাত্র। একপক্ষে, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দ্বারাই সত্যসকল প্রকাশিত হয়, পক্ষান্তরে কোন প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দ্বারাই উহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা ও প্রজ্ঞার মধ্যে এইরূপ ঐক্যও আছে, প্রভেদও আছে। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার সাহায্যেই আমরা এমন কিছু প্রাপ্ত হই যাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাকেও অতিক্রম করে।

অতএব দেখ, আমরা যে দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি, উহা কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর, অথবা প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছি, সেই সব তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের সেই পর্য্যবেক্ষা জ্ঞানের উৎকৃষ্ট অংশের প্রতিই প্রযুক্ত। এইখানেই আমরা অপরাপর যাত্রী হইতে ভিন্ন পথ ধরিয়াছি। এই পথের ভিত্তিটি যেমন সুদৃঢ় তেমনি উন্নত।

আমরা যে নবপন্থাটি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা কিছুতেই পরি-

ত্যাগ করিব না; উহাতেই আমরা অবিচলিত ভাবে আবদ্ধ থাকিব। এই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বগুলি-সম্বন্ধে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া, বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে; এই সকল মূলতত্ত্ব হইতে যে সকল মহা মহা সমস্যা সমুত্থিত হয়, তাহাও আলোচনা করা যাইতে পারে;—এই পর্য্যালোচনার উপরেই সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই পর্য্যালোচনার দ্বারাই, দর্শনশাস্ত্রের পূর্ণতা, পরিমাণ, ও বিভাগ সম্পাদিত হয়। মানব-চিত্ত ও তৎসংক্রান্ত নিয়মের আলোচনাই যদি তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—যে সমস্ত সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূল-তত্ত্ব প্রজ্ঞার উপর আধিপত্য করে, সেই মূলতত্ত্বগুলির আলোচনাই দর্শনশাস্ত্রের উচ্চতম অংশ। তত্ত্ববিদ্যার এই অংশকে, জর্ম্মাণ-দেশে প্রাজ্ঞানিক তত্ত্ববিদ্যা বলে। ইহা পারীক্ষিক তত্ত্ববিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে ভিন্ন। এই অংশকে, আন্বীক্ষিকী-বিদ্যাও (তর্কশাস্ত্র) বর্জ্জন করিতে পারে না। প্রজ্ঞার নির্দ্ধারণ-প্রণালীর মূল্য ও বৈধতা পরীক্ষা করাই যখন আন্বীক্ষিকী বিদ্যার কাজ, তখন—যে সকল মূলতত্ত্বের উপর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তাহার মূল্য ও বৈধতার পরীক্ষা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা কি করিয়া বর্জ্জন করিবে?

এই সকল মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনা হইতেই আমরা ক্রমে ঈশ্বর-তত্ত্বে উপনীত হই। যদি আমরা এই সকল মূলতত্ত্বের সূত্রস্থান সেই মূলজ্ঞান পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারি—যে মূলজ্ঞানের উপরেই আমাদের জ্ঞানের প্রথম ব্যাখ্যা ও চরম ব্যাখ্যা নির্ভর করে—তবেই দর্শন-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ পবিত্র দেব-নিকেতনটি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূল তত্ত্বের উৎপত্তি নির্ণয়।

পরীক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এবং মনোবৃত্তি-সকল যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি মূলতত্ত্বের সত্তা আমরা সিদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত সেই সাক্ষীচৈতন্যের পরীক্ষা হইতে যেমন একদিকে আমরা এই সকল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমনি আবার দেখিতে পাই, যে উচ্চভূমির উপর এই সকল মূলতত্ত্ব অধিষ্ঠিত, সেখানে পরীক্ষার হাত পৌঁছায় না, এবং ঐ সকল মূলতত্ত্ব আমাদের সম্মুখে যে সকল অভিনব প্রদেশ উদ্‌ঘাটিত করে তাহাও পরীক্ষাবাদের অনধিগম্য। আমরা দেখিয়াছি, এই প্রকার মূলতত্ত্ব প্রায় সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। এই তত্ত্বগুলির উৎপত্তি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, একটি ছাড়া আর কোন মনোবৃত্তি হইতে উহাদের উৎপত্তি অসম্ভব। সেটি কি ?—না, জ্ঞান-বৃত্তি ; যাহাকে আমরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা হইতেই কতকগুলি নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি ; কিন্তু এইখানেই কি থামিতে পারিব ? অধুনা মানব-বুদ্ধি যেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, এই পরিণত মানব-বুদ্ধিতে এরূপ কতকগুলি মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ পায় যাহার সত্তায় সংশয় করা অসম্ভব। তাহার দৃষ্টান্ত; কার্য্য-

কারকের মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট এইরূপ ভাবে প্রকাশ পায়, যথাঃ—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, তাহারি একটা অবশ্যম্ভাবি কারণ আছে। অন্যান্য মূলতত্ত্বগুলিও এই একইরূপ স্বতঃসিদ্ধতার আকার ধারণ করে। কিন্তু যেমন মিনার্ভাদেবী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, জুপিটারদেবের মস্তক হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেইরূপ এই তত্ত্বগুলিও কি ন্যায়শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যের সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মানব-আত্মা হইতে একেবারেই বাহির হইয়াছে? গোড়ায় উহাদের কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল? কিন্তু সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবি মূলতত্ত্বের সূত্রস্থানে আরোহণ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? যে পথ দিয়া উহারা অধুনা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেই সমস্ত পথ অনুসরণ করিতে কি আমরা সমর্থ? এই নূতন সমস্যাটির কতটা গুরুত্ব তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। এই সমস্যাটির মীমাংসা করিতে পারিলে, ঐ মূলতত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অনেকটা খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে বাধাবিঘ্নও অনেক। নীল নদের উৎপত্তি-স্থানের ন্যায় যাহা প্রচ্ছন্ন, সেই মানবজ্ঞানের সুত্রস্থানটিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করা যাইতে পারে? ঐ তমসাচ্ছন্ন অতীতের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, এরূপ কি আশঙ্কা হয় না যে, হয়ত অবশেষে আমরা একটা কাল্পনিক সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইব? ইহা একটি বিষম সঙ্কট স্থান। ঐ মগ্ন শৈলটি নৌকা-ডুবির জন্য এরূপ প্রসিদ্ধ যে ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া ইহাও মনে হয়, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরাও এই বিষম সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস না পাইয়া, উহাকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে, লক্ ও কঁাডিয়াক্—এই দুই দার্শনিক, এই সমস্যার বাধা অতিক্রম করিতে গিয়াই এতটা

পথভ্রষ্ট হইয়াছেন; এবং একথাও বলা যাইতে পারে, তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মূল-প্রস্রবণকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছেন। যাঁহারা পরীক্ষা-প্রণালীর এত ভক্ত, সেই পরীক্ষাবাদিরা এই স্থলে আসিয়াই একপ্রকার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন। কেন না, সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্য গ্রহণে ও চিন্তা-আলোচনার সাহায্যে আমরা যে সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করি, সেই সকল তত্ত্বের বাস্তবিক লক্ষণ গোড়ায় পর্য্যালোচনা না করিয়া, কোন একটা দীপালোক কিংবা পথপ্রদর্শক সঙ্গে না লইয়া, একেবারেই তাঁহারা সূত্রস্থানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রীড্ ও ক্যাণ্ট—এই দুই দার্শনিক পণ্ডিত, পাছে অতীতের তমোজালে পথ হারাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে বর্ত্তমান-সীমার মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা, সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূল তত্ত্বগুলির আকার গোড়ায় কিরূপ ছিল তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, অধুনা তাহাদের কিরূপ অবস্থা, তাহারি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। পরীক্ষাবাদিদিগের দুঃসাহসিক চেষ্টা অপেক্ষা, আমরা ইঁহাদের সাবধানতা ও বিমৃশ্যকারিতার পক্ষপাতী। তবে কি না, যখন একটা সমস্যা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে,—যতক্ষণ না ইহার একটা সুমীমাংসা হয়, ততক্ষণ উহা মানব-চিত্তকে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেজিত করিবে। অতএব, উহাকে একেবারে এড়াইয়া-যাওয়া দর্শনশাস্ত্রের উচিত নহে, পরন্তু অতিমাত্র সতর্কতা সহকারে, কঠোর প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই দর্শনশাস্ত্রের কর্ত্তব্য।

আর একবার এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাক্;—তাহা হইলে আমাদের পক্ষেও ভাল হইবে, অন্যের পক্ষেও ভাল হইবে:—মানব-জ্ঞানের আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে বহুদূরে; তদবস্থ

জ্ঞানসমূহকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে এখন অসম্ভব। পক্ষান্তরে, উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। আর কিছু করিতে হইবে না, শুধু একবার আপনার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আলোচনা করিয়া দেখিলেই আমাদের আত্ম-চৈতন্য হইতেই আমরা সমস্ত তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারিব। কতকগুলি সুনিশ্চিত তত্ত্ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলে, পরে আর পথভ্রষ্ট হইয়া কোন কাল্পনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে না। জ্ঞানের আদিম অবস্থা-রূপ মূল-প্রস্রবণে আরোহণ করিবার সময়, যদি কখন ভ্রমে পতিত হই, তাহা হইলে আমরা সেই ভ্রম সহজেই বুঝিতে পারিব, এবং অপক্ষপাতী পর্য্যবেক্ষার সাহায্যে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিতেও সমর্থ হইব। আমরা এখন যেখানে অবস্থিতি করিতেছি, যদি জ্ঞানের সূত্রস্থান হইতে, বৈধ উপায়ে আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে না পারি, তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিব, আমরা ভ্রান্ত হইয়াছি—পথভ্রষ্ট হইয়াছি। সাধারণতঃ সত্য আমাদের নিকট যে আকারে প্রকাশ পায়, তাহার একটা নীরস শুষ্ক বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ—

১। দুই প্রকারে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার দৃষ্টান্ত,—মনে কর, দুইটি প্রস্তর তোমার সম্মুখে রহিয়াছে; পরে, আর দুইটি প্রস্তর উহাদের পার্শ্বে স্থাপিত হইল। তখন আমরা এই অকাট্য সত্যে উপনীত হই যে, প্রথমোক্ত দুইটি প্রস্তর এবং শেষোক্ত দুইটি প্রস্তর—এই উভয়ে মিলিয়া চারিটি প্রস্তর হইল। এই-স্থলে সত্যকে আমরা বস্তুভাবে উপলব্ধি করিলাম; কতকগুলি বাস্তবিক ও নির্দ্দিষ্ট পদার্থের আধারে ঐ সত্যটিকে প্রাপ্ত হইলাম। তা-ছাড়া, কখন কখন আমরা সাধারণভাবেও এইরূপ প্রতিপাদন করি যে, দুয়ে-

দুয়ে চার হয়। তখন আমরা ঐ সত্য, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে, বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকি। ইহাই সত্যের বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম ধারণা।

এখন দেখা যাউক্, সত্য-উপলব্ধির এই যে দুই প্রকার-ভেদ,—ইহার মধ্যে কোন্‌টি মানব-জ্ঞানে, কালের হিসাবে, অগ্রে প্রকাশ পায়। ইহা কি ঠিক নহে—ইহা কি একবাক্যে সকলেই স্বীকার করে না যে, আমাদের বস্তুগত স্থূল ধারণাই বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম ধারণার অগ্রবর্ত্তী? স্থান-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে, কোন বিশেষ সাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে, গোড়ায় কি আমরা কোন সত্যকে, এই-এই বিশেষ অবস্থায়, এই-এই বিশেষ মুহূর্ত্তে, এই-এই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করি না?

২। "ইহা কি আমি অস্বীকার করিতে পারি?"—এইরূপ প্রশ্ন না করিয়া, কোন সত্যকে আমরা অন্য প্রকারেও উপলব্ধি করিতে পারি। তখন, আমাদের জ্ঞানের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহারি প্রভাবে সত্যকে উপলব্ধি করি। তখন, জ্ঞান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে। তখন যে সত্য আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহাকে সন্দেহ করিতে চেষ্টা করিলেও সন্দেহ করা যায় না, অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিলেও অস্বীকার করা যায় না। তখন সেই সত্য আমাদের নিকট সর্ব্বপ্রকার নেতিবাদের অতীত বলিয়া প্রতীত হয়। তখন সেই সত্য, শুধু একটা সত্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না, পরন্তু অবশ্যম্ভাবি সত্যরূপে প্রকাশ পায়।

সেই সত্যের অর্জ্জনকালে, গোড়ায় আমরা চিন্তা আলোচনার দ্বারা আরম্ভ করি না। আলোচনা বলিলে বুঝায়, তাহার আগে কোন একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে যাহার বিষয় আলোচনা হইতেছে। যদি উপস্থিত ব্যাপারের পূর্ব্বে আর কোন ব্যাপার হয় নাই এইরূপ

দাঁড় করাইতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যাপারটিকে স্বতঃসিদ্ধ না বলিলে চলে না। এইরূপ সত্যের যে স্বতঃসিদ্ধ ও সহজ প্রতীতি, উহা কি সত্যের চিন্তা-প্রসূত অবশ্যম্ভাবি ধারণার পূর্ব্ববর্ত্তী নহে? কি ব্যক্তি, কি জাতি—উভয়েরি মধ্যে চিন্তাবৃত্তি বিলম্বে উন্নতি লাভ করে। বলিতে গেলে এই চিন্তা-আলোচনার বৃত্তিই প্রকৃত দার্শনিক বৃত্তি। কখন কখন ইহা হইতেই চিন্তাজনিত সন্দেহ ও সংশয়বাদ, কখন বা সুগভীর বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই বিবিধ মতবাদ, কৃত্রিম তর্কশাস্ত্র এবং বিবিধ কৃত্রিম শাস্ত্রীয় সূত্রের উৎপত্তি। (সেই সূত্রগুলি, অভ্যাসবশতঃ আমরা এইরূপ ভাবে ব্যবহার করি যেন উহা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম) কিন্তু আসলে ধরিতে গেলে, স্বতঃসিদ্ধ সহজ প্রত্যয়ই প্রকৃতির প্রকৃত তর্কশাস্ত্র। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপারে এই সহজ প্রত্যয়েরি কর্তৃত্ব আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু, জনসাধারণ, মানব-জাতির বারআনা লোক, উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত অসীম নির্ভরের সহিত উহারি উপর বিশ্রাম করে।

মানব-জ্ঞান-সমূহের উৎপত্তি-স্থান কোথায়, আমরা উহার সহজ মীমাংসা এইরূপ করিয়াছি:—আমরা এইটুকু নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি—কোন্ মনোব্যাপারটি অন্য সকল মনোব্যাপারের পূর্ব্ববর্ত্তী—যাহা ব্যতীত অন্য কোন মনোব্যাপার প্রকাশ পাইতে পারে না, এবং যাহা আমাদের জ্ঞানবৃত্তির প্রথম ক্রিয়া ও প্রথম রূপ।

যেহেতু, চিন্তা-আলোচনার লক্ষণ যাহাতে আছে তাহা কখনই গোড়ার ব্যাপার হইতে পারে না, অবশ্য তাহা আর একটা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সূচনা করে; অতএব, ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—আমাদের আলোচ্য বিষয়টি অধুনা যেমন চিন্তার চিহ্নে ও সূক্ষ্মধারণার

চিহ্নে চিহ্নিত, গোড়ায় সেরূপ কখন ছিল না; গোড়ায়, অবশ্য কোন বিশেষ অবস্থায়, কোন একটা সীমাবদ্ধ বস্তুর আকারে উহা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কাল-ক্রমে তাহা হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া, এইরূপ এক্ষণে সূক্ষ্মতত্ত্বের আকার—সার্ব্বভৌমিক আকার ধারণ করিয়াছে। একই শৃঙ্খলের এই দুইটি প্রান্ত। এখন আমাদের শুধু এইটুকু অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কি করিয়া মানব-জ্ঞান একটি প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে,—আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায়—স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত হইয়াছে।

সামগ্রিক অবস্থা (concrete) হইতে সূক্ষ্মসার অবস্থায়, (abstract) স্থূল তথ্য হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে কিরূপে উপনীত হওয়া যায়?—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা উপনীত হওয়া যায়, যাহাকে সার-নিষ্কর্ষণ বলে,—কেবলীকরণ বলে,—(abstraction)—প্রত্যাহৃতি বলে। ইহা-ত সোজা কথা। কিন্তু এই প্রত্যাহৃতির আবার দুই প্রকার ভেদ আছে। এক্ষণে সেই ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। মনে কর, বিশেষ-বিশেষ অনেকগুলি পদার্থ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। যে সকল লক্ষণে উহারা লক্ষণাক্রান্ত সেই সকল লক্ষণগুলিকে এক পাশে রাখিয়া, তন্মধ্যে যে লক্ষণটি উহাদের মধ্যে সাধারণ—সেই লক্ষণটিকে যখন তুমি কেবলীকৃত করিয়া অর্থাৎ অন্য হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা কর, তখন তুমি কি কর?—না, সেই লক্ষণটিকে তুমি অন্যান্য লক্ষণ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া লও। এই প্রত্যাহৃতির প্রকৃতি ও নিয়ম একবার আলোচনা করিয়া দেখ। এই প্রত্যাহরণ-ক্রিয়া তুলনার দ্বারা সাধিত হয়; বিবিধপ্রকার বিশেষ-বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। একটা দৃষ্টান্ত—বর্ণ সম্বন্ধীয় সাধারণ ও সূক্ষ্ম (abstract) ধারণা আমাদের মনে

কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। যাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই এরূপ একটা সাদা রঙের জিনিস আমার চক্ষের সম্মুখে রাখা যাক্; এই সাদা রঙের জিনিস্‌টি দেখিবামাত্রই কি সাধারণ বর্ণ-সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মিবে? প্রথমেই কি আমি শুভ্রতাকে এক দিকে এবং বর্ণকে অপর দিকে রাখিতে সমর্থ হইব? তোমার অন্তরের মধ্যে কিরূপ প্রক্রিয়া হয় তাহা একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। উহার যে শুভ্রতা তুমি উপলব্ধি করিতেছ, ঐ শুভ্রতার মধ্যে যে নিজত্বটুকু আছে তাহা যদি উঠাইয়া লও, দেখিবে—সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শুভ্রতাকে উপেক্ষা করিয়া, কেবলমাত্র বর্ণকে পৃথক্ করিতে,—কেবলীকৃত করিতে, কিছুতেই তুমি সমর্থ হইবে না। কেন না, একটি মাত্র বর্ণ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, আর সেটি শুভ্রবর্ণ। তুমি যদি শুভ্রবর্ণটিকে উঠাইয়া লও, তাহা হইলে বর্ণ-সম্পর্কে আর কিছুই থাকে না। এই সাদা রঙের জিনিসের পর, একটা নীল রঙের জিনিস আসুক, তার পর একটা লাল রঙের জিনিস আসুক,—ইত্যাদিক্রমে অন্যান্য রঙের জিনিস আসুক, তখন তুমি ঐ বিভিন্ন বর্ণগুলিকে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের বৈষম্য-সমূহকে উপেক্ষা করিতে পার; এবং উপেক্ষা করিয়া সেই সকল চাক্ষুষ অনুভূতির মধ্যে—অর্থাৎ বর্ণগুলির মধ্যে—যাহা সাধারণ তাহাই তুমি পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে পার। এইরূপেই বর্ণসম্বন্ধে তোমার একটা সূক্ষ্মসার (abstract) সাধারণ ধারণা জন্মে।

আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। তুমি যদি পদ্ম ছাড়া আর কোন ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া না থাক, তাহা হইলে, গন্ধ-সম্বন্ধে তোমার কি একটা সাধারণ ধারণা জন্মিতে পারে?—না, তাহা কখনই

পারে না। এস্থলে, পদ্মের গন্ধই তোমার নিকট একমাত্র গন্ধ, তাহা-ছাড়া তুমি আর কোন গন্ধ খুঁজিতে যাইবে না—আছে বলিয়া সন্দেহও করিবে না। কিন্তু যদি পদ্ম-গন্ধের পর গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ কর, এবং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে এরূপ আরো অনেকগুলি ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ কর, তবেই তাহাদের মধ্যগত সাম্য বৈষম্য উপলব্ধি করিয়া, সাধারণ গন্ধ-সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা জন্মিবে। একটা পুষ্প-গন্ধের সহিত আর একটা পুষ্প-গন্ধের সাম্য কোথায়?—উভয়ের মধ্যে সাধারণ জিনিসটি কি?—উভয় গন্ধই একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং একই ব্যক্তির দ্বারা আঘ্রাত— ইহা-ভিন্ন উহাদের মধ্যে সাধারণত্ব আর কি থাকিতে পারে? এস্থলে সামান্যী-করণ-প্রক্রিয়া—ব্যাপ্তিগ্রহ-প্রক্রিয়া (generalization) যে সম্ভব হয়—অঘ্রাণকারী পুরুষের অর্থাৎ বিষয়ীর একত্বই তাহার একমাত্র হেতু। সেই বিষয়ী স্মরণ করে—সে একই ব্যক্তি হইয়া, বিভিন্ন অনুভূতির দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াছে। বিবিধ পুষ্পের আঘ্রাণ-রূপ কতকগুলি অনুভূতি বিষয়ীর না হইলে, বিভিন্ন বিকারের দ্বারা উপ-রঞ্জিত হওয়া সত্তেও, সে যে একই ব্যক্তি—এ জ্ঞান তাহার জন্মিতে পারে না; এবং আঘ্রাত বিষয়টির বিবিধ লক্ষণের মধ্যে, কোন্‌টি সদৃশ ও কোন্‌টি বিসদৃশ—সে জ্ঞানও তাহার জন্মিতে পারে না। এইরূপ স্থলে—একমাত্র এইরূপ স্থলেই,—বিষয়ী তুলনা করিতে পারে, কেবলীকরণ (abstraction) করিতে পারে, সামান্যীকরণ বা ব্যাপ্তিগ্রহ (generalization) করিতে পারে।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বরূপ সূক্ষ্মসারে (abstract) উপনীত হইতে হইলে, এ সমস্ত ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না। এস্থলে কারণ-তত্ত্বটির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্‌। মনে কর, তুমি ছয়টি বিশেষ-

বিশেষ দৃষ্টান্ত-হইতে, কারণ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছ। কিন্তু তুমি যদি শুধু একটা দৃষ্টান্ত-হইতে এই তত্ত্বটি উদ্ধার করিতে, তাহা হইলেও ফলের কোন তারতম্য হইত না। কোন দৃষ্ট কার্য্যের কোন অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে—এই কথা বলিবার জন্য, অনেকগুলি ঘটনা-পারম্পর্য্য দর্শনের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা নাই! এই যে কার্য্যকারণের সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হইয়াছি, তাহার মূলতত্ত্বটি যেমন প্রথম দৃষ্টান্তে—সেইরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতেও সমগ্রভাবে বিদ্যমান। এই তত্ত্বটির বিষয়গত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু আমার অন্তরে, ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সংখ্যা অনুসারে, ইহার হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। আমাদের সম্বন্ধে ইহার যদি কোন ইতর-বিশেষ হয়, তাহা এইজন্যই হয় যে, উহাকে লক্ষ্য না করিয়াই আমরা উহার প্রয়োগ করি, অথবা উহাকে বিযুক্ত না করিয়াই উহাকে লক্ষ্য করি, অথবা উহার বিশেষ প্রয়োগ-স্থল হইতে উহাকে বিযুক্ত করি না। যাহা কিছু ঘটিতে আরম্ভ হয়, তাহারি একটা অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে—এই তত্ত্বটি অব্যবহিতভাবে, সূক্ষ্মভাবে, সাধারণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, যে বিশেষ-আকারে ঘটনাটি আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়, শুধু তাহার সেই বিশেষ ভাবটুক্ বাদ দিলেই, উহা উপলব্ধি করা যায়; তা, সেই ঘটনা—পত্রের পতনই হোক্, অথবা নরহত্যাই হোক্—তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। এস্থলে, আমি যে সূক্ষ্মসার ও সাধারণ ধারণায় উপনীত হই, তাহার কারণ ইহা নহে যে আমি সেই সময়েই একই ব্যক্তি ছিলাম কিংবা অনেকগুলি বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা একই ভাবে উপরঞ্জিত হইয়াছিলাম। মনে কর, একটা পাতা পড়িল—তখনি আমার মনে হইল—আমার বিশ্বাস হইল—আমি বলিয়া উঠিলাম—এই পতনের একটা কারণ

আছে। মনে কর, একটা নরহত্যা হইয়াছে, অমনি আমি বিশ্বাস করিলাম,—বলিয়া উঠিলাম, এই হত্যাকাণ্ডের একটা কারণ আছে। উক্ত উভয় ঘটনার মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা—কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা আছে এবং তা ছাড়া এমনও কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক—যাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রতীতিটি এই যে, ঐ উভয় ঘটনারই কোন কারণ না থাকা অসম্ভব। এস্থলে, যেমন আমরা প্রথম ঘটনাটি-সম্বন্ধে, বিশেষ-হইতে সার্ব্বভৌমিককে বিযুক্ত করিতে পারি, সেইরূপ দ্বিতীয় ঘটনাটি-সম্বন্ধেও আমরা পারি। কেন না, দ্বিতীয়টির মধ্যে যে সার্ব্বভৌমিকতা আছে, সেই সার্ব্বভৌমিকতা প্রথমটির মধ্যেও আছে। ফলতঃ, যদি প্রথম ঘটনাটির মধ্যে সার্ব্বভৌমিকতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি-ক্রমে সহস্র ঘটনার মধ্যেও সেই সার্ব্বভৌমিকতা থাকিবে না। কেন না, অনন্তের নিকট—নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমিকতার নিকট—এক সংখ্যা, সহস্র সংখ্যা হইতে কিছুমাত্র নিকটতর নহে। এ কথা অবশ্যম্ভাবিতা-সম্বন্ধেও খাটে—বরং আরো বেশী করিয়া খাটে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ,—যদি প্রথম ঘটনার মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে যে উহা সহসা আসিয়া পড়িবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্যম্ভাবিতা খণ্ডখণ্ড-ভাবে কিংবা পর-পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপন্ন হয় না। কোন হত্যাকাণ্ড প্রথম দেখিবামাত্রই যদি আমি এই কথা না বলিতে পারি যে, এই হত্যার অবশ্য কোন কারণ আছে, তাহা হইলে, অনেকগুলি হত্যার কারণ সপ্রমাণ হইবার পর, সহস্রবারের হত্যাকালে আমার শুধু এই-কথা মনে করিবার অধিকার জন্মিবে যে,—খুব সম্ভব এই নূতন হত্যা-কাণ্ডেরও কোন কারণ আছে। কিন্তু এ কথা বলিবার অধিকার

আমার কস্মিনকালেও জন্মিবে না যে,—ইহার অবশ্যম্ভাবী কোন কারণ আছে। কিন্তু যখন, অবশ্যম্ভাবিতা ও সার্ব্বভৌমিকতা একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন ঐ তত্ত্বদ্বয় উদ্ধার করিবার জন্য একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের সত্তা আমরা সিদ্ধ করিয়াছি। আমরা উহাদের সূত্রস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি; আমরা দেখাইয়াছি—প্রথমে উহারা বিশেষ-বিশেষ তথ্যের আকারে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়; এবং ইহাও দেখাইয়াছি—কি প্রকরণের দ্বারা,—কিরূপ কেবলীকরণ-প্রণালী দ্বারা,—মানববুদ্ধি, সীমাবদ্ধ বস্তুগত আকার হইতে উহাদিগকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া থাকে;—সেই সকল আকার যাহা উহাদের প্রকৃত উপাদান নহে, পরন্তু যাহার দ্বারা উহারা পরিবৃত। এখন মনে হইতে পারে, আমাদের অভিপ্রেত কার্য্য বুঝি সিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিকের মতবিরুদ্ধে, আমাদের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তটির পক্ষসমর্থন করা এক্ষণে আবশ্যক। কেন না, দর্শনশাস্ত্রে যিনি একজন প্রমাণ বলিয়া ন্যায্যরূপে পরিগণিত, তাঁহার মতবাদে মুগ্ধ হইয়া তোমরা বিপথে নীত হইতে পার। আমাদের ন্যায় শ্রীযুক্ত মেন্ দে-বিরাঁ, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাবাদের একজন প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ। তিনি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি উহাদের যেরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে সমীচীন নহে; উহাতে-করিয়া, এমন কি, মূলতত্ত্বের সত্তাই বিপন্ন হইয়া পড়ে; এবং উহা, পাকচক্রে আবার আমাদিগকে পরীক্ষাবাদেই উপনীত করে।

এই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলিকে প্রতিজ্ঞার আকারে

স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—উহার মধ্যে অনেকগুলি অবয়ব সন্নিবিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত :—ঘটনামাত্রেরই কারণ আছে বলিয়া অনুমিত হয়; গুণমাত্রেরই গুণের আধার-বস্তু আছে বলিয়া অনুমিত হয়; এই দুই তত্ত্বের মধ্যে যে ঘটনার প্রতীতি (idea) ও গুণের প্রতীতি—তাহারি পাশাপাশি আবার কারণের প্রতীতি ও বস্তুর প্রতীতিও রহিয়াছে। এই কারণ-প্রতীতি ও বস্তু-প্রতীতির উপরেই উক্ত তত্ত্বদুটি প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি প্রতীতি উহাদের মূল-উপাদান বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দে-বিরাঁ বলিতে চাহেন, ঐ দুই প্রতীতির মধ্যে যে দুই তত্ত্ব নিহিত, সেই দুই প্রতীতি উক্ত তত্ত্বদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতু আমরা নিজেই কারণ ও বস্তু, অতএব কারণ ও বস্তুর পরিজ্ঞানে, ঐ কারণ-প্রতীতি ও বস্তু-প্রতীতি, আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রথমেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ঐ প্রতীতিদ্বয় আমাদের অন্তরে একবার প্রতিভাত হইলে পর, তখন অনুমান-ন্যায়ের সাহায্যে উহাদিগকে আমাদের বাহিরেও আমরা লইয়া যাই। তখন, যেখানেই কোন ঘটনা বা গুণ প্রত্যক্ষ করি, অমনি আমরা সেই ঘটনার কারণ আছে, সেই গুণের আধার বস্তু আছে বলিয়া অনুমান করিয়া লই। কারণ তত্ত্ব ও বস্তু-তত্ত্বের তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বন্ধুবর আমাকে মার্জ্জনা করিবেন,—আমি তাঁহার এই ব্যাখ্যাটিকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ-তত্ত্বের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে, শুধু কারণ-প্রতীতির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিলে যথেষ্ট হয় না। কেননা, উহার প্রতীতি ও উহার মূলতত্ত্ব—এক নহে, উহা স্বরূপতঃ বিভিন্ন। আমি শ্রীযুক্ত দে-বিরাঁকে এই কথা বলি ;—তুমি অবশ্য এই কথাটি সিদ্ধ করিয়াছ যে, কারণ-প্রতীতি, কার্য্যোৎপাদিনী ইচ্ছাশক্তির অনুভূতির মধ্যেই

নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরা কতকগুলি কার্য্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি এবং তদনুসারে ঐ কার্য্যগুলি উৎপন্ন হইতেছে। তুমি বলিতেছ, উহা হইতেই আমাদের কারণ-প্রতীতি জন্মিয়া থাকে; এবং উহা হইতেই, আমরা নিজেই যে একটা-কারণ,—সেই কারণ-বিশেষের প্রতীতিও জন্মিয়া থাকে। ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু, "যে কোন ঘটনা আবির্ভূত হয় তাহারি অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে"—এই স্বতঃসিদ্ধ সূত্রটি এবং উক্ত তথ্য—এই উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

তোমার বিশ্বাস, ব্যাপ্তিগ্রহ বা অনুমানন্যায়ের দ্বারা ঐ ব্যবধানটি তুমি লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বলিতেছ, একবার কারণ-প্রতীতিটি আমাদের অন্তরে উপলব্ধি হইলে পর,—যেখানেই কোন নূতন ঘটনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই আমরা অনুমান-ন্যায়ের প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা শব্দজালে প্রতারিত হইও না। এই অদ্ভুত অনুমান-ন্যায়টিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা যাক্। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে, শ্রীযুক্ত দে-বির াঁর যুক্তির সমক্ষে এই উভয় সঙ্কটের সমস্যাটি স্থাপন করিতেছি :—

যে অনুমানের কথা তুমি বলিতেছ তাহা কি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী? তাহা যদি হয়—তবে-ত উহা একই জিনিসের বিভিন্ন নাম মাত্র। আমরা যে অনুমান-বলে, ঘটনা-প্রতীতির সহিত কারণ-প্রতীতির সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, তাহাকেই-ত কারণের মূলতত্ত্ব বলে। তুমি যদি বল,—উহা সার্ব্বভৌমিকও নহে, অবশ্যম্ভাবীও নহে, তাহা হইলে উহা কারণ-মূলতত্ত্বের স্থান অধিকার করিতে পারে না। যে জিনিসের তুমি ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছ, ঐ ব্যাখ্যার দ্বারাই সেই জিনিসের উচ্ছেদ হইতেছে। স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত

না করিলেও—এই অদ্ভুত দার্শনিক গবেষণার প্রকৃত ফল এইরূপ দাঁড়ায়;—ব্যক্তিত্ব-মূলক ও ইচ্ছাশক্তিমূলক কারণের প্রতীতি জন্মিবার পূর্ব্বে, কারণঘটিত মূলতত্ত্বের কোন ক্রিয়া হয় না।

যখন আমরা ভাবিয়া দেখি—এমন আরো কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহাদের ক্রিয়া, তৎসম্বন্ধীয় প্রতীতির পরে আরম্ভ না হইয়া পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়, তখন যে মতবাদটিকে আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা আরো দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রতিপক্ষ বলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতীতি হইতেই এই সকল তত্ত্ব উৎপন্ন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কি করিয়া আমাদের কাল ও দেশ সম্বন্ধীয় প্রতীতি জন্মে? আমরা দেখিতে পাই, দ্রব্য কোন-একটা স্থানে অবস্থিতি করে, এবং ঘটনা কোন একটা সময়ে সংঘটিত হয়;—এই তত্ত্বটির সাহায্য-ব্যতীত আর কিছুতেই দেশ কালের প্রতীতি আমাদের জন্মিতে পারে না। প্রথম উপদেশে আমরা দেখাইয়াছি,—এই তত্ত্বটির সাহায্য না পাইলে, আমাদের নিকট দেশকাল বলিয়া কিছুই থাকে না। অনন্তের প্রতীতিটি কি আমরা এই তত্ত্বটি হইতে প্রাপ্ত হই নাই যে, যাহা কিছু অন্তবৎ তাহা হইতেই অনন্ত অনুমিত হয়? যে-কোন অন্তবৎ ও অপূর্ণ পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করি, আমাদের অন্তরে অনুভব করি,—তাহা আপনাতে পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা আর একটা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে—যাহা অনন্ত, যাহা পূর্ণ; এই তত্ত্বটি অপসারিত কর, তাহা হইলে অনন্তের প্রতীতিটিও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই তত্ত্বটির প্রয়োগ হইতেই উহার প্রতীতিটি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তত্ত্বটি—প্রতীতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

বস্তুতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাক্। এখন এই কথাটি জানা আবশ্যক, আত্মারূপ বিষয়ীর (Subject) প্রতীতি ও আধার-বস্তুর প্রতীতি—সেই-সেই তত্ত্ব-ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী? কোন্ অধিকার-সূত্রে, বস্তু-প্রতীতি, "গুণমাত্রেরই আধার-বস্তু আছে"—এই তত্ত্বটির পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে? কারণের ন্যায় আধার-বস্তুও যদি আন্তরিক পর্য্যবেক্ষণের বিষয় হয়—তাহা হইলে শুদ্ধ সেই হেতু-সূত্রেই বস্তুপ্রতীতি বস্তুতত্ত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে। যখন আমি কোন কার্য্য উৎপাদন করি, তখন আপনাকেই তাহার কারণ বলিয়া সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করি। এইস্থলে কোনও তত্ত্বরূপ মধ্যস্থতার আবশ্যক হয় না; কিন্তু বস্তুসম্বন্ধে সেরূপ হয় না—সেরূপ হইতে পারে না। কেন না, আমাদের চৈতন্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়—আমাদের গুণধর্ম্ম, আমাদের কার্য্য, আমাদের বৃত্তি-নিচয়—সমস্তেরই একটি আধার-বস্তু আছে। এই আধার-বস্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় নহে;—ইহা পরিকল্পিত (Conceived) হয় মাত্র। আত্মচৈতন্য—ইন্দ্রিয়বোধকে, ইচ্ছাকে, চিন্তাকে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, কিন্তু উহাদের আধার-বস্তুকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে না। আত্মার আধার-বস্তুকে কি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে? এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম-বস্তুকে উপলব্ধি করিবার জন্য, এরূপ কোন-একটি তত্ত্ব হইতে যাত্রারম্ভ করা কি আবশ্যক হয় না, যাহার কাজ—অদৃশ্যের সহিত দৃশ্যকে—পরমার্থিক সত্তার সহিত ব্যবহারিক সত্তাকে একসূত্রে গ্রথিত করা? সেই তত্ত্বটিই বস্তুতত্ত্ব। সতরাং, বস্তু-প্রতীতি—বস্তুতত্ত্ব-প্রয়োগের পরবর্ত্তী; সুতরাং বস্তু-প্রতীতি হইতে বস্তুতত্ত্ব উৎপন্ন—এরূপ বলা যাইতে পারে না। ভাল-করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক্। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, বস্তু-তত্ত্বটি আমাদের মনে এরূপ

ভাবে অবস্থিতি করে যে, কোন ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্রই, তাহাতে প্রযুক্ত হইবার জন্য তত্ত্বটি যেন পূর্ব্ব-হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। আমরা শুধু এই কথা বলি যে, কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবামাত্র সেই সঙ্গে তাহার একটি আধার-বস্তুও যে আছে—এইরূপ পরিকল্পন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। অর্থাৎ—কি ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা, কি আত্মচৈতন্যের দ্বারা, কোন ব্যাপারকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত, এই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত ও সহজাত আধার-বস্তুটিও সংযুক্ত। ঘটনাগুলি এইরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে :—ব্যাপার-সমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উহাদের আধার-বস্তুর পরিকল্পনা (Conception)—এই দুই ক্রিয়া পর-পর হয় না, পরন্তু একসঙ্গেই হইয়া থাকে। এই অপক্ষপাতী বিশ্লেষণের ফলে, সদৃশ ও বিসদৃশ—দুই প্রকার ভ্রমই একসঙ্গে নিরাকৃত হয় ; তন্মধ্যে একটি ভ্রম এই,—কি বাহ্য কি আভ্যন্তরিক—পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা হইতেই তত্ত্বগুলি উৎপন্ন হয়। অপর ভ্রমটি এই :—তত্ত্বগুলি —অভিজ্ঞতার পূর্ব্ববর্ত্তী।

ফল কথা, প্রতীতির অন্তর্ণিহিত তত্ত্বগুলিকে প্রতীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস। যদি এরূপ অনুমান করা যায়—যে সকল প্রতীতি তত্ত্ব-সমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই প্রতীতিগুলি তত্ত্বসমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে—কি করিয়া এই সকল তত্ত্ব, প্রতীতিসমূহ হইতে নিষ্কর্ষিত হইল। এইটিই প্রথম প্রতিবন্ধক,—এইটিই গোড়ার প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া, এ কথাও ঠিক্ নহে যে, প্রতীতি—সকল স্থলেই তত্ত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ; প্রত্যুত দেখা যায়, তত্ত্বই প্রতীতির পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু প্রতীতি-সমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী হউক বা পরবর্ত্তী হউক, তত্ত্বগুলি সকল স্থলেই আত্মপর্য্যাপ্ত ; সার্ব্ব-

ভৌমতা ও অবশ্যম্ভাবিতা—এই দুই শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিত হওয়ায়, তত্ত্বগুলি সামান্য প্রতীতির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই উপদেশটি যেরূপ কঠিন ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য এক-একবার মনে হয়, তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন-সকল দার্শনিক ভাবেই আলোচিত হওয়া বিধেয়; এই আলোচনার প্রকৃতি পরিবর্তন করা আমাদের অধিকারায়ত্ত নহে। বিষয়-ভেদে ভাষাভেদ। তত্ত্ববিদ্যারও একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সকল প্রকার আনুমানিক সিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা, তথ্যের উপর অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করা,—ইহাই যেরূপ তত্ত্ববিদ্যার মূল-নিয়ম, সেইরূপ নিক্তির ওজনে যাথাযাথ্য রক্ষা করিয়া ভাষাপ্রয়োগ করাই তত্ত্ববিদ্যার বিশেষ গুণ। এই নিয়মটি আমরা ধর্ম্মশাসনের ন্যায় অনুসরণ করিয়াছি। সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বের সূত্রস্থান অনুসন্ধান করিবার সময়, আমরা এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি যে, পদ্ধতিক্রমে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ব্যাখ্যার আসল বিষয়টি নষ্ট হয় না। সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি—সমস্তই আমাদের বিশ্লেষণ-বিচার হইতে বাহির হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলি পর-পর যেরূপ আকার ধারণ করে—আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি; এবং ইহাও দেখাইয়াছি,—উহাদের ক্রিয়া স্বতঃ-উৎপন্নই হউক, বিশেষ-বিশেষ বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, উহাদের আসল প্রকৃতিটিকে ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত করিয়া চিন্তার দ্বারা অবধারণ করিবার চেষ্টাই হউক, অথবা নিষ্কর্ষণ-প্রক্রিয়া দ্বারা উহাদের সার্ব্বভৌমতা ও অবশ্যম্ভাবিতা নির্দ্ধারণ করাই হউক—উহাদের যতই অবস্থান্তর ঘটুক না কেন,—উহারা একই ভাবে রহিয়াছে—উহাদের প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উহারা চির-ধ্রুব। এই প্রবন্ধের গোড়া নাই, সূত্রস্থান নাই। অমুক

দিন হইতে এই ধ্রুবত্বের আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা কালসহকারে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এরূপ বলা যায় না; কেন না, উহার ক্রমপর্য্যায় নাই: আমরা একটু-একটু করিয়া ক্রমশঃ কারণতত্ত্বে, বস্তুতত্ত্বে, কাল-তত্ত্বে, দেশ-তত্ত্বে, অনন্ত-তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমরা অল্প অল্প আরম্ভ করিয়া, পরে সমস্তটা বিশ্বাস করি—এরূপ নহে। ঐ তত্ত্বগুলি, প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রবল, অবশ্য-স্তাবী ও অনিবার্য্য। উহাদের সম্বন্ধে যে ধ্রুববিশ্বাস উৎপন্ন হয় তাহাতে কোন "যদি কিন্তু" নাই; উহা অনন্যাপেক্ষ ও বিকল্পরহিত; তবে, সকল সময়ে সেই বিশ্বাসের সহিত আত্মচৈতন্যের সাহচর্য্য থাকে না, এই মাত্র।

কারণ-তত্ত্বে, পণ্ডিতবর লাইব্‌নিজের (Leibnitz) যেরূপ ধ্রুব-বিশ্বাস, একজন অজ্ঞ ব্যক্তিরও সেইরূপ বিশ্বাস। এইমাত্র প্রভেদ যে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি ঐ তত্ত্বটিকে নিত্য-ব্যবহারে প্রয়োগ করে, অথচ চিন্তা করিয়া দেখে না—যাহার দ্বারা সে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়, সেই তত্ত্বের মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে। পক্ষান্তরে, লাইব্‌নিজ ঐ শক্তির প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হয়েন—উহার অনুশীলন করিয়া এইমাত্র ব্যাখ্যা করেন যে উহা মানব-মনের স্বধর্ম্ম—উহা একটি প্রকৃতিসিদ্ধ ব্যাপার। অর্থাৎ, তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকদিগের যে অজ্ঞতা, তিনি সেই অজ্ঞতাকে তাহার উর্দ্ধতম সূত্রস্থানে লইয়া যান এইমাত্র। ঈশ্বরের কৃপায়, এই সকল তত্ত্বসম্বন্ধে, চাষা ও তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। এই তত্ত্বগুলি—যাহা মনুষ্যের ভৌতিক যৌক্তিক ও নৈতিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—উহারা কোন-না-কোন প্রকারে মনুষ্যের নিকট আত্ম-প্রকাশ করে;—এবং এই ক্ষণ-স্থায়ী জীবনে, বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট এই সীমাবদ্ধ দেশকালের মধ্যে, মনুষ্যের

নিকট এমন কিছু প্রকাশ করে—যাহা সার্ব্বভৌমিক, যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা অনন্ত।

তৃতীয় উপদেশ।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্ব সমূহের প্রকৃত মূল্য।

সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্তা, এবং উহাদের বর্ত্তমান ও আদিম অবস্থা, আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। এখন উহাদের প্রকৃত মূল্য কি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এবং তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্ত বৈধরূপে নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও বিচার করিতে হইবে। এইবার আমরা তত্ত্ববিদ্যার অধিকার ছাড়াইয়া ন্যায়ের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা, লক্‌ ও লক্‌প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে, কতকগুলি তত্ত্বের সার্ব্বভৌমতা ও অবশ্যম্ভাবিতা সমর্থন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা ক্যাণ্টের সম্মুখে উপস্থিত। তিনিও আমাদের ন্যায়, এই সকল তত্ত্বের সত্তা স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি "বিষয়ীর" (Subject) কতকগুলি সীমা কল্পনা করিয়া, সেই সীমার মধ্যে ঐ তত্ত্বগুলির সমস্ত শক্তিসামর্থ্য আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, যেহেতু ঐ তত্ত্বগুলি বিষয়ীগত (sudjective) অর্থাৎ, অন্তর্মুখী, সুতরাং বিষয়-সমূহে, অর্থাৎ বহির্বিষয়ে উহাদের প্রয়োগ হইতে পারে না; কাণ্টের ভাষায়, উহারা "বিষয়ত্ব"-বিহীন। (যৌক্তিক হউক বা অযৌক্তিক হউক, "বিষয়" ও "বিষয়ী"

(Object, Subject) এই পারিভাষিক শব্দদ্বয়, য়ুরোপীয় দার্শনিক ভাষায় এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে।)

এই নবোত্থাপিত তর্কের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি—একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক্। যে সকল তত্ত্ব, আমাদের বিচারবুদ্ধিকে পরিশাসিত করে, যাহা প্রায় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রেরই শীর্ষস্থানে থাকিয়া নেতৃত্ব করে, যাহা আমাদের সমস্ত কার্য্যকে নিয়মিত করে—সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সার-সত্য বর্ত্তমান,—না, উহারা শুধু আমাদের চিন্তার নিয়ামক মাত্র? ব্যাপার-মাত্রেরই কারণ আছে, গুণমাত্রেরই আধার-বস্তু আছে, বিস্তৃতি-মাত্রই আকাশে অবস্থিতি করে, পারম্পর্য্যমাত্রই কালে সংঘটিত হয়,—এই সমস্ত, সত্য বাস্তবিক-সত্য কি না,—এক্ষণে তাহাই জানা আবশ্যক। "গুণ-মাত্রের আধার বস্তু আছে"—ইহা যদি বাস্তবিক-সত্য না হয়, তাহা হইলে, "আমাদের আত্মা আছে"—ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; যেহেতু, আমাদের আত্ম-চৈতন্য-প্রতিভাত সমস্ত গুণের আধার-বস্তুই আত্মা। যদি কারণ-তত্ত্ব শুধু আমাদের মনের একটি নিয়মমাত্র হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা প্রকৃত ব্যাখ্যা কিছুই হয় না—কেবল একটা কল্পনা করা হয় মাত্র। এস্থলে যে মহান্ তথ্যের ব্যাখ্যা করিবার কথা, সেটি—মানবজাতির বিশ্বাস। ক্যাণ্ট-তন্ত্র, সেই বিশ্বাসকেই ধ্বংশ করিয়াছে।

ফলতঃ, যখন আমরা সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের সত্যতার কথা বলি, তখন আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না যে, উহারা শুধু আমাদের পক্ষেই সত্য; প্রত্যুত আমরা ইহাই বিশ্বাস করি যে, উহারা পরমার্থতঃ সত্য;—এমন কি, উহাদিগকে উপলব্ধি করিতে পারে এরূপ কোন মনও যদি না থাকে, তথাপি উহারা সত্য। আমরা মনে করি, উহারা আমাদের হইতে স্বতন্ত্র; আমাদের মনে হয়,—

উহাদের নিজের অভ্যন্তরে যে সত্য অবস্থিত, সেই সত্যেরই নিজস্ব বলে, উহারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অতএব, আমাদের মনোভাব যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে হইলে, ক্যাণ্টের সিদ্ধান্তকে উল্টাইয়া দিতে হয়। ক্যাণ্ট বলেন, এই তত্ত্বগুলি, আমাদের মনের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম; আমাদের মনের বাহিরে উহাদের কোন নিজস্ব মূল্য নাই। কিন্তু আমরা এইরূপ বলি;—এই তত্ত্বগুলির অনন্যনিরপেক্ষ একটি নিজস্ব মূল্য আছে; সেই জন্যই উহাদিগকে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

তা ছাড়া, এই যে বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতা (যে অস্ত্রে নব-সংশয়-বাদীরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন) ইহা, তত্ত্বগুলির প্রয়োগপক্ষে একটা অপরিহার্য্য নিয়ম নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে সিদ্ধ করিয়াছি —বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতা বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বুঝায়, —সেই বিশ্বাসের পূর্ব্বে, একটা বিচারক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, অস্বীকার করিবার অক্ষমতা অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত, কোন প্রকার বিচার বিবেচনার পূর্ব্বেই, আমাদের প্রজ্ঞা, সত্যকে আপনা হইতেই গ্রহণ করে। এই স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধিতে কোন প্রকার অবশ্যম্ভাবিতার ভাব নাই, সুতরাং সেই বিষয়িত্বেরও কোন লক্ষণ নাই, যাহা জর্ম্মান দার্শনিকদিগের এতটা শঙ্কার বিষয়।

সত্যের এই স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি সম্বন্ধে আর একবার আলোচনা করা যাউক। ক্যাণ্ট তাঁহার সুচিন্তিত (কিন্তু যাহাতে একটু টুলো ধরণের পাণ্ডিত্য প্রকটিত) জ্ঞানচক্রের মধ্যে, ইহাকে স্থান দেন নাই।

একথা কি সত্য,—যে কোন সিদ্ধান্ত হউক না কেন, ভাব-পক্ষের আকারে পরিব্যক্ত হইলেও উহার সহিত একটা অভাবপক্ষ জড়িত থাকেই থাকে?

সহসা এইরূপ প্রতীয়মান হয় বটে যে, যাহা ভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত তাহাই আবার অভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত। কেননা, কোন-একটা জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। আবার, অভাব পক্ষের সিদ্ধান্ত মাত্রই একই সঙ্গে ভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত; কেন না, কোন-একটা জিনিসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, তাহার অনস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এইরূপই যদি হয়—তবে, কি ভাবপক্ষ কি অভাবপক্ষ, যে কোন আকারেই ব্যক্ত হউক না, গোড়ায় একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, কোন প্রকার চিন্তা-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—সিদ্ধান্ত মাত্রের সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ বুঝায়; এবং সেই সংশয় ও চিন্তাক্রিয়ার পর, আমাদের মন বাধ্য হইয়াই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এইভাবে দেখিলে, সিদ্ধান্তটি স্বকীয় অবশ্যম্ভাবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এইরূপই প্রতীয়মান হয়; এবং তখন একটি পূর্ব্বপক্ষ আবার আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; সেটি এই:—এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই যদি তুমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই প্রশ্নের সত্যতার প্রতিভূ একমাত্র তুমি নিজে ও তোমার নিয়মবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি;—তাছাড়া উহার অন্য কোন প্রতিভূ নাই। এস্থলে,—বিষয়ী পুরুষ স্বকীয় নিয়মগুলিকেই আপনার বাহিরে লইয়া যায়; স্বকীয় চিত্তপ্রতিবিম্বগুলিকেই বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে;—আসলে, বিষয়ী স্বকীয় বিষয়িত্বের গণ্ডি হইতে কদাপি বাহির হয় না।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, এই দুরূহ প্রশ্নের একেবারে মূলে যাইতে হয়। আমাদের সকল সিদ্ধান্তই যে অভাবপক্ষের—একথা সত্য নহে। একথা আমরা স্বীকার করি, বিচারের অবস্থায়, তাহা

পক্ষের সিদ্ধান্ত মাত্রেই আবার অভাবপক্ষের সিদ্ধান্ত—এইরূপ বুঝায়। কিন্তু সকলের গোড়ায়, এমন কোন ভাবপক্ষের কথা কি থাকিতে পারে না, যাহার সহিত কোন প্রকার অ-ভাব মিশ্রিত নাই। আমরা ত অনেক সময়ে কোন প্রকার পূর্ব্বচিন্তা না করিয়াই কাজ করি; তাছাড়া সেই সময়ে আমাদের স্বাধীন চেষ্টাও প্রকটিত হয়;—সেই স্বাধীনতার ভাবটি চিন্তা-মূলক নহে; এমন কি, আমাদের জ্ঞান, অনেক সময়ে সংশয়ের ভূমি না মাড়াইয়াই সত্যকে উপলব্ধি করে; আমাদের চিন্তাক্রিয়া অহংজ্ঞানের নিকটেই আবার ফিরিয়া আইসে, অথবা এমন কোন মনোব্যাপারের নিকট ফিরিয়া আইসে যাহা চিন্তাক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। অতএব, গোড়ার ব্যাপারে চিন্তাক্রিয়া যে বিদ্যমান থাকে—একথা গ্রাহ্য নহে। এই চিন্তার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত আবদ্ধ থাকে—সেরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বুঝায় যে, তাহার গোড়ায় আর কোন একটা সিদ্ধান্ত ছিল যাহাতে চিন্তার ক্রিয়া আদৌ বিদ্যমান ছিল না। এই প্রকারে আমরা এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই যাহা চিন্তা-নিরপেক্ষ;—এমন একটি ভাবপক্ষের তত্ত্বে উপনীত হই যাহাতে অ-ভাবের কোন মিশ্রণ নাই। উহা অব্যবহিত সাক্ষাৎ উপলব্ধি; কবির অন্তঃস্ফূর্ত্ত কবিত্বের ন্যায়, বীরের অশিক্ষিত পটুত্বের ন্যায়, এই প্রকার উপলব্ধি, প্রকৃতির স্বাভাবিকী শক্তি হইতে বৈধরূপে প্রসূত। ইহাই জ্ঞানবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিয়া। যদি আমরা এই প্রাথমিক তত্ত্বের প্রতিবাদ করি, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি নিজের কাছেই আবার ফিরিয়া আসে;—আপনাকে আপনি পরীক্ষা করে;—স্বকীয় উপলব্ধ সত্যকে সংশয় করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সংশয় করিতে পারে না,—তাহার চেষ্টা বিফল হয়; সে, প্রথমে যাহা প্রতিপাদন করিয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহাই

প্রতিপাদন করে; স্বকীয় উপলব্ধ-সত্যকে সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে;—অধিকন্তু সংস্কারের আকারে একটা নূতন ভাব আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়;—এবং সেই সত্যের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়াই, এই সংস্কারটি হইতে কিছুতেই সে আপনাকে বিনির্মুক্ত করিতে পারে না। তখনই—কেবল তখনই, উহাতে সেই অবশ্যম্ভাবিতার লক্ষণ, সেই বিবরি-মুখিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়,—যে অবশ্যম্ভাবিতাকে প্রতিপক্ষগণ মূল-সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। প্রতিপক্ষগণ মনে করেন, মনের আরো গভীর প্রদেশে প্রবেশ করাতেই যেন সত্যের মূল্য হ্রাস হইল;—অহং চৈতন্যের প্রমাণেই যেন প্রমাণের খর্ব্বতা হইল; যেন এই অবশ্যম্ভাবিতার ভাবটি সত্যের একমাত্র রূপ—গোড়াকার রূপ। ক্যাণ্টের সংশয়বাদকে যখন একটা কোণে ঠেসিয়া ধরা যায়, (তাঁহার সুবুদ্ধি ন্যায়-বিচারের বিরোধী নহে) তখন তিনি বাধ্য হইয়া জ্ঞানের দুইটি ভেদ স্বীকার করেন:—একটি, স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি; আর একটি চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান। জ্ঞান যেখানে আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করে, সন্দেহের সহিত—মিথ্যা যুক্তির সহিত—ভ্রান্তির সহিত যুঝাযুঝি করে, চিন্তাক্রিয়াই তাহার সেই যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু চিন্তাক্রিয়ার ঊর্দ্ধে এমন-একটি জ্যোতির্ম্ময় শান্তিময় দিব্যলোক আছে—যেখানে জ্ঞান, আপনাতে ফিরিয়া না আসিয়াও, সত্যকে উপলব্ধি করে; সত্য বলিয়াই সত্যকে উপলব্ধি করে। কেন না, ঈশ্বর যেমন দেখিবার জন্য চক্ষু দিয়াছেন, শুনিবার জন্য কর্ণ দিয়াছেন, সেইরূপ সার-সত্য-উপলব্ধির জন্য প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি দিয়াছেন।

এই স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধিকে যদি অপক্ষপাতিতা-সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ ত দেখিতে পাইবে,—ইহা নিজে অহং না হইয়াও, অহং-এর

সহিত সংমিশ্রিত। আমাদের তাবৎ জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে অহং-এর প্রবেশ অনিবার্য্য, কেন না, অহং-ই জ্ঞানের বিষয়ী। আমাদের জ্ঞান সত্যকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করিলেও, কোন-না কোন প্রকারে অহং-এ ফিরিয়া আসিয়া, আপনার পুনরাবৃত্তি করে। এইরূপেই আমাদের জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অহংচৈতন্য আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়ার সাক্ষী, বিচারকর্ত্তা নহে। এস্থলে একমাত্র প্রজ্ঞাই বিচার-কর্ত্তা; এই প্রজ্ঞাই,—জর্ম্মান দর্শনের ভাষায়, বিষয়মুখী ও বিষয়ী-মুখী—উভয়ই, প্রজ্ঞা, সার-সত্যকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করে;—উহাতে আমাদের নিজ-ব্যক্তিগত ভাবের কোন মধ্যবর্ত্তিতা নাই; তবে কিনা, ব্যক্তিত্ব গোড়ায় না থাকিলে, কিংবা সংযোজিত না হইলে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকটিত হইতেই পারে না।

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই নৈসর্গিক ন্যায়শাস্ত্র। যাহাকে প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র বলে—চিন্তামূলক জ্ঞান তাহার ভিত্তিভূমি। স্বতঃসিদ্ধ উপলব্ধি আপ-নার উপরেই প্রতিষ্ঠিত;—অর্থাৎ সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যেখানে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া—সত্যকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। যে ভাব-পক্ষের কথা সম্পূর্ণরূপে সংশয়রহিত তাহাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের রূপ। যে ভাবপক্ষের কথা চিন্তামূলক তাহাই চিন্তিত জ্ঞানের রূপ;—অর্থাৎ যাহা অস্বীকার করা অসম্ভব এবং যাহা প্রতিপাদন করিতে আমরা বাধ্য হই। অভাবপক্ষের কথা সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রের উপর কর্তৃত্ব করে। এই ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত যে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা,—তাহার প্রত্যেকটি, দুইটি অভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞার দ্বারা বহুকষ্টে নিষ্পন্ন হয়। যে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা, নৈসর্গিক ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত তাহার উপর সহজ প্রত্যয়ের একটা ছাপ থাকে; তাহা স্বাভাবিক

সংস্কার হইতে উৎপন্ন,—স্বাভাবিক সংস্কারের দ্বারাই বিধৃত ও পরিপোষিত।

এখন ক্যাণ্ট ইহার উত্তরে এই কথা বলেন:—আমাদের প্রজ্ঞা যতই কেন বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত হউক না,—চিন্তাক্রিয়া হইতে, ইচ্ছাশক্তি হইতে, যাহা কিছু পুরুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—তৎসমস্ত হইতে যতই কেন বিনির্ম্মুক্ত বলিয়া কল্পিত হউক না, তথাপি উহা পুরুষ-সংশ্লিষ্ট,, উহা ব্যক্তিগত; কেন না, উহা আমাদের অহংচৈতন্যে প্রতিভাত হয়; সুতরাং উহা "বিষয়ীর" ভাবে উপরঞ্জিত। এই তর্কের উত্তরে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই, শুধু আমরা এই কথা বলি;—ইহাতে যুক্তির দৌড় ও যুক্তির অভিমান এত বেশি যে এই আতিশয্যই উহার আত্মবিনাশের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, প্রজ্ঞা বিষয়ীমুখী নহে—এই কথা প্রতিপন্ন করিতে গেলে যদি বলিতে হয় যে, কোন প্রকারেই আমরা উহার অংশভাগী হই না—এমন কি, উহার প্রবর্ত্তিত ক্রিয়া আমরা জানিতেও পারি না—তাহা হইলে, এই বিষয়ীমুখিতার কলঙ্ক হইতে প্রজ্ঞার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় থাকে না; তাহা হইলে বলিতে হয়,—ক্যাণ্ট যে বিষয়ীমুখী আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক ও উদ্ভট; তাহা আমাদের প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তির—জ্ঞান নামের যোগ্য সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির বহু ঊর্দ্ধে (কিংবা বহু নিম্নে বলিলেও চলে) অবস্থিত। কেন না, তুমি চাহিতেছ, এই বুদ্ধিবৃত্তি—এই জ্ঞানবৃত্তি আপনাকে আপনি আর জানিবে না; অথচ উহাই বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ। তবে কি ক্যাণ্ট বলিতে চাহেন যে, প্রজ্ঞার বিষয়মুখী শক্তি প্রকৃত পক্ষে থাকিতে হইলে, কোন বিষয়ী-বিশেষের মধ্যে উহার আবির্ভাব হইবে না,—বিষয়ী যে আমি, সম্পূর্ণরূপে আমার বাহিরে উহা

থাকিবে? তাহা হইলে আমার পক্ষে উহার কোন অস্তিত্বই নাই; উহা এমন একটা জ্ঞান—যাহা আমার নহে। যে জ্ঞান আমার নহে, তাহা পরমার্থতঃ সার্ব্বভৌমিক, অনন্ত, ও পূর্ণ হইলেও আমার অহং-এ যদি প্রতিভাত না হয়, তাহা হইলে, আমার পক্ষে উহা না থাকারই সামিল। তুমি যদি চাহ—আমাদের জ্ঞান আর বিষয়ীমুখী থাকিবে না, তাহা হইলে এমন একটা জিনিস চাহিতেছ যাহা ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব। না,—স্বয়ং ঈশ্বরও নিজ জ্ঞানের জ্ঞাতা। সুতরাং ঐশ্বরিক জ্ঞানেতেও বিষয়ীমুখিতা বিদ্যমান। যদি বল এই বিষয়ী-মুখিতার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, ঈশ্বরকেও বাধ্য হইয়া সংশয়বাদী হইতে হয়; তাহা হইলে মানুষের ন্যায় ঈশ্বরও সংশয়বাদের জাল হইতে বাহির হইতে পারেন না। কিন্তু ইহা যদি নিতান্তই হাস্যজনক কথা হয়, ঈশ্বর স্বকীয় জ্ঞান-ক্রিয়ার জ্ঞাতা—একথার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঈশ্বরের মনে সংশয়বাদ আসিয়া না পড়ে, তাহা হইলে, আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার আমরা জ্ঞাতা—অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের সহিত বিষয়ীমুখিতা অনুস্যূত—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ অনিবার্য্যরূপে আমাদের মনেই বা কেন আসিয়া পড়িবে?

ফলতঃ, যখন দেখা যায়—জর্ম্মান-দর্শনের যিনি জনক—স্বয়ং তিনিই, মূলতত্ত্বসমূহের বিষয়ীমুখিতারূপ সমস্যার গোলোকধাঁধার মধ্যে আত্মহারা হইয়াছেন, তখন রীড্ যদি এই মূলতত্ত্বের সমস্যাটিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। রীড্ শুধু এই কথা বারম্বার বলেন, সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের সত্যতা—আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহের সত্যসাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং সেই সত্যসাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই, উহাদের

সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই। রীড্ বলেন :—"আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের অহংচৈতন্য, আমাদের চিত্তবৃত্তি—এই সমস্তের কথা শুনিয়া আমরা কেন চলি, তাহার হেতুনির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে, আমরা শুধু এই কথা বলি :—ইহা এইরূপই হইয়া থাকে, ইহা ছাড়া অন্যরূপ হইতে পারে না। এই যে কথা, ইহা কি অনিবার্য্য বিশ্বাসের কথা নহে? ইহা সাক্ষাৎ প্রকৃতি দেবীর কণ্ঠনিসৃত বাণী; ইহার সহিত যুঝাযুঝি করা বৃথা। আরও অধিক দূর কি অগ্রসর হইতে হইবে? আমাদের প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির নিকট হইতে আমরা কি তাহার বিশ্বাস্যতার প্রামাণিক দলিল চাহিব, এবং যতক্ষণ না সেই দলিল দাখিল করিতে পারিবে ততক্ষণ কি তাহার কথায় আমরা বিশ্বাস করিব না? আমার ভয় হয় পাছে আমাদের এই অতিবুদ্ধি, বাতুলতায় পরিণত হয়, এবং সাধারণ মানব-দশার অধীন হইতে অস্বীকৃত হইয়া, পাছে আমরা মানবের সাধারণ-বুদ্ধি হইতেই বঞ্চিত হই।"

আমরা যাঁহাকে উনবিংশশতাব্দীর ফরাসী-দর্শনের পূজনীয় গুরু বলিয়া মানি সেই রোয়াইয়ে কলার (Royer-Collard) এই সম্বন্ধে একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন :—"আমাদের মানসিক জীবন কি?—না, আমাদের বাহ্য বস্তুর প্রতীতি, আমাদের ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্বাস—এই সমস্তেরই ধারাবাহিক পারম্পর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনের বিশ্বাসগুলিই আত্মশক্তি ও ইচ্ছার প্রবর্ত্তক। যাহা কিছু আমাদিগকে বিশ্বাসে প্রবৃত্ত করে তাহাকেই আমরা প্রমাণ বলি। প্রজ্ঞা স্বীয় প্রমাণের কোন হেতু নির্দ্দেশ করে না। প্রজ্ঞার প্রমাণকে দূষিত বলিয়া সাব্যস্ত করাও যা', প্রজ্ঞার উচ্ছেদ করাও তা',—একই কথা। প্রজ্ঞারও একটা নিজস্ব প্রমাণ আছে। বিশ্বাসের কতকগুলি মূলনিয়ম লইয়াই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি

গঠিত। এই নিয়মগুলি একই উৎস হইতে নিস্যন্দিত, সুতরাং সমান প্রামাণ্য; একই অধিকার-বলে উহারা বিচার করিয়া থাকে; উহাদের সকলেরই একই আদালৎ। একের আদালৎ হইতে অপরের আদালতে আপীল চলে না। উহাদের মধ্যে কেহ যদি অপর কোনটির প্রতি বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে সে সকলেরই প্রতি বিদ্রোহী এইরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে; সে তখন তাহার নিজের প্রকৃতি হইতেই পরিভ্রষ্ট হয়।" আমরা যে সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সারকথা-গুলি এই :—

১। তত্ত্বসমূহের বিষয়মুখী প্রামাণিকতাকে দুর্ব্বল করিবার জন্য, ক্যাণ্ট তত্ত্বসমূহের অবশ্যম্ভাবিতা-লক্ষণের উপর যে যুক্তিস্থাপন করিয়াছেন,—তাঁহার সেই যুক্তি, তত্ত্বসমূহের চিন্তারোপিত রূপটির প্রতিই প্রযুজ্য, উহা তত্ত্বসমূহের স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োগ পর্য্যন্ত পৌঁছে না; কেননা, উহাদের সেই অবস্থায়, অবশ্যম্ভাবিতার লক্ষণ তখনও প্রকাশ পায় না।

২। ফল কথা, মানুষ বিশ্বাসগুলির সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা মানিয়া চলাই ঠিক্। সেই সব সিদ্ধান্তকে কোন অংশেই অপসিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কেননা, কার্য্য হইতে কারণে, লিঙ্গ হইতে লিঙ্গীতে, ব্যাপক হইতে ব্যাপ্যে আরোহণ করাই তদনুসৃত যুক্তির প্রণালী।

৩। তাছাড়া, মূলতত্ত্ব সমূহের মূল্য, সকল প্রকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপরে। দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে যে ভাবপক্ষের কথা পাওয়া যায় তাহা সংশয়ের দুরধিগম্য! এই ভাবপক্ষের নিশ্চয়াত্মক কথা হইতেই প্রজ্ঞার অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সত্যতা-সিদ্ধ হয়;—উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই তুল্যমূল্য; উহা ছাড়া

অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিতে গেলে, প্রজ্ঞার নিকট এমন-একটা কিছু চাওয়া হয়, যাহা নিতান্ত অসম্ভব। যেহেতু সকল প্রকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের জন্যই কতকগুলি মূলতত্ত্ব অপরিহার্য্য—অতএব ঐ সকল মূলতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহারা নিজেই।

চতুর্থ উপদেশ।

ঈশ্বর মূলতত্ত্বের মূলতত্ত্ব।

যে সকল মূলতত্ত্বের দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হয় তাহাদের সত্তা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অবধারিত হইয়াছে যে, সত্য এবং যে সকল মূল-তত্ত্ব সত্য নামের যোগ্য তৎসমস্তই আমাদের বাহিরে। আমরা উহাদিগকে উপলব্ধি করি, কিন্তু উৎপাদন করি না। উহা আমাদের মনের পরিকল্পন মাত্র নহে; পরন্তু আমাদের মন যদি উহাদিগকে উপলব্ধি করিতে নাও পারে, তথাপি উহারা থাকিবে। এক্ষণে স্বভাবতই এই সমস্যাটি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে;—এই সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি স্বরূপতঃ—পরমার্থতঃ কিরূপ? উহারা কোথায় অবস্থিতি করে? কোথা হইতে আইসে? শুধু যে আমরা এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিতেছি তাহা নহে, স্বয়ং মানবচিত্ত হইতে এই প্রশ্নটি উত্থিত হইতেছে। মনুষ্য যতক্ষণ না ইহার একটা মীমাংসা করে,—যতদূর সম্ভব, জ্ঞানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত হয় না।

ইহা নিশ্চিত যে, সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি প্রজ্ঞার

অধিকার-ভুক্ত—প্রজ্ঞাই উহাদিগকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে। এইরূপে, মনোরাজ্যের গভীর প্রদেশে, আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত উহা ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যুত। সত্যের জ্ঞাতা পুরুষের সহিত নৈকট্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সত্য এইরূপ প্রতীয়মান হয় যেন উহা মনেরই একটা পরিকল্পনা মাত্র। যাহাই হউক, আমরা সত্যের জ্ঞাতা—সত্যের জনক নহি;—একথা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে। যে "আমির" সহিত আমাদের প্রজ্ঞা জড়িত সেই আমি যদি প্রজ্ঞাতত্ত্বেরই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে না পারে—পারমার্থিক সত্যের ব্যাখ্যা সে কি করিয়া করিবে? সীমাবদ্ধ ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য, অসীম অনন্ত অবশ্যম্ভাবী সত্যকে উপলব্ধি করে এইমাত্র। মনুষ্য এইটুকু অধিকার যে পাইয়াছে ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তাহার সত্তা, পারমার্থিক সত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট নহে—সংগঠিত নহে। মানুষ শুধু বলিতে পারে;—"আমার প্রজ্ঞা"; কিন্তু একথা বলিতে কখন সাহস করে নাইঃ—"আমার সত্য"।

কিন্তু আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি—মানব-উপলব্ধ সারসত্যগুলি যদি মানব-চিত্তের বাহিরে থাকে—তবে উহারা কোথায় থাকে? অ্যারিষ্টটলের কোন শিষ্য উত্তর করিবেন;—উহারা পদার্থসমূহের মধ্যে থাকে। যে সকল সত্তা, এইরূপ সত্যের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল সত্তা ছাড়া, আর কোন সত্তার সন্ধানে ঐ সকল সত্য ধাবিত হয় কি না? প্রাকৃতিক নিয়ম আর কাহাকে বলে? পৃথক রূপে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমাদের মন, সত্তাদি হইতে—তথ্যাদি হইতে, যে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্ত করিয়া লয়, তাহাই ত প্রাকৃতিক নিয়ম। গণিতের মূলতত্ত্বগুলি তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন মনে কর, গণিতের একটি স্বতঃসিদ্ধ

সত্য ;—"অংশ অপেক্ষা, সমষ্টিটা বড়" যে কোন পদার্থের সমষ্টি সম্বন্ধেই,—যেকোন পদার্থের অংশ সম্বন্ধেই এই সত্যটি উপলব্ধ হইয়া থাকে। হাঁ, না,—দুই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না—ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধ ;—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধতার যে নিয়ম—ইহা তর্ক শাস্ত্রানুসারে, বাস্তবিকই আমাদের সকল সিদ্ধান্তের—সকল যুক্তির মূলে অবস্থিত। ইহা সকল সত্তারই সারাংশ। ইহা ব্যতীত কোন সত্তাই থাকিতে পারে না। অ্যারিষ্টটল বলেন,—কতলগুলি সার্ব্বভৌম সত্তা অবশ্যই আছে, কিন্তু উহারা বিশেষ সত্তাসমূহ হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহে।

অ্যারিষ্টটল্ যে বলেন, বিশেষ পদার্থ সমূহের মধ্যে সার্ব্বভৌম তত্ত্ব অবস্থিতি করে, - এ কথা অযৌক্তিক নহে। কেন না, সার্ব্বভৌম তত্ত্বকে ছাড়িয়া বিশেষ পদার্থসমূহ থাকিতেই পারে না। সার্ব্বভৌম তত্ত্বগুলিই, উহাদিগকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে, উহাদের একতা সম্পাদন করে। কিন্তু সার্ব্বভৌম তত্ত্ব, বিশেষ পদার্থসমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে বলিয়াই কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহাদের ছাড়া সার্ব্বভৌম তত্ত্ব আর কোথাও অবস্থিতি করে না, এবং উহাদের ছাড়িয়া সার্ব্বভৌম তত্ত্বের নিজস্ব কোন সত্তা নাই? কিন্তু এমন কতকগুলি তত্ত্বও আছে যাহা নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমতার উপাদানে গঠিত। একথা সত্য, বিশেষ-বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই আমরা সার্ব্বভৌমিক কারণতত্ত্বে উপনীত হই। কিন্তু এই তত্ত্বটি, কারণোৎপন্ন কার্য্যটি হইতে অধিক ব্যাপক। কেননা, শুধু যে এই কার্য্যটির সম্বন্ধেই তত্ত্বটির প্রয়োগ হয় তাহা নহে, আরো অসংখ্য কার্য্য সম্বন্ধেও উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন একটা বিশেষ তথ্যের মধ্যে একটা ব্যাপক তত্ত্ব নিহিত থাকে

বটে; কিন্তু উহার সমস্তটাই যে উহার মধ্যে থাকে এরূপ নহে। তথ্যের উপর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, তত্ত্বের উপরেই তথ্য প্রতিষ্ঠিত। পাটীগণিত ও জ্যামিতির সার্ব্বভৌম অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বগুলি, রাশির উপর অথবা আয়তনের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু ঐ তত্ত্বগুলিই রাশি আয়তনের নিয়ামক।

তবে কি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে—যে হেতু, কি মনুষ্য কি প্রকৃতি কেহই পরমার্থিক সার সত্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, অতএব উহারা আপনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে, আপনারাই আপনার প্রতিষ্ঠাভূমি, আপনারাই আপনার আধার?

কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি, পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা আরও অযৌক্তিক। কেননা আমি জিজ্ঞাসা করি—কোন্ সত্যগুলি (কি নিত্য, কি আগন্তুক) পদার্থ-সমূহের ও বুদ্ধিবৃত্তির বাহিরে থাকিয়া, আপনাতে আপনি অবস্থিতি করে? তাহা যদি হয়, তবে সত্য—বাস্তবতায়-পরিণত একটা অতিসূক্ষ্ম ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক সুবুদ্ধির প্রতিকূলে, কোন অতি-সূক্ষ্ম তন্ত্রের তত্ত্ববিদ্যা প্রবল হইতে পারে না। প্লেটোর জ্ঞান-বাদে (ideas) যদি এইরূপ কোন অতিসূক্ষ্মতার ভাব থাকে, তবে অ্যারিষ্টটল ন্যায্যতঃ ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। কিন্তু অ্যারিষ্টটল, প্লেটোর সহিত সংগ্রাম-সাধ মিটাইবার জন্যই যেন তাঁহার মতটিকে এইরূপ ভাবে দাঁড় করাইয়াছেন;—ইহা অ্যারিষ্টটলের স্বকপোল-কল্পিত মত।

তবে আর বিলম্ব না করিয়া, সারসত্যগুলিকে এই ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতার অবস্থা হইতে উদ্ধার করা যাউক। কিন্তু কি প্রকারে তাহা করা যাইবে? যে মূলতত্ত্বটির সহিত তোমরা এখন সুপরিচিত, সেই মূলতত্ত্বটি, ঐ সারসত্যগুলির প্রতি প্রয়োগ কর।

হাঁ, সারসত্য, স্বকীয় সত্তার সমর্থনার্থ বাধ্য হইয়া এমন একটা কিছুর দোহাই দেয় যাহা তাহার অতীত। যেমন প্রত্যেক ঘটনার একটা আধার আছে; যেমন আমাদের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি,—একটা কোন বিশেষ সত্তা ভিন্ন আর কোথাও অবস্থিতি করে না (এবং যে সত্তা আমরা নিজেই) সেইরূপ, সত্য বলিলে, সত্যেরও একটা বিশেষ আধার আছে এইরূপ বুঝায়; এবং পারমার্থিক মূল-সত্য বলিলে বুঝায় যে, সেই মূল সত্যের অনুরূপ একটি মূলসত্তাও আছে—সারসত্যগুলি যাহার চরম প্রতিষ্ঠাভূমি।

এইরূপে আমরা এমন একটা পরমতত্ত্বে উপনীত হই যাহা অস্পষ্ট সূক্ষ্ম ভাব মাত্র নহে, পরন্তু যাহার একটা বাস্তবিক সত্তা আছে। এই সত্তাটি অবশ্যম্ভাবী সত্তা—পরম সত্তা; কেন না, ইহাই অবশ্যম্ভাবী সারসত্যসমূহের আধার। এই সত্তা, সত্যের গভীরদেশে—সত্যের সারাংশরূপে বর্ত্তমান। এক কথায়, এই সত্তাটিই ঈশ্বর।

এই মতবাদটি—যাহা আমাদিগকে পূর্ণ সত্য হইতে পূর্ণ সত্তায় লইয়া যায়—ইহা দর্শনের ইতিহাসে নূতন নহে, প্লেটো হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের ন্যায় প্লেটোও, জ্ঞানের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন যে,—জ্ঞানের যদি এরূপ কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়, যাহা ব্যতীত কোন পদার্থেরই জ্ঞান যথাযথ রূপে উপলব্ধ হইতে পারে না—তাহা হইলে এমন-একটা কিছু বুঝায় যাহা সার্ব্বভৌম ও এক, যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, এবং যাহা প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। এই যে এমন-কিছু যাহা সার্ব্বভৌম ও একাত্মক, প্লেটো তাহাকেই (idea) আইডিয়া-নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

এই সার্ব্বভৌমত্ব ও একত্ব-লক্ষণাক্রান্ত আইডিয়া সমূহ,—পরিবর্ত্তনশীল ও চিরচঞ্চল ভৌতিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন নহে, পরন্তু ভৌতিক পদার্থ সমূহের উপর উহাদের প্রয়োগ হয় এবং এই প্রকারে ঐ সমস্ত ভৌতিক পদার্থ আমাদের বোধগম্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, মানব-চিত্তও এই আইডিয়া-গুলির দ্বারা গঠিত নহে; কেননা, মনুষ্য সত্যের পরিমাপক নহে।

প্লেটো এই আইডিয়া-গুলিকে বাস্তবিক সত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কেননা উহারাই কেবল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সমূহের নিকট ও মানব-জ্ঞানের নিকট, স্বকীয় বাস্তবতা ও একতা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহা হইতে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, প্লেটো উহাদিগকে স্বতন্ত্র-অবস্থিত বাস্তবিক সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

প্রথমতঃ কেহ যদি এ কথা বলেন,—প্লেটোর মতে, প্রত্যেক আইডিয়াই স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত,—উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বন্ধন নাই, কোন একটা সাধারণ কেন্দ্রের সহিত উহাদের যোগ নাই—তাহা হইলে প্লেটোর গ্রন্থ-হইতে এইরূপ অনেক স্থল প্রদর্শিত হইতে পারে যেখানে তিনি বলিয়াছেন,—এই সকল আইডিয়া সমবেত হইয়া এমন একটা আইডিয়া-ঘটিত একতায় পরিণত হইয়াছে যাহা এই দৃশ্যমান জাগতিক একতার মূলীভূত কারণ।

তাঁহারা কি এইরূপ বলিতে চাহেন, এই আইডিয়া-ঘটিত জগৎ, এমন একটি স্বতন্ত্র সত্তা যাহা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্? কিন্তু এই বাক্যটি সমর্থন করিতে হইলে, প্লেটোর "রিপব্লিক্"-নামক গ্রন্থের অনেক স্থল বিস্মৃত না হইলে চলে না,—সেই সব স্থল যেখানে তিনি, মঙ্গলের সহিত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত, বিজ্ঞান ও সত্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেই মহান্ তুলনার স্থলটি কি তাঁহাদের স্মরণ হয় না যেখানে—“সূর্য্য হইতে এই ভৌতিক জগৎ, জীবন ও জ্যোতি লাভ করিয়াছে,” —এই কথার পরেই সক্রেটিন্ বলিতেছেন ;—“সেইরূপ তুমি বলিতে পার, এই জ্ঞেয় সত্তা-সমূহও, মঙ্গল হইতে শুধু যে তাহাদের জ্ঞেয়ত্ব লাভ করিয়াছে তাহা নহে—তাহাদের সত্তা ও সারাংশও প্রাপ্ত হইয়াছে।” অতএব এই জ্ঞেয় সত্তাগুলি অর্থাৎ আইডিয়াগুলি সতন্ত্র ভাবে কথনই থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন যে, প্লেটো যাহাকে মঙ্গল বলেন উহা মঙ্গলের একটা জ্ঞেয়-ভাব মাত্র, কিন্তু ঈশ্বর ত শুধু একটা জ্ঞেয় ভাব মাত্র নহেন। ইহার উত্তরে আমি বলি, প্লেটোর মতে, “মঙ্গল” বস্তুতই একটি জ্ঞেয় সত্তা, অর্থাৎ আইডিয়া ; কিন্তু এস্থলে আইডিয়া, মনের শুধু একটা ধারণা মাত্র নহে, স্বধু চিন্তার বিষয় নহে ; (যে ভাবে অ্যারিষ্টটলের শিষ্যেরা আইডিয়া-শব্দটি বুঝিয়া থাকেন)। আমি আর একটু বেশি এই বলি,—প্লেটোর মতে, মঙ্গলের আইডিয়াটি সর্ব্বাদিম আইডিয়া। আমাদের পক্ষে, উহা চিন্তার বিষয় হইয়া থাকিলেও, সত্তা-সম্বন্ধে উহা ঈশ্বরের সহিত একীভূত। যদি মঙ্গলের আইডিয়া ও ঈশ্বর একই পদার্থ না হয়, তাহা হইলে “রিপব্লিক”-গ্রন্থের নিম্নলিখিত উক্তিটির কিরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ?—“জ্ঞান-জগতের শেষ প্রান্তে মঙ্গলের আইডিয়াটি অবস্থিত ; এই আইডিয়াটি অতি কষ্টে উপলব্ধ হয়, কিন্তু পরিশেষে যখন একবার উপলব্ধ হয়, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, যাহা কিছু সুন্দর ও মঙ্গল, তৎসমস্তেরই উহা মূল প্রস্রবণ। উহা হইতেই দৃশ্যমান জগতে,—আলোক ও আলোকের উৎস-স্বরূপ এই সূর্য্য, এবং অদৃশ্য জগতে,—সত্য ও

জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হয়।” একদিকে সূর্য্য ও আলোক এবং অন্য দিকে সত্য ও জ্ঞান,—কোন বাস্তবিক সত্তা ভিন্ন কি আর কিছু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ?

কিন্তু প্লেটোর নিন্দুকেরা যে সকল অংশ ইচ্ছা করিয়াই যেন উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার “ফেদ্‌র্‌”-নামক গ্রন্থের সেই অংশগুলি সম্মুখে উপস্থিত করিলেই সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইবে। প্লেটো এক-স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন :—“এই যাত্রাপথে, আমাদের আত্মা ন্যায়ের অনুধ্যান করে, শ্রেয়ের অনুধ্যান করে, বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে,—কিন্তু সেরূপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে না যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা বিভিন্ন পদার্থে, বিভিন্ন সত্তায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, পরন্তু সেইরূপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে যাহা পরাৎপর পরম সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। সার্ব্বভৌমের ধারণা করিতে পারাই আত্মার বিশেষত্ব ;—সেই সার্ব্বভৌম—যাহাকে বিবিধ ইন্দ্রিয়বোধের বৈচিত্রের মধ্যেও প্রজ্ঞামূলক একত্বের অন্তর্ভূক্ত করা যাইতে পারে। সাধারণত যাহাকে আমরা সত্তা বলি সেই সত্তাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, একমাত্র বাস্তবিক সত্তার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, আত্মা যখন স্বীয় যাত্রাপথে ঈশ্বরের অনুসরণ করে, তখনই সেই সার্ব্বভৌম তাহার স্মরণ-পথে পতিত হয়। কথায় বলে, দর্শনের ডানা আছে ; বাস্তবপক্ষে দর্শনে ডানা থাকাই উচিত। কেন না, যেসব পদার্থ থাকাতে, ঈশ্বর বাস্তবিক ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, সেই সব পদার্থের সহিত—যতদূর সম্ভব— আত্মার স্মৃতি জড়িত।”

অতএব দেখা যাইতেছে, দার্শনিক চিন্তার বিষয় সমূহ—অর্থ আইডিয়া-সমূহ, ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান ; এবং উহাদের দ্বারাই, এ উহাদের সহযোগিতাতেই, ঈশ্বর বাস্তবিক ঈশ্বররূপে প্রতিভা

হয়েন ;—সেই ঈশ্বর যিনি ("সোফিষ্ট"-নামক গ্রন্থে প্লেটো বলেন) "পরম মহিমান্বিত পবিত্র জ্ঞানের অংশভাগী"।

ইহা তবে নিশ্চিত,—প্লেটোর প্রকৃত মতানুসারে, "আইডিয়া" বলিতে সেরূপ সত্তা নহে যাহা আমাদের মনের মধ্যেও নাই, প্রকৃতির মধ্যেও নাই, ঈশ্বরের মধ্যেও নাই, এবং যাহা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। না, তাহা নহে। বস্তুতঃ প্লেটোর মতে—আইডিয়া-সমূহ যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থের মূলতত্ত্ব ও নিয়ম, সেইরূপ মানবজ্ঞানেরও মূলতত্ত্ব। এই সকল আইডিয়া হইতেই মানব-জ্ঞান,—স্বকীয় আলোক, স্বকীয় নিয়ম, স্বকীয় উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে, ঈশ্বরের উপাধি-সমূহ অবগত হইয়াছে—অর্থাৎ, স্বয়ং ঈশ্বরকে অবগত হইয়াছে।

আমরা যে মতবাদটির ব্যাখ্যা করিলাম, বাস্তবপক্ষে প্লেটোই তাহার জনক এবং যে সকল প্রখ্যাত দার্শনিক তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা সকলেই এই মতের পক্ষপাতী।

খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্যার যিনি প্রথম প্রবর্ত্তক সেই সেণ্ট-অগস্টিন্, প্লেটোর একজন ভক্ত শিষ্য। প্লেটোর ন্যায় তিনিও সর্ব্বত্র এই কথা বলিয়াছেন যে, ঐশ্বরিক জ্ঞানের সহিত মানব-জ্ঞানের ও ঈশ্বরের সহিত সার সত্যের একটা দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। এমন কি, প্লেটোনিক মতবাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, তিনি সেণ্টজন্‌কেও ভৎর্সনা করিয়াছেন।

সেণ্ট অগস্টিন্, আইডিয়া-ঘটিত মতবাদটি সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে তিনি এইরূপ বলেন :—"আইডিয়া-সমূহই সমস্ত পদার্থের আদিম রূপ ও অপরি-বর্ত্তনীয় মূলকারণ। উহারা সৃষ্ট হয় নাই, উহারা নিত্য ও ধ্রুব, উহারা ঐশ্বরিক জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত; উহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন নহে; প্রত্যুত যাহা কিছু জন্ম-মরণশীল, উহারা তাহার ছাঁচ্।"

"যাহা কিছু এখানে রহিয়াছে, অর্থাৎ স্বস্ব জাতি-অনুসারে যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একএকটা বিশেষ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্টি—একথা কোন্ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন? এ কথা স্বীকার করিয়াও কি কেহ বলিতে পারে যে, ঈশ্বর বিনা-হেতু পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি কেহ তাহা বলিতে কিংবা মনে করিতেও না পারে, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিশেষ বিশেষ হেতু-বশতই পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অশ্ব-সত্তার হেতু ও মানব-সত্তার হেতু কখনই এক হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব, প্রত্যেক পদার্থই স্বকীয় বিশেষ বিশেষ হেতু বশতই সৃষ্ট হইয়াছে; এই সকল হেতু, স্রষ্টার চিন্তা ছাড়া আর কোথায় থাকিতে পারে? কেননা সৃষ্টি করিবার সময়, স্রষ্টার ব্যবহারার্থ এমন কোন আদর্শ-ছাঁচ্ তাঁহার গোচরে আসে নাই যাহা তাঁহার বাহিরে অবস্থিত। এরূপ মত পোষণ করিলে, ঈশ্বরের অবমাননা হয়।"

যদি সৃষ্টির ও সৃষ্ট পদার্থ সমূহের হেতুগুলি, ঐশ্বরিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি ঐশ্বরিক জ্ঞানে, নিত্য ও ধ্রুব ব্যতীত আর কিছুই না থাকে,— তাহা হইলে, সেই হেতুগুলি—যাহাকে প্লেটো আইডিয়া নামে আখ্যাত করিয়াছেন—তাহা নিত্য ও ধ্রুবতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যে ভাবে যাহা কিছু এখানে রহিয়াছে—সমস্তই সেই ধ্রুবতত্ত্বগুলিরই সহযোগিতায় উৎপন্ন।

এমন কি সেণ্ট টমাস,—যিনি প্লেটোর মত-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না, প্রত্যুত যিনি কতকটা অ্যারিস্‌টটলের প্রত্যক্ষবাদে দীক্ষিত ছিলেন—তাঁহার মুখ হইতেও নিম্নলিখিত উক্তিটি বাহির হইয়াছে:—"আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, ঐশ্বরিক জ্ঞানেরই এক-

প্রকার অংশভাগী; এই ঐশ্বরিক জ্ঞানের সহযোগিতাতেই, আমাদের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিচার-বুদ্ধি উৎপন্ন; এবং এই জন্যই উক্ত হইয়া থাকে—এখানকার যাহা কিছু সমস্তই আমরা ঈশ্বরে মধ্যে অবলোকন করি"। সেণ্টটমাসের এইরূপ আরো অনেক উক্তি আছে, যাহাতে প্লেটোনিকতার একটু আতিশয্য দৃষ্ট হইলেও উহা আসলে প্লেটোর মত নহে, পরন্তু আলেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের মত।

গভীর মৌলিকতা সত্তেও এবং সম্পূর্ণরূপে ফরাসীর জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, দেকার্ত্তের দর্শনতন্ত্র, প্লেটোনিক ভাবে অনুপ্রাণিত।

দেকার্ত্, প্লেটোর মত-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই। এমন কি, তিনি প্লেটোর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় না। তিনি আদৌ তাঁহার অনুকরণ করেন নাই; কোন বিষয়েই প্লেটোর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য নাই। তথাপি, প্রথম হইতেই, যেন দুইজনের একস্থানেই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে;—যদিও দেকার্ত্ত, ভিন্ন পথ দিয়া সেইখানে পৌঁছিয়াছেন।

প্লেটো যাহাকে সার্ব্বভৌম বলেন, আইডিয়া বলেন, দেকার্ত্তের নিকট তাহাই অসীমতার ধারণা—পূর্ণতার ধারণা। যখন তিনি আত্মচৈতন্যের দ্বারা উপলব্ধি করিলেন যে, "তিনি চিন্তা করিতেছেন অতএব তিনি আছেন," তখনি সেই আত্মচৈতন্যের দ্বারা ইহাও উপলব্ধি করিলেন যে তিনি অপূর্ণ;—তাঁহার অনেক ত্রুটি আছে, অভাব আছে, সীমা আছে, দুঃখ আছে। এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার ধারণা হইল যে, এমন-একটা কিছু আছে যাহা অসীম—যাহা পূর্ণ। কিন্তু এ ধারণাটি এমন কাহারও রচনা হইতে পারে না—যে নিজে অপূর্ণ। অতএব, কোন পূর্ণ পুরুষ তাঁহার অন্তরে এই ধারণাটি

সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত। এই পূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর। এই যুক্তি-প্রণালী অনুসারেই দেকার্ত্ত, নিজের চিন্তা ও সত্তা হইতে ঈশ্বর-তত্ত্বে সমুত্থিত হইয়াছেন। এই সরল যুক্তি-প্রণালীটি, তিনি তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে, বিবিধ আকারে বিবৃত করিয়াছেন। ফলতঃ উক্ত যুক্তির দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে এই ধারণাটির মূলে একটি উপযুক্ত কারণ-সত্তা বিদ্যমান। অর্থাৎ ধারণাটির ন্যায়, ধারণার মূলকারণটিও অসীম ও পূর্ণ। প্লেটো ও দেকার্ত্তের মধ্যে প্রথম প্রভেদ এই:—প্লেটোর মতে, আইডিয়া-সমূহ,—শুধু অমাদের মনের ধারণা নহে, উহা পদার্থ-সমূহেরও মূলতত্ত্ব। কিন্তু দেকার্ত্ত্ ও আধুনিক অন্যান্য দার্শনিকের মতে, উহা শুধু আমাদের মনের ধারণা। এবং এই সকল ধারণার মধ্যে, অসীম ও পূর্ণের ধারণাটি প্রথম স্থান অধিকার করে এই মাত্র।

দ্বিতীয় প্রভেদ এই—আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় বলিতে গেলে, বস্তুঘটিত মূলতত্ত্বের দ্বারা প্লেটো, আইডিয়াসমূহ হইতে ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে দেকার্ত্ত, কারণঘটিত মূলতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া, অসীম ও পূর্ণের ধারণা হইতে, সেই ধারণার মূলকারণে উপনীত হইয়াছেন যে মূল কারণটিও অসীম ও পূর্ণ। কিন্তু এই সমস্ত প্রভেদসত্ত্বেও, উহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ভূমি আছে; উহারা একজাতীয়; উহারা উভয়ই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে লইয়া যায়, এবং যে সকল আইডিয়া আমাদের অন্তরে নিঃসংশয়ে বিদ্যমান, সেই অত্যাশ্চর্য্য আইডিয়াগুলি, মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে তাঁহারই নিকট লইয়া যায় যিনি একমাত্র ঐ সকল আইডিয়ার আধার-বস্তু হইতে সমর্থ;—যিনি এই অসীমতা ও পূর্ণতা-সম্বন্ধীয় ধারণার প্রবর্ত্তক এবং নিজেও অসীম ও পূর্ণ। এই প্রকারে, দেকার্ত্তকেও, প্লেটো ও সেক্রেটিসের সহিত একপরিবারভুক্ত করা যাইতে পারে।

এই পূর্ণ ও অসীমের ধারণা-সম্বন্ধীয় মতবাদটি, সপ্তদশ শতাব্দীর দর্শনে একবার প্রবর্ত্তিত হইলে পর,—দেকার্ত্তের উত্তরবর্ত্তী দার্শনিকেরা এই মতটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন, যে ভাবে প্লেটোর উত্তরবর্ত্তী দার্শনিকেরা প্লেটোর আইডিয়া-সম্বন্ধীয় মতটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফরাসী-লেখক ম্যাল্‌ব্রাঁশ্ (Malebranche) তাঁহার লেখায় প্লেটোর ধরণধারণ কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক সময়ে, তিনি সুললিত ভাষায়, খুব উচ্চ ভাবের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সক্রেটিসের লেখায় যেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়, ম্যাল্‌ব্রাঁশের লেখায় তাহা আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, এই "আইডিয়া"-মতবাদের সহিত অনেক অত্যুক্তি মিশ্রিত করিয়া, ম্যালব্রাঁশ এই আইডিয়া-মতের যত ক্ষতি করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই।

তিনি যদি এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন যে,—অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সহিত মানব-প্রজ্ঞার ঘনিষ্ট যোগ থাকায়, প্রজ্ঞার মধ্যে যেমন একদিকে ব্যক্তিত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার মধ্যে এমনও একটা কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌম এবং যাহা থাকায় মনুষ্য, সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়;—তিনি যদি এই সীমাটুকুর মধ্যেই আপনাকে বদ্ধ রাখিতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি একটুও দ্বিধা না করিয়া, আমাদের জ্ঞান ও ঐশ্বরিক জ্ঞান এই উভয়কে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাছাড়া ম্যাল্‌ব্রাঁশের মতে, বিশেষ পদার্থ সমূহ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না,—"আইডিয়া" দ্বারা, চিৎ-প্রতিবিম্বের দ্বারাই জানিতে পারি;—আমরা যাহা সাক্ষাৎ-

ভাবে উপলব্ধি করি তাহা জড় নহে, তাহা চিৎ। দৃষ্টিব্যাপারে—মনোমধ্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তৎসমস্তই চিৎ-প্রতিবিম্ব অথবা চিদাভাস (idea) এবং যেহেতু চিৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান, অতএব ঈশ্বরের মধ্যেই আমরা সকল পদার্থ দর্শন করি। এরূপ সিদ্ধান্তে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই কিরূপ বিস্ময়-স্তম্ভিত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু প্লেটো ও তাঁহার এই অবিশ্বাসী শিষ্য—ইঁহাদিগকে এক শ্রেণীর বলিয়া মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয়-চেতনা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহকে সাক্ষাৎভাবেই উপলব্ধি করে; এই ইন্দ্রিয়-চেতনার দ্বারা যে বস্তু যেমনটি তাহাই আমরা দেখিতে পাই; অর্থাৎ উহাকে অসম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি। পরে উহা ক্রমাগত বিশ্লিষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া এমন-একটি জ্ঞানে আমাদিগকে উপনীত করে যাহা প্রকৃত জ্ঞান নামের যোগ্য। এই যে প্রজ্ঞা, যাহা ইন্দ্রিয়-চেতনা হইতে ভিন্ন, ইহাই আমাদের নিকট সার্ব্বভৌমকে প্রকাশ করে; এবং এইরূপে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা সারবান্ ও স্থায়ী জ্ঞান। সার্ব্বভৌম চিৎ-তত্ত্বে একবার উপনীত হইতে পারিলেই সেই সঙ্গে আমরা সেই ঈশ্বর-তত্ত্বেও উপনীত হই,—যাঁহাতে এই সার্ব্বভৌম চিৎ-তত্ত্বগুলি অধিষ্ঠিত;—যাঁহাতে গিয়া আমাদের যথার্থ-জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে, সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ, যাহা পরিবর্ত্তনশীল সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধি করিবার জন্য, চিৎ-তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয়ই যথেষ্ট। প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয়-চেতনা হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয় হইতে আমরা যে-একটু জ্ঞানলাভ করি তাহা অসম্পূর্ণ, প্রজ্ঞা এই অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে অতিক্রম করে। প্রজ্ঞা আমাদিগকে সার্ব্বভৌমিকে উপনীত করে; কেন না, প্রজ্ঞাতে এমন কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌম। এই

প্রজ্ঞা, ঐশ্বরিক জ্ঞানের অংশভাগী, কিন্তু স্বয়ং ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে; উহা ঐশ্বরিক জ্ঞান হইতে প্রকাশিত—নিঃসৃত; কিন্তু উহা ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে।

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা" নামক ফেনেলোঁর একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি ম্যাল্‌ব্রাঁশ ও দেকার্ত্ত এই উভয়েরই ভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি—প্রমাণ, পদ্ধতি, পারম্পর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে দেকার্ত্তীয় ধরণে লিখিত। উহাতে ম্যালব্রাঁশের ধরণও কতকটা আছে,—বিশেষতঃ "আইডিয়ার প্রকৃতি" বিষয়ক পরিচ্ছেদটিতে। এবং প্রথম-খণ্ডে, তত্ত্ববিদ্যা-ঘটিত আলোচনায়, ম্যাল্‌ব্রাঁশের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ফেনেলোঁ, উগ্রবুদ্ধি দার্শনিকদের সহিত এক পরিবারভুক্ত নহেন; তাঁহার মধুর আত্মা, উন্নত স্থানেই সর্ব্বদা বিচরণ করে। তাঁহার কতিপয় বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। উহার মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য এবং কোন্‌গুলি অত্যুক্তিদোষে দূষিত তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

"প্রথম খণ্ড ৪৪ পরিচ্ছেদ।—অসীমের ভাব ছাড়া, আমার মধ্যে আরও কতকগুলি সার্ব্বভৌম ও অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব ধারণা বিদ্যমান, যাহা আমাদের সমস্ত যুক্তিবিচারের মূল নিয়ম। উহাদের পরামর্শ না লইয়া আমরা কোন বিষয়ে বিচার করিতে পারি না, এবং উহাদের কথার বিরুদ্ধে, কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনে আমাদের অধিকার নাই। চিন্তার দ্বারা উহাদিগকে সংশোধিত কিংবা নিয়মিত করা দূরে থাক, আমাদের চিন্তাই উহাদের দ্বারা সংশোধিত হইয়া থাকে। উহারাই আমাদের মনের উচ্চতম নিয়ম। আমাদের সমস্ত চিন্তাই উহাদের বিচার নিষ্পত্তির অধীন। আমাদের মন যতই চেষ্টা করুক না,—

এ কথায় কখন সন্দেহ করিতে পারে না যে, "দুই আর দুয়ে চার হয়" কিংবা "সমস্তটা তাহার অংশ অপেক্ষা বড়"; কিম্বা "কোন-একটা পূর্ণ বৃত্তের কেন্দ্র, তাহার পরিধির সকল অংশ হইতেই সমান্ দূরে"। এই সকল প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিবার স্বাধীনতা আমার নাই। এই সকল তত্ত্ব যদি আমি অস্বীকার করি তাহা হইলে—আমার মধ্যে যে-একটি তত্ত্ব আছে যাহা আমাতে থাকিয়াও আমার অতীত—সেই তত্ত্বটিই আমাকে সিধা পথে আবার ফিরাইয়া আনে। এই ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বটি আমাদের অন্তরের এরূপ অন্তরতম দেশে অধিষ্ঠিত যে উহাকেই সহসা "আমি" বলিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু বস্তুত উহা আমার "আমি"র উর্দ্ধে অবস্থিত; কেন না, উহা আমাকে সংশোধন করে, সিধা করে, এমন কি আমাকে আমার নিজেরই বিরুদ্ধেই দাঁড় করাইয়া দেয়, উহা আমার অক্ষমতা সূচিত করে, উহা এমন একটা কিছু যাহা সর্ব্বদাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে —(অবশ্য যদি আমি তাহার কথার কর্ণপাত করি) তাহার কথায় আমি কখন প্রতারিত হই না। এই আভ্যন্তরিক তত্ত্বটিকে আমি প্রজ্ঞা বলি।"

৪৫ পরিচ্ছেদ। "বাস্তব পক্ষে আমার প্রজ্ঞা আমার অন্তরেই বিদ্যমান; কেন না, সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে, আমার অন্তরের মধ্যেই সর্ব্বদা অন্বেষণ করিতে হয়। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান আমাকে সংশোধন করে, যাহার পরামর্শ আমি গ্রহণ করি, সে জ্ঞান আমার নহে, আমার নিজের অংশও নহে। এই প্রজ্ঞা, পূর্ণ ও ধ্রুব; আমি অপূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল, আমি ভ্রম করিলেও উহার ভ্রম হয় না; আমার ভ্রম ঘুচিলে তবে উহার ভ্রম ঘুচে—এরূপও নহে। প্রজ্ঞা অপথে যায় না—আমাকেই যথাপথে ফিরাইয়া আনে। প্রজ্ঞাই

আমার অন্তরস্থ প্রভু—যে আমাকে চুপ্‌ করাইয়া দেয়,—আমাকে কথা কহায়,—আমাকে বিশ্বাস করায়—আমাকে সন্দেহ করায়—আমাকে ভ্রম স্বীকার করায়,—আমার সিদ্ধান্তকে স্থির রাখে। তাহার কথাতেই আমি শিক্ষা পাই,—আমার নিজের কথা শুনিলে আমি পথভ্রষ্ট হই। এই প্রভুটি সর্ব্বত্র বিদ্যমান; এবং জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সকল মনুষ্যই, আমার ন্যায় ইহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়।"

৪৬ পরিচ্ছেদ। "যাহা আমাদের অন্তরতম, যাহাকে আমাদের নিজস্ব বলিয়া মনে হয়—সেই প্রজ্ঞা বস্তুত আমাদের তত নিজের নহে;—উহা নিতান্ত ধার করা জিনিস্। বাতাস যেমন একটা বাহিরের বস্তু, অথচ আমরা সেই বাতাসকে নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রতিক্ষণ গ্রহণ করি, সেইরূপ প্রজ্ঞাকে আমরা অবিরত উপলব্ধি করিলেও উহা আমাদের অপেক্ষা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।"

৪৭ পরিচ্ছেদ। "এই অন্তরস্থ প্রভু—এই সার্ব্বভৌম প্রভু, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে আমাদের নিকট এইরূপেই সত্য প্রকাশ করেন। একথা সত্য, অনেক সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা কথা কহি—তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কথা কহি; কিন্তু তখনই আমরা ভ্রমে পতিত হই; তখনি আমাদের কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়;—আমাদের নিজের কথাই আমরা তখন নিজেই বুঝিতে পারি না; এমন কি আমরা ভয় করি, পাছে প্রজ্ঞার সংশোধনে আমাদের হীনতা প্রকাশ পায়। যে মনুষ্য, এই বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ প্রজ্ঞা কর্তৃক সংশোধিত হইতে ভয় পায়, যে তাহার কথা না শুনিয়া পথভ্রষ্ট হয়,—সে মনুষ্য অবশ্যই এই প্রজ্ঞা নহে;—সেই প্রজ্ঞা, যে মনুষ্যের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনুষ্যকে নিয়ত সংশোধন করে। সকল বিষয়ের মধ্যেই দুইটি মূলতত্ত্ব আমাদের

অন্তরে আমরা উপলব্ধি করি। তন্মধ্যে একটি দান করে—অপরটি গ্রহণ করে; একটি অভাব অনুভব করে, অপরটি সেই অভাব পূর্ণ করে; একটি ভ্রমে পতিত হয়, অপরটি সেই ভ্রম সংশোধন করে; একটি অতিমাত্র ঝুঁকিয়া স্বস্থান হইতে পরিচ্যুত হয়, অপরটি তাহাকে আবার খাড়া করিয়া তুলে; প্রত্যেক মনুষ্যই, একটা সীমাবদ্ধ জ্ঞান—একটা পরাধীন জ্ঞান আপনার অন্তরে অনুভব করে;—সেইরূপ একটা জ্ঞান,—যাহা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেই, পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ একটি উচ্চতর ধ্রুব নিত্য সার্ব্বভৌম জ্ঞানের অধীনে না আইসে ততক্ষণ সংশোধিত হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যই আপনার অন্তরে এমন একটা জ্ঞানের আভাস পায় যাহা সীমাবদ্ধ, যাহা বিভক্ত, যাহা ধার-করা; এবং যাহা এমন-একটা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে যাহার দ্বারা সে প্রতিমুহূর্ত্ত সংশোধিত হইতে পারে। এই একই প্রজ্ঞা সকলেরই মধ্যে বিভিন্নমাত্রায় বিদ্যমান; তন্মধ্যে কতকগুলি লোক জ্ঞানিপদবাচ্য; কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহারা একই মূল-উৎস হইতে প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহারা এই জ্ঞানের প্রসাদেই জ্ঞানী হইয়াছেন। এই জ্ঞানের তুলনা নাই—দ্বিতীয় নাই।”

৪৮ পরিচ্ছেদ। এই জ্ঞান—এই সর্ব্বসাধারণ জ্ঞান, যাহা মানুষের অন্য সমস্ত অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই জ্ঞানটি কোথায় আছে? এই দৈববক্তা যাহার বাক্যের বিরাম নাই—যাহার বিরুদ্ধে লোকের সমস্ত অন্ধসংস্কার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না—এই দৈববক্তাটি কোথায় আছেন? যাহার পরামর্শ সর্ব্বদা আবশ্যক হয়, যাহা মনুষ্যমাত্রকেই আলোক দান করে, সেই জ্ঞানটি কোথায় অধিষ্ঠিত? যেমন সূর্য্যের কিরণ মানব-চক্ষের উপাদান-বস্তু নহে, সেইরূপ আমাদের মনও আদিম জ্ঞান নহে,—সার্ব্বভৌম ধ্রুব সত্য নহে

শুধু উহা একটা দ্বারমাত্র—যাহার মধ্য দিয়া এই আদিম আলোক সঞ্চারিত হয় এবং সঞ্চারিত হইয়া উহাকে আলোকিত করে।”

৪৯ পরিচ্ছেদ। “দুই প্রকার জ্ঞান আমাদের অন্তরে আমরা উপলব্ধি করি; উহার মধ্যে একটি আমি স্বয়ং—অপরটি আমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আমার অন্তরস্থ জ্ঞানটি অতীব অপূর্ণ, অনিশ্চিত, ভ্রমাধীন, পরিবর্ত্তনশীল, সীমাবদ্ধ; উহার কিছুই আপনার নহে—সমস্তই ধার-করা। অপর জ্ঞানটি সার্ব্বভৌম এবং উহা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা পূর্ণ, নিত্য, ধ্রুব, সর্ব্বত্রপ্রকাশিত, ভ্রমসংশোধক, উহা কখন নিঃশেষিত হয় না, উহা বিভক্ত হয় না, অথচ উহাকে যে চায় সেই পায়। যাহা আমার এত নিকটে অথচ আমা-হইতে এত ভিন্ন—এই পূর্ণ জ্ঞানটি—এই পরম জ্ঞানটি কোথায় অধিষ্ঠিত?—অবশ্যই ইহা একটি বাস্তবিক সত্তা; আমরা যাহা অন্বেষণ করিতেছি, ইহাই কি ঈশ্বর নহেন?”

দ্বিতীয় ভাগ—১।২৪।২৯ পরিচ্ছেদ। “আমার মধ্যে একটি অসীমের ভাব—অসীম পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান—এই ভাবটি কোথা হইতে পাইলাম? যাহা আমা অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থিত—যাহা আমাকে অনন্তগুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে,—যাহা আমাকে আমার দৃষ্টি হইতে তিরোহিত করে—যাহা অসীমকে আমার নিকট উপস্থিত করে—তাহা কোথা হইতে আসিল? ইহাকে আমি কোথা হইতে পাইলাম?—পুনর্ব্বার বলি,—এই অসীমের প্রতিরূপটি—এই অসীম-কল্প পদার্থটি—সসীমের সহিত যাহার কোন সাদৃশ্যই নাই—ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহা আমারই অন্তরে বিদ্যমান, অথচ আমা অপেক্ষা অধিক; আমার নিকটে উহাই সমস্ত—উহার নিকটে, আমি কিছুই নয়, এইরূপ আমার মনে হয়। আমি উহাকে মুছিয়া ফেলিতে

পারি না, অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে পারি না, হ্রাস করিতে পারি না, উহার প্রতিবাদ করিতেও পারি না। উহা আমারই মধ্যে বিদ্যমান, অথচ আমি নিজে উহাকে আমার মধ্যে স্থাপন করি নাই,—আমি উহাকে আমার মধ্যে উপলব্ধি করি মাত্র। অন্বেষণ করিবার পূর্ব্বেই উহা আমার মধ্যে আপনিই আসিয়া রহিয়াছে; তাই আমি উহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহা চিরকালই সমানভাবে রহিয়াছে; আমি যখন উহাকে চিন্তাও করি না—অন্য বিষয় চিন্তা করি—তখনও উহা রহিয়াছে। যখনই অন্বেষণ করি তখনই আমি উহাকে পাই; উহা আমার উপর নির্ভর করে না; আমিই উহার উপর নির্ভর করিয়া আছি—এই অসীমের অসীম প্রতিরূপটিকে কে আমাকে দান করিল? উহা কি আপনা আপনি উৎপন্ন হইল? এই যে অসীমের অসীম-প্রতিরূপ, ইহার কি কোন মূল-রূপ নাই—ইহার কি কোন মূল কারণ নাই? বলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! একি অদ্ভুত ব্যাপার! অতএব এই সিদ্ধান্তটি অপরিহার্য্য—ইহা অসীম ও পূর্ণ সত্য; ইহা আমার ধারণায় সাক্ষাৎ ভাবে উপস্থিত হয়; যে অসীমের ধারণাটি আমার মনে আমি উপলব্ধি করি উহার মূলটিও অসীম”—

৪ পরিচ্ছেদ। “আমার ধারণাগুলিই আমি স্বয়ং; কেননা উহাই আমার জ্ঞান-পদার্থ। আমার ধারণাসমূহ এবং আমার অন্তরের অন্তরতম জ্ঞানপদার্থটি—এই উভয়ই আমার নিকট একই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে, আমার মন পরিবর্ত্তনশীল; উহা তাড়াতাড়ী একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়,—না বুঝিয়া বিশ্বাস করে; আপনার ধারণাগুলির সহিত ঐক্য করিয়াই যুক্তিবিচার নিষ্পন্ন করে—সেই সব ধারণা যাহা ধ্রুব ও নিত্য। কিন্তু আমার

চিৎ-প্রতিবিম্বগুলি আমি নই ;—আমার ধারণাগুলি আমি নই ! এই ধারণাগুলি তবে কি ?—এই ধারণাগুলিই কি ঈশ্বর ? আমার মন অপেক্ষা নিশ্চয়ই উহারা শ্রেষ্ঠ, কেননা উহারা মনকে সংশোধন করে,—যথাপথে স্থাপন করে। উহাদের ঐশ্বরিক প্রকৃতি ; কেননা, ঈশ্বরের ন্যায় উহারা সার্ব্বভৌম ও ধ্রুব। যাহা সার্ব্বভৌম ও ধ্রুব তাহাকে যতটা "অস্তি" বলা যায়, অতটা "অস্তি" অন্য কিছুরই সম্বন্ধে বলা যায় না ! যাহা পরিবর্ত্তনশীল, চলমান্, ধার-করা,—তাহাই যদি বাস্তব পদার্থ হয়,—তবে, যাহা ধ্রুব ও নিত্য, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা আরও কত না বাস্তব হইবে। অতএব দেখা আবশ্যক—আমাদের প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের চিৎ-প্রতিবিম্বগুলির মধ্যে, এমন কিছু আছে কি না যাহা বাস্তব-সত্তা-বিশিষ্ট ;—এমন-কিছু যাহা আমার মধ্যে আছে অথচ যাহা আমি নই, যাহা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; না ভাবিলেও যাহা আমার মধ্যে বর্ত্তমান ;—যাহার সহিত আমি একাকী বাস করিতেছি ; মনে হয় যেন আমি আমার নিজের সহিত বাস করিতেছি না ; যাহা আমা-অপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ, বেশী ঘনিষ্ঠ। না জানি সে কি অপূর্ব্ব পদার্থ যাহা এমন ঘনিষ্ঠ অথচ এমন দুর্জ্জেয়—সে ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?"

এক্ষণে অষ্টাদশ শতাব্দির খৃষ্টীয় আচার্য্যদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সারবান ও প্রামাণিক লেখক (Bossuet) বস্যুয়ে কি বলেন শুনা যাক্। তিনি তাঁহার "ন্যায়প্রকরণ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান" নামক গ্রন্থে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্যুয়ে তিন গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত, এরূপ বলা যাইতে পারে ; সেণ্ট অগষ্টিন্, সেণ্ট টমাস্, ও দেকার্ত্ত্। নাভারের মহাবিদ্যালয়ে, সেণ্ট টমাস্-প্রচারিত ঈষৎ-রূপান্তরিত অ্যারিষ্টলের মতবাদে তিনি

প্রথম দীক্ষিত হন, সেই সঙ্গে সেণ্ট অগষ্টিনের রচনাদি পড়িয়াও তাঁহার আত্মা পরিপুষ্ট হয়; এই সব প্রাচীন টুলো-সম্প্রদায়ের মত-বাদ ছাড়া সে সময়ে দেকার্ত্তের দর্শনতন্ত্রও খুব প্রসার লাভ করে। তিনি দেকার্ত্তের মতটিই অবলম্বন করেন; এবং সেই সঙ্গে অগষ্টিনের সহিত কতকটা সমন্বয় ও সেণ্ট টমাসের মত কতকটা রক্ষা করিতেও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে নূতন কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি সমস্তই অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সমস্তই মার্জ্জিত আকারে—পরিশোধিত আকারে গ্রহণ করিয়া-ছেন। তাঁহার ভাষার যেমন জোর, তেমনি তাঁহার লেখাতেও সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের সম্মুখে আমি অর্পণ করিব এবং তোমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে ম্যালব্রাঁশের লালিত্য অথবা ফেনেলোঁর অফুরন্ত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা আর একটা ভাল জিনিস দেখিতে পাইবে। সে কি?—না;—সুস্পষ্টতা ও শব্দাদির যথাযথ-প্রয়োগ।

যে প্রকরণের দ্বারা, মূল-ধারণাগুলি হইতে,—সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহ হইতে,—ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, ফেনেলোঁ সেই প্রকরণটি ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। বস্যুয়ে বেশ জোরের সহিত ও পূর্ণমাত্রায় সেই প্রকরণটির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও সেই একই মূলতত্ত্বের দোহাই দিতেছি,—সেই মূলতত্ত্ব যাহা হইতে বিষয়ীপুরুষের কতকগুলি উপাধি—সত্তা-বিশেষের কতকগুলি গুণ আছে বলিয়া সিদ্ধ হয়; সেই মূল-তত্ত্ব হইতে, এইরূপে সিদ্ধ হয় যে, নিয়ন্তার মধ্যে কতকগুলি আদি-নিয়ম রহিয়াছে,—সনাতন পুরুষের মধ্যে, কতকগুলি নিত্যতত্ত্ব অনন্ত-

কাল ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে। বসুয়ে,—সেণ্ট আগষ্টিন্ হইতে, এমন কি প্লেটো হইতেও বাক্য সকল প্রমানস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্লেটোর "আইডিয়া" যাহা বাস্তবপক্ষে ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত—তাহাকে সতন্ত্র সত্তাবান্ বলিয়া পাছে কেহ অভিহিত করে এই জন্য তিনি গোড়া হইতেই প্লেটোর আইডিয়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

ন্যায়-প্রকরণ—প্রথম খণ্ড, ৩৬ পরিচ্ছেদ···"যখন আমরা বলি, ঋজুভুজ-ত্রিকোণ এমন-একটা আকার যাহা তিনটি ঋজুভুজের দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং যাহার তিনটি কোণ, উহার দুই ঋজু ভুজের সমান—কিছুমাত্র কমও নহে, বেশীও নহে; ইহার পরেই যখন আমরা তিন ভুজ বিশিষ্ট ও তিন সমান কোণ-বিশিষ্ট সমভুজ-ত্রিকোণের আলোচনা করি তখন উহা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে উক্ত ত্রিকোণের প্রত্যেক কোণ—একটি ঋজু কোণের কম। আবার যখন একটি ঋজু কোণ আলোচনা করিয়া দেখি, পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণাগুলির সহিত সংযুক্ত এই ঋজু-কোণের ধারণার মধ্যে এই তত্ত্বটি স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, এই ত্রিকোণের দুই কোণ অগত্যা তীক্ষ্ণমুখী এবং এই দুই কোণ ঠিক একটি ঋজু কোণের সমান,—বেশীও নহে, কমও, নহে; এই ধারণাটির মধ্যে কিছুই আগন্তুক নহে, পরিবর্ত্তনশীল নহে; অতএব এই ধারণাগুলি, নিত্যতত্ত্ব সমূহেরই প্রতিরূপ। এরূপ সম-ভুজ অথবা ঋজুকোণ ত্রিকোণ, প্রকৃতি-রাজ্যে যদি নাও থাকে, তথাপি আমরা যে সকল তত্ত্ব এইমাত্র আলোচনা করিলাম, সেই তত্ত্বগুলি সত্য ও সংশয়বিরহিত। ফলত, আমি একটা সমভুজ অথবা ঋজু-কোণ ত্রিকোণ

কখনও দেখিয়াছি কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। মানুষের হাত যতই কেন নিপুণ হউক না, কম্পাস কিম্বা রুলের দ্বারা এমন কোন রেখা টানা যাইতে পারে না যাহা একেবারে ঋজু; কিম্বা ভুজ-গুলি ও কোণগুলি এরূপ হইতে পারে না যাহা সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সহিত সমান। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা চোখে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের আঁকা রেখাগুলি ঠিক্ ঋজুও নহে, ঠিক্ ধারাবাহিকও নহে—সুতরাং ঠিক্ সমান নহে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা সমভুজ ও ঋজু কোণ-বিশিষ্ট ত্রিকোণের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ মাত্র; তাই ঐরূপ ত্রিকোণ প্রকৃতিরাজ্যে আছে কি না কিংবা মানুষের হাতে রচিত হইতে পারে কি না, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

ইহা সত্বেও, ত্রিকোণের যে প্রকৃতি ও গুণসকল আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিরপেক্ষভাবেই সত্য ও সংশয়রহিত;—তাহার প্রমাণের জন্য জগতে-বিদ্যমান কোন বাস্তব ত্রিকোণের অপেক্ষা রাখে না। সকল কালেই এই তত্ত্বগুলি বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সুতরাং ইহা নিত্য সত্য। তা ছাড়া, যেহেতু মানব-বুদ্ধি সত্যকে উৎপাদন করে না, পরন্তু সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য তাহার দিকে শুধু মুখ ফিরাইয়া থাকে; অতএব সমস্ত সৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি যদি ধ্বংস হইয়াও যায়, তবু এই সকল সত্য অপরিবর্ত্তিতভাবেই অবস্থিতি করিবে।”

২৭ পরিচ্ছেদ। “যেহেতু, ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নিত্য নহে, ধ্রুব নহে, স্বতন্ত্র নহে,—অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, এই সব সত্য আপনাদের মধ্যে অবস্থিতি করে না,—কেবল ঈশ্বরে-তেই অবস্থিতি করে; সেই সব নিত্য তত্ত্ব চিৎ-সত্তার মধ্যেই অবস্থিতি করে,—যাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে।”

“আমাদের প্রস্তাবিত এই সকল নিত্য সত্যগুলিকে আরো

প্রকৃত সত্যরূপে দাঁড় করাইবার জন্য, কেহ কেহ এইরূপ কল্পনা করেন যে, ঈশ্বরের বাহিরে কতকগুলি নিত্য সারসত্তা আছে। ইহা একটা নিছক্ ভ্রান্তি। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে ঈশ্বরই সকল সত্তার মূল; তাঁহারই জ্ঞানশক্তি হইতে বিবিধ সত্তা উৎপন্ন হয়; তাঁহারই জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বাদিম চিৎ-কল্পনাগুলি অবস্থিতি করে—অথবা সেণ্ট অগষ্টিন যেরূপ বলেন,—নিত্য বস্তুসমূহের হেতুগুলি অবস্থিতি করে।"

"এইরূপ, স্থপতি-শিল্পীর মানসপটেও একটা বাড়ীর কল্পনা অঙ্কিত থাকে; সেই বাড়ীটি শিল্পী আপনার অন্তরেই দেখিতে পায়; এই আভ্যন্তরিক আদর্শের নকলে নির্ম্মিত বাড়ীগুলা ধ্বংস হইয়া গেলেও, তাঁহার সেই মানসী অট্টালিকা ধ্বংস হয় না; এবং যদি এই শিল্পী নিত্যপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার বাড়ীর কল্পনা ও হেতুটিও নিত্য হইবে। মর্ত্ত্য শিল্পীর কথা ছাড়িয়া দিয়া অমর শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার কথা ধর; সেই বিশ্বকর্ম্মার অপরিবর্ত্তনীয় ধ্যানের মধ্যে একটা আদিম পরা-শিল্পকলার আদর্শ চিরবিদ্যমান;—উহাই সকল পরিমাণের, সকল নিয়মের, সকল সুষমার, সকল যুক্তির, সকল সত্যের মূলপ্রস্রবণ। এই সব নিত্যকালের সত্য যাহা আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়,—ইহা বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; যাহাতে আমরা বাস্তবিক পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারি, এইজন্য প্লেটো সেই সব আইডিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; সেই সব আইডিয়া—যাহা গঠিত হয় না, যাহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে; যাহা জন্মায় না, কলুষিত হয় না, যাহা আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, আবার আপনিই লয় হয়—যাহা নিত্যকাল বিদ্যমান। প্লেটো বলেন ইহা সেই মানস জগৎ, যাহা সৃষ্টজগতের পূর্ব্বে বিধাতার চিত্তাকাশে অবস্থিতি

করে, এবং উহাই সেই অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ যাহার নকল এই মহতী বিশ্ব-রচনা। সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য, প্লেটো আমাদিগকে এই সব নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, জন্ম-জরার অতীত "আইডিয়ার" নিকট যাইতে বলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন এই আইডিয়াগুলি, ঐশ্বরিক আইডিয়ারই প্রতিরূপ,—তাঁহা হইতেই সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন, উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া আইসে না; ইন্দ্রিয় উহাদিগকে আমাদিগের চিত্তে প্রকাশ করে মাত্র,—গড়িয়া তোলে না। কেন না, আমরা কোন নিত্যবস্তু প্রত্যক্ষ দেখি নাই, অথচ নিত্যবস্তুর ধারণা আমাদের মনে স্পষ্ট রহিয়াছে—অর্থাৎ চিরকাল সমান রহিয়াছে; পূর্ণ ত্রিকোণ আমরা কখন দেখি নাই, অথচ স্পষ্টরূপ উহা বুঝিতে পারি, সংশয়-রহিত বিবিধ তত্ত্বের দ্বারা উহা আমরা সিদ্ধ করি। এই সমস্ত কিসের নিদর্শন? প্লেটো বলেন, এই সমস্ত আইডিয়া যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া আইসে না—ইহা তাহারই নিদর্শন।"

বস্যুয়ে-কৃত "ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের আলোচনা।" ৪ পরিচ্ছেদ —৫ প্যারাগ্রাফ:—"আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্যতত্ত্ব সমূহই বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়। পরিমাণ-ঘটিত যে সকল নিয়মের দ্বারা আমরা সমস্ত পদার্থ পরিমাপ করিয়া থাকি, তৎসমস্তই নিত্য ও ধ্রুব। আমরা স্পষ্টরূপে জানি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহার পরিমাণ—হয় খুব বৃহৎ, নয় খুব ক্ষুদ্র; হয় খুব সবল, নয় খুব দুর্ব্বল; এবং আমরা ইহাও জানি এই সকল পরিমাণের সহিত নিত্যতত্ত্ব সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গণিত-শাস্ত্রে কিংবা অন্য যে-কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে যাহা কিছু প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তৎসমস্তই নিত্য ও ধ্রুব। কেন না, প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা শুধু ইহাই প্রদর্শিত হয়,—যাহা প্রমাণসিদ্ধ তাহাই ঠিক, তাহা ব্যতীত আর কিছুই

হইতে পারে না। তাছাড়া,—যে সকল বস্তুর সহিত আমরা পরিচিত, তাহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম জানিবার জন্য,—যেমন মনে কর, একটা ত্রিকোণ, একটা চতুষ্কোণ, একটা বৃত্ত—ইহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম জানিবার জন্য, অথবা ঐ সকল আকৃতির মধ্যে কিরূপ পরিমাণের নিয়ম আছে তাহা জানিবার জন্য,—প্রকৃতি-রাজ্যে, ঐ প্রকার আকৃতি বাস্তবিক আছে কি না, জানিবার প্রয়োজন হয় না। ঐ সকল আকৃতির পূর্ণ আদর্শ আমি কখনও দেখি নাই, ইহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। অথবা, গতিক্রিয়ার প্রকৃতি জানিবার জন্য, কিংবা ঐ প্রত্যেক গতিক্রিয়ায় যে সকল রেখা-পথ অনুসৃত হয় তাহার প্রকৃতি জানিবার জন্য, কিংবা যে প্রচ্ছন্ন পরিমাণ-নিয়মে ঐ গতি-ক্রিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল পরিমাণ-নিয়ম জানিবার জন্য,—প্রকৃতি-রাজ্যে ঐরূপ কোন গতি-ক্রিয়া বাস্তবিক আছে কি না তাহা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। এই সকল বস্তুর ধারণা আমার মনে যখনি প্রকাশ পাইল অমনি আমি জানিলাম—উহার বাস্তব সত্তা থাকুক বা না থাকুক,—উহা ঐরূপই হইবে; উহার অন্য কোন প্রকৃতি হওয়া অসম্ভব; উহা অন্য কোন প্রকারে গঠিত হওয়া অসম্ভব। যাহার সহিত আমাদের আরও নিকট-সম্বন্ধ—সেই বিষয়টিও এই সকল নিত্য তত্ত্বের দ্বারা আমাদের বোধগম্য হইয়া থাকে। যখন কোন মনুষ্য থাকিবে না, আমিও থাকিব না, তখনও জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে চলা,—জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য মাত্রেরই মুখ্য কর্ত্তব্য; স্বীয় জন্মদাতা ঈশ্বরকে বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য;—এই জন্য কর্ত্তব্য, পাছে তাঁহাকে না জানিবার দরুণ আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ত্রুটি হয়। এই সকল সত্য, এবং অন্যান্য সত্য যাহা আমরা নিঃসংশয়

যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করি, তাহা ত্রিকাল-নিরপেক্ষভাবে অবস্থিতি করে। যে কোন-কালেই মানব-বুদ্ধিকে স্থাপন কর না কেন, ঐ সকল সত্য মানব-বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইবে; মানব-বুদ্ধি ঐ সকল সত্য জানিতে পারিবে। মানব বুদ্ধি ঐ সকল সত্যকে উৎপাদন করে না—প্রাপ্ত হয় মাত্র। আমাদের জ্ঞান, জ্ঞেয় বিষয়কে সৃষ্টি করে না,—জ্ঞেয় বিষয় আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় মাত্র। অতএব এই সকল সত্য যুগযুগান্তরের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল; যখন কোন মানব বুদ্ধির অস্তিত্ব ছিল না,—তখনও বিদ্যমান ছিল। পরিমাণের নিয়মানুসারে এখানে যাহা কিছু অবস্থিত, অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা প্রকৃতি-রাজ্যে দেখিতে পাই, আমি ছাড়া তৎসমস্তই ধ্বংস হইয়া গেলেও, এই সকল পরিমাণের নিয়ম আমার মনোমধ্যে সংরক্ষিত হইবে এবং তখনও আমি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব যে, এই সকল নিয়মই নিত্যকালের সুনিয়ম, নিত্যকালের সারসত্য, এমন কি, অন্যান্য বস্তুর সহিত আমিও যদি ধ্বংস হইয়া যাই, তথাপি উহা নিত্য-কালের সুনিয়ম—নিত্যকালের সারসত্যরূপেই অবস্থিতি করিবে।"

"এখন যদি আমি অন্বেষণ করি, কোথায় এবং কোন্ বস্তুতে এই সব নিত্য ও ধ্রুব তত্ত্বসমূহ অবস্থিতি করে, তাহা হইলে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইব, এমন একটি বস্তু আছে যাহাতে মূল-সত্য নিত্যকাল হইতে বিদ্যমান; যাহার মধ্যে এই সকল সত্য চিরকাল উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঐ বস্তুই সাক্ষাৎ সত্য; উহার বাহিরে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু সত্য বলিয়া আমরা উপ-লব্ধি করি,—তৎসমস্তই উহা হইতে উৎপন্ন।

ঐ বস্তুর মধ্যেই আমি এই নিত্য সত্যগুলি দেখিতে পাই; এবং উহাকে দেখিতে হইলে, যাহা ধ্রুব সত্য—পূর্ণ সত্য সেই দিকেই

আমাদের মুখ ফিরাইতে হয়, এবং এইরূপে আমরা সত্যের আলোক প্রাপ্ত হই।

এই নিত্য বস্তুই ঈশ্বর, নিত্যকাল হইতে বিদ্যমান, নিত্যকাল হইতে সত্তাবান্—নিত্যকাল হইতে মূলসত্যরূপে অবস্থিত। এই নিত্যবস্তুতেই নিত্যতত্ত্বসমূহ প্রতিষ্ঠিত। ঐখানেই আমি নিত্যতত্ত্ব সকল দেখিতে পাই, আমার ন্যায় সকল মনুষ্যই দেখিতে পায়, এবং চিরকাল উহাদিগকে ধ্রুবভাবে আমাদের সমক্ষে দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বে ছিলাম না; আমাদের একটা আরম্ভ আছে; কিন্তু ইহা আমরা জানি, এই সত্য নিত্যকাল হইতে বিদ্যমান। এইরূপে আমরা এমন একটি আলোক প্রাপ্ত হই যাহা আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর; এই উচ্চতর আলোক দিয়াই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা ভাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি; অর্থাৎ আমাদের জীবনের উপাদানস্বরূপ যে সকল মূলতত্ত্ব বিদ্যমান তদনুসারেই আমরা কাজ করি কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সেইখানেই—অন্যান্য সত্যের সঙ্গে, আমাদের আচরণের ধ্রুব নিয়ম সকলও দেখিতে পাই; আরও দেখিতে পাই, আমাদের কতকগুলি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আছে; এবং যে সকল বিষয় আমাদের পক্ষে স্বভাবতঃ ভালও নহে মন্দও নহে, সেই সব বিষয় সম্বন্ধে, মানব-সমাজের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, তদনুবর্ত্তী হওয়াই প্রকৃত কর্ত্তব্য। এইরূপে ধনী ব্যক্তিরা, ভাষা ও আচার-ব্যবহারসম্বন্ধে যেরূপ দেশপ্রথার অধীন হইয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরাধিকার ও শান্তিরক্ষার জন্যও রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রই আপনার অন্তরে একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের আদেশ-বাণী শুনিতে পায়; সেই নিয়ম বলে:—কাহারও প্রতি অন্যায় করা

উচিত নহে; তোমার প্রতি অন্যায় করিলেও তুমি কাহারও প্রতি অন্যায় করিবে না। যে মনুষ্য এই সকল সত্য উপলব্ধি করে, সে সেই সকল সত্যের দ্বারাই আপনাকে বিচার করে, এবং সেই সকল সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেই, আপনাকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করে। আরও ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, ঐ সকল সত্যই মনুষ্যকে বিচার করে; কেন না, এই সকল সত্য মানুষের বিচার-নিষ্পত্তির অনুবর্ত্তী নহে, প্রত্যুত মানুষের বিচারনিষ্পত্তি ঐ সকল সত্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। মানুষ জানে যে, তাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে তাহার বিচারনিষ্পত্তি কখনই ধ্রুব হইতে পারে না, তাই সে ঐ সকল নিত্য সত্যকেই বিচারের মূল-নিয়মরূপে বরণ করে, এবং উহাদেরই সাহায্যে সে ঠিক্ বিচার করিতে সমর্থ হয়।

এই সমস্ত নিত্যতত্ত্ব—যাহা বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধ হয়, যাহা চির-কাল একই প্রকার—যাহা দ্বারা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি নিয়মিত হয়—উহাতে কতকটা ঈশ্বরাংশ আছে, অথবা উহাই স্বয়ং ঈশ্বর।

সুতরাং এই সত্যসমূহের কিয়দংশ মনুষ্যের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হওয়া আবশ্যক, এবং স্বয়ং মনুষ্যই এই সমস্ত সত্যের ধ্রুব প্রমাণ। কেন না, মনুষ্য যখন আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অথবা তাহার চতুর্দ্দিকে যে সকল সত্তা বিদ্যমান, সেই সকল সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন সে দেখিতে পায়,—সকলেই কতকগুলি ধ্রুব নিয়মের অধীন—সত্যমূলক কতকগুলি ধ্রুব নীতির অধীন। মনুষ্য আপ-নাকে আপনি উৎপাদন করে নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্রতম অংশও উৎপাদন করে নাই,—এ কথা মনুষ্য জানে। মনুষ্য জানে,—যদি এই সকল নিয়ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হইত, তাহা হইলে

কোন-কিছুই হইতে পারিত না; মনুষ্য উপলব্ধি করে,—এমন এক অনন্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যাহার মধ্যে সমস্ত সুশৃঙ্খলা ও সমস্ত সুষমার মূল বীজ নিহিত। এই সকল সত্যের মধ্যে এতাদৃশ পারস্পর্য্য, এই সকল বস্তুর মধ্যে এতাদৃশ সামঞ্জস্য,—এই জগতের মধ্যে এতাদৃশ সুব্যবস্থা, অথচ এই পারস্পর্য্য, এই সামঞ্জস্য, এই সুব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে এমন কেহ নাই—এ কথা নিতান্তই অসঙ্গত। মনুষ্য কিছুই সৃষ্টি করে নাই,—মনুষ্য এ সমস্ত উপলব্ধি করিতেছে মাত্র—তাও আবার সম্পূর্ণরূপে নহে। কাজেই মনুষ্যের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এমন একজন কেহ আছেন যিনি এই সকল সত্য পূর্ণভাবে জানিতেছেন এবং যাঁহা হইতে ঐ সমস্ত উৎপন্ন।”

উক্ত পরিচ্ছেদের ৬ সংখ্যক "প্যারা”টি সম্পূর্ণরূপে দেকার্ত্তীয় ধরণের:—উহাতে বসুয়ে এইরূপ প্রমাণ করিয়াছেন যে,—যেহেতু মানব-আত্মা জানে, তাহার নিজের জ্ঞান অপূর্ণ, অতএব আর কোথাও এমন-কোন জ্ঞান অবশ্যই আছে যাহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ।

উক্ত পরিচ্ছেদের ৯ প্যারাগ্রাফে, ঈশ্বরের সহিত সত্যের কি সম্বন্ধ—এই বিষয়ে বসুয়ে আবার নূতনভাবে আলোচনা করিয়াছেন:—

“সত্যের এই বিশুদ্ধ ভাবটি আমার মনে কোথা হইতে আসিল? যে সকল ধ্রুব নিয়ম, আমাদের বিচারযুক্তিকে পরিচালিত করে, চরিত্রনীতি গঠিত করে, যাহার দ্বারা আমাদের চিত্ত, আকৃতি-বিশেষের ও গতিবিশেষের প্রচ্ছন্ন পরিমাণ আবিষ্কার করে—এই সকল নিয়ম মানব-চিত্তে কোথা হইতে আসিল? এক কথায়—যে

সকল নিত্যসত্য সম্বন্ধে আমরা এত আলোচনা করিতেছি—এই সকল নিত্যসত্য মনুষ্যের মনে কোথা হইতে আসিল? যে সকল ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ও বৃত্তের আকৃতি আমরা স্থূলভাবে কাগজে অঙ্কিত করি, উহাদের পরিমাণ ও সম্বন্ধ কি পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে অঙ্কিত আছে? অথবা, উহা অপেক্ষা, আর কোন সঠিক আদর্শ আছে যাহা হইতে এই সকল আকৃতি আমাদের মনে প্রতিভাত হয়? এই সকল ত্রিকোণ ও বৃত্ত, জগতের ভিতরে কিংবা বাহিরে—কোথাও কি সম্পূর্ণ-বিশুদ্ধ আকারে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহারই ভাব কি আমাদের মনে অঙ্কিত রহিয়াছে? এবং এই সকল যুক্তির নিয়ম ও আচারণের নিয়ম এমন কোথাও কি অবস্থিতি করিতেছে যেখান হইতে তাহাদের ধ্রুব সত্যতা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে? বরং ইহাই কি ঠিক্ নহে,—যিনি, পরিমাণ, সামঞ্জস্য, এমন কি সত্যকে, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই উহাদের ধ্রুব ভাব আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন? * * * অতএব এইরূপ বুঝিতে হইবে,—আমাদের আত্মা, ঈশ্বরের আদর্শে গঠিত;—তাই, সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ; সে সত্য স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত; আত্মা সেই মূল-আদর্শের দিকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকেই মুখ ফিরাইয়া থাকে; যতটুকু সত্য প্রকাশ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ততটুকু সত্যই আত্মার নিকট প্রকাশিত হয় * * * ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মানুষ এই সকল সত্য উপলব্ধি করিতেছে অথচ ইহা বুঝে না যে, সমস্ত সত্য ঈশ্বর হইতেই আসিতেছে, সমস্ত সত্য ঈশ্বরেই অবস্থিতি করিতেছে, এবং সেই সত্য ঈশ্বর স্বয়ং * * * ইহা নিশ্চিত,—যাহা কিছু আছে,—যাহা কিছু জগতে পরিব্যক্ত রহিয়াছে, ঈশ্বরই সেই সমস্তের মূল-কারণ; তিনিই মূলসত্য।

অনন্ত স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই সত্যের সত্যতা; সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা তাঁহাকেই অন্বেষণ করি, সত্যকে লাভ করিতে গিয়া আমরা তাঁহাকেই লাভ করি।"

৫ পরিচ্ছেদ—১৪ প্যারা; ইন্দ্রিয়াদি আমাদের আত্মায় সত্যের জ্ঞান আনয়ন করে না; ইন্দ্রিয়াদি উহাকে উদ্দীপ্ত করে, প্রকাশিত করে, কতকগুলি কার্য্যফল জানাইয়া দেয় মাত্র। মানব-আত্মা কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কোন উচ্চতর জ্ঞানালোক ছাড়া—অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া, কোন মূল কারণ, কোন যোগবন্ধন, কোন মূল-তত্ত্ব আর কোথাও সে খুঁজিয়া পায় না। অতএব ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ; ইনি সকলের মনে নিত্য প্রতিভাত হইয়া থাকেন—ইনিই জ্ঞানের প্রকৃত উৎস; ইহাঁ হইতেই জ্ঞান আলোক লাভ করে, ইহাঁর দ্বারাই জ্ঞান নিশ্বাস গ্রহণ করে, ইঁহার দ্বারাই জ্ঞান জীবন ধারণ করে।"

সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে লাইব্‌নিজ্ (Leibnitz) এই বিষয়-সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে সাক্ষ্যের চূড়ান্ত হইয়াছে—আমা-দের সাক্ষ্যসংগ্রহ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

তিনি তাঁহার "জ্ঞানক্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তা" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক তত্ত্বগুলি ঈশ্বরের উপাধি। তিনি বলেন;—"মানুষ, মূলতত্ত্ব পর্যান্ত আরোহণ না করিয়া তত্ত্বসমূহের সমীচীন ব্যাখ্যা করিতে পারে—এরূপ আমি বোধ করি না। মূলতত্ত্বে পৌছিলে, ব্যাখ্যা করিবারও আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেন না, উহাই ঈশ্ব-রের চরম উপাধি।"

"দার্শনিক মূলতত্ত্ব" নামক তাঁহার আর এক গ্রন্থে তিনি একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "নিত্যসত্যসমূহ এবং যে সকল তত্ত্ব এই

নিত্যসত্যকে অবলম্বন করিয়া আছে তৎসমস্তই ঐশ্বরিক জ্ঞানের অন্তর্ভূত।”

আর এক গ্রন্থে এইরূপ আছে;—“কতকগুলি স্কচ্-দার্শনিক যে বলিয়াছেন,—যদি সমস্ত জ্ঞান অন্তর্হিত হয়—এমন কি, যদি ঐশ্বরিক জ্ঞানও অন্তর্হিত হয়, তথাপি এই নিত্য তত্ত্বগুলি থাকিবে—এ কথা বলিবার আমি কোন আবশ্যকতা দেখি না। কেন না, আমার বিবেচনায়, এই সকল নিত্য তত্ত্বের সত্যতা, ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।”

আর এক গ্রন্থে তিনি বলেন;—“সত্তার ধারণার ন্যায়, মূলতত্ত্বের ধারণাও আমাদের অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। এই মূলতত্ত্বগুলি ঈশ্বরের উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং এ কথাও বলা যাইতে পারে,—ঈশ্বর স্বয়ং যেরূপ সকল সত্তার মূলতত্ত্ব, সেইরূপ এই সকল মূলতত্ত্বও সকল সত্যের প্রস্রবণ।”

আর এক স্থলে আছে:—“কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—কোন আত্মা-পুরুষ না থাকিলে, এই সকল মূলতত্ত্ব কোথায় থাকিত? কেন না, কোন আত্মাপুরুষ থাকিলে তবেই এই সকল নিত্য সত্যের সত্যতা বাস্তবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই প্রশ্নটি অবশেষে আমাদিগকে তাবৎ সত্যের চরম ভিত্তিমূলে লইয়া যায়;—সেই পরমপুরুষের দিকে—সেই সার্ব্বভৌম পরমাত্মার দিকে লইয়া যায়—যাঁহার জ্ঞান, বাস্তবপক্ষে নিত্য সত্য-সমূহের অধিষ্ঠানভূমি এবং যাহা অগষ্টিন-মুনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া, এই সব কথা এমন জীবন্ত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ না ভাবেন, ইহার পুনরালোচনায় কোন প্রয়োজন নাই। এই সকল অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের মধ্যে, সমস্ত সত্তার পরিচালক জ্ঞান ও নিয়ামক মূলসূত্র—এক

স্থায়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম নিহিত আছে কি না তাহা আলোচনা রা আবশ্যক। যেহেতু এই সকল অবশ্যম্ভাবী সত্য, সমস্ত আগন্তু ত্তার পূর্ব্ববর্ত্তী ; অতএব এই সকল অবশ্যম্ভাবী সত্য, কোন অবশ্য-ম্ভাবী সত্তার মধ্যে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের অন্তরে যে কল সত্য মুদ্রিত রহিয়াছে তাহার মূল-আদর্শ আমি সেই সত্তার মধ্যেই দেখিতে পাই;—প্রতিজ্ঞার আকারে নহে, পরন্তু মূল-প্রস্র-বণের আকারে”।

এইরূপে প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া লাইব্‌নিজ্‌ পর্য্যন্ত বড় বড় সকল দার্শনিকেরাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সার-সত্য সার-সত্তারই উপাধি। যেমন সত্যকে ছাড়িয়া আমরা ঈশ্বরকে বুঝিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা সত্যকে বুঝিতে পারি না। মানব জ্ঞান ও পরম-জ্ঞান—এই উভয়ের মধ্যে সত্য এক প্রকার মধ্যবর্ত্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত। সত্তার নিম্নতম ধাপ হইতে উচ্চতম ধাপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বিদ্যমান ; কেন না, সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু সত্য আছে। প্রকৃতি-রাজ্য আলোচনা করিয়া দেখ ; যে সকল নিয়মের দ্বারা প্রকৃতি নিয়মিত হইতেছে, যে সকল নিয়ম প্রকৃতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সকল নিয়মে আরোহণ কর ; যতই তুমি ঐ সকল নিয়মের মধ্যে তলাইতে পারিবে, ততই তুমি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে। বিশেষতঃ মানুষকে আলোচনা করিয়া দেখ ; প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ আরো বড় ; কেন না, মানুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে সমুৎপন্ন। মানুষ ঈশ্বরকে জানে, প্রকৃতি ঈশ্বরকে জানে না। সর্ব্বত্রই সত্যকে অন্বেষণ কর, সত্যের অনুরাগী হও, এবং সত্যকে সেই অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও—যিনি সত্যের মূল-প্রস্রবণ। যতই তুমি সত্যকে জানিবে, ততই তুমি ঈশ্বরকেও

জানিতে পারিবে। বিজ্ঞান, মানুষকে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করা দূরে থাক্—বিজ্ঞানই মানুষকে ধর্ম্মপথে লইয়া যায়। নিয়মাদি-সম্বলিত সমস্ত ভৌতিক বিজ্ঞান, সূক্ষ্মধারণাদি-সহকৃত সমস্ত গণিতবিদ্যা, বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্র—যাহা সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি না করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারে না—এই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান, ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার যেন এক একটি ধাপ - যেন এক-একটি মন্দির, যেখানে ঈশ্বরের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী নিত্যকাল হইতে অর্পিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু এই সকল উচ্চ তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া, দুইটি ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে; এই ভ্রমের হস্ত হইতে আপনাকে সামলাইতে হইবে। অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিও এই ভ্রম হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারেন নাই। একটি ভ্রম,—মানুষের জ্ঞানকে নিছক্ ব্যক্তিগত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা; দ্বিতীয় ভ্রম,—সত্য ও ঐশ্বরিক জ্ঞানকে এক করিয়া ফেলা—উভয়কে একত্র মিশাইয়া ফেলা। যদি মানব-জ্ঞান নিছক্ ব্যক্তিগতই হয়, তাহা হইলে, যাহা কিছু ব্যক্তিগত তাহা ভিন্ন মানুষ আর কিছুই বুঝিতে পারে না; যাহা তাহার ব্যক্তিত্ব-সীমাকে ছাড়াইয়া যায় তাহা তাহার আদৌ বোধগম্য হইতে পারে না। তাহা হইলে মানব-জ্ঞান যে শুধু সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী কোন সত্যেতে পৌঁছিতে পারে না তাহা নহে; পরন্তু, যেমন সূর্য্য আছে বলিয়া কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না, সেইরূপ, ঐপ্রকার কোন সত্যসম্বন্ধে মানবজ্ঞানের কোনরূপ ধারণাই হইতে পারে না। এমন কোন শক্তি নাই,—এমন কি ঈশ্বরেরও শক্তি নাই যে, সেই স্থলে, ঐ-প্রকার কোন সত্য, মানুষকে উপলব্ধি করাইতে পারে যাহা তাহার প্রকৃতির একান্ত

বিরুদ্ধ। কেন না, আমাদের চিত্তকে ঈশ্বর যদি শুধু জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে না;—আমাদের চিত্তের গঠন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বদ্‌লাইতে হইবে,—একটা নূতন বৃত্তি তাহাতে যোগ করিয়া দিতে হইবে। পক্ষান্তরে, যে সত্য পরমজ্ঞানের বিষয়, যে সত্যের মূলতত্ত্ব স্বয়ং ঈশ্বর, মানব-জ্ঞানকে সেই সত্যের স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে না; আমরা মাল্‌বাঁশের মত, মানব-জ্ঞানকে এতদূর অব্যক্তিগত করিয়া দাঁড় করাইতে পারি না। সত্যই সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তিগত—মানব-জ্ঞান কিন্তু সেরূপ নহে। মানব-জ্ঞান ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা মানুষের মধ্যেই অবস্থিত; এই জন্যই মানব-জ্ঞান ব্যক্তিগত ও সীমাবদ্ধ;—কিন্তু তাহার মূল অনন্তের মধ্যেই নিহিত। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অধিষ্ঠিত বলিয়া সেই হিসাবে মানব-জ্ঞান ব্যক্তিগত; অথচ, সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যসমূহের ধারণার জন্য, মানব-প্রকৃতির মধ্যে কি-জানি-কেমন একপ্রকার সার্ব্বভৌমতারও লক্ষণ বিদ্যমান। তাই, যে রকম ভাবে দেখা যায় তদনুসারে, কখন বা মানব-জ্ঞানকে অতি দীন, কখন বা অতি উচ্চ বলিয়া আমাদের মনে হয়। মানব-জ্ঞানের পক্ষে সত্য একপ্রকার ধার-করিয়া-পাওয়া জিনিস্; কিন্তু সত্য আসলে আর এক জ্ঞানের বিষয়; অর্থাৎ সেই পরম-জ্ঞানের বিষয়,—যাহা নিত্য ও অকৃত,—এমন কি যাহা স্বয়ং ঈশ্বর। আমাদের মধ্যে যে সত্য রহিয়াছে, উহা আমাদের ধারণার বিষয়,—আমাদের বাসনার বিষয়। ঈশ্বরের মধ্যে ঐ সত্য—ন্যায়, দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতি উপাধিরূপে বিদ্যমান। সে কথা বিশেষকরিয়া পরে আলোচনা করা যাইবে। ঈশ্বর আছেন; যে পরিমাণে তিনি আছেন, সেই পরিমাণে তিনি চিন্তাও করেন; তাঁহারই চিন্তা—এই সকল সত্য।

তিনি যেমন নিত্য সত্য, তাঁহার চিন্তাগুলিও সেইরূপ নিত্য সত্য।

এই সকল সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের মধ্যে প্রতিফলিত; এবং উহা উপলব্ধি করিবার জন্য মানব-জ্ঞান বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে। সত্যই ঈশ্বরের পুত্র, সত্যই ঈশ্বরের বাণী—আমি প্রায় বলিতে যাইতে ছিলাম, সত্যই ঈশ্বরের ক্রিয়া-পদ। "আইডিয়া"-বাদ মানুষের নিকট ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়াছে—মানুষকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া গিয়াছে, তাই প্লেটো, "ঈশ্বরের অগ্রদূত"—এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই এই আইডিয়া-বাদ অগষ্টিন্‌-মুনির এত প্রিয়; সেইজন্যই বসুয়েরও নিকট ইহার এত আদর। এই মতবাদটির সমীচীন ব্যাখ্যা করিয়া, আধুনিক কালের আলোকে পরিশোধিত করিয়া, এখন ইহাকে যেরূপ আকারে দাঁড় করান হইয়াছে তাহাতে বড় বড় পুরাতন দর্শনতন্ত্রের সহিত—খৃষ্টধর্ম্মের সহিত—ইহা এক্ষণে একসূত্রে গ্রথিত।

সত্যের বিজ্ঞান, যে চরম সমস্যাটি উপস্থিত করিয়াছে তাহা এই:—আমরা সার সত্যের ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বরই আধারবস্তু, ঈশ্বরই পরমজ্ঞান, ঈশ্বরই পরম কারণ, ঈশ্বরই এই সমস্ত সত্যের সমবায়,—ঐক্যস্থল। এই ঈশ্বর—এই ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—যাহার পর অন্বেষণ করিবার আর কিছুই নাই।

পঞ্চম উপদেশ।

যোগবাদের গুহ্যতন্ত্র।

যে সকল শক্তি ও নিয়ম এই জড়জগৎকে অনুপ্রাণিত করিতেছে—পরিশাসিত করিতেছে, অথচ যাহা নিজে জড় নহে—সেই সকল শক্তি ও নিয়মের উপর যখন আমরা মনোনিবেশ করি, অথবা মনের নিকট যে সকল সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্য প্রকাশ পায়, অথচ যাহা নিজে মন নহে—সেই সকল সত্য যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমাদের জ্ঞান স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই সকল বিশ্বনিয়ম ও বিশ্বশক্তির একজন জ্ঞানবান পরিচালক আছেন।

আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করি না; পরন্তু আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে এই যে আশ্চর্য্য বহির্জগৎ প্রসারিত, এবং আরো এক আশ্চর্য্যতর জগৎ আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত—এই দুই জগতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সেই বিশ্বাসের মূলে, অনুমানের দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি। এই যুগল পথ দিয়া আমরা ঈশ্বরে উপনীত হই। ইহাই সকল মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক পথ। সুস্থ, প্রকৃতিস্থ দর্শনশাস্ত্রের নিকটেও এই পথটিই প্রশস্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি দুর্ব্বলচিত্ত লোক আছে যাহারা সে পর্য্যন্ত যাইতে পারে না; অথবা এমন কতকগুলি দুর্বিনীত স্পর্দ্ধাবান লোকও আছে যাহারা সেই পর্য্যন্ত গিয়া সেইখানেই থামিতে পারে না। অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, উহারা দৃষ্ট বস্তু হইতে অদৃষ্ট বস্তুর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহসী হয় না। অথচ তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাহারা কি করে? একটা কোন ঘটনা দেখিলেই তাহার একটা

কারণ আছে বলিয়া কি তাহারা স্বীকার করে না? এমন কি, সেই কারণ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, সেই কারণের সত্তা কি তাহারা মানিয়া লয় না? কারণকে প্রত্যক্ষ না করিয়াও, সেই কারণে তাহারা বিশ্বাস করে, এবং সেই বিশ্বাসের মূলেই, তাহারা সেই কারন-সত্তার অবশ্যম্ভাবী ধারণায় উপনীত হয়। মনুষ্য ও জগৎ—এই দুইটি ব্যাপারও বিনা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে না—যদিও সেই কারণ আমাদের দৃষ্টির অগোচর, স্পর্শেরও অগ্রাহ্য।

কোন প্রকার যুক্তির পাকচক্র ব্যতীত, যাহাতে আমরা প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে, সসীম হইতে অসীমে, অপূর্ণ হইতে পূর্ণে উপনীত হইতে পারি; তা ছাড়া, যে সকল সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যের দ্বারা আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত-সেই সকল সত্য হইতে, যাহাতে তাহদের নিত্য ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বে পৌঁছিতে পারি, এই জন্যই আমরা প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছি। ঐ পর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের দৌড়,—আমাদের জ্ঞানের স্বাভাবিক ও বৈধ প্রসর-সীমা। যে প্রমাণের উপর এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আমাদের জ্ঞান তাহার কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাহার দরুণ সেই প্রমাণের কোন লাঘব হয় না; তাহার বলবত্তা অপ্রতিহতই থাকে। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল জ্ঞান-বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যে ব্যক্তি সংশয় করিতে—বিরোধ করিতে পরাঙ্মুখ, তাহার নিকট ঐ প্রমাণই যার পর নাই বলবৎ। জ্ঞানের প্রতি বিদ্রোহী হইলে, তাহার শাস্তি হাতে হাতে পাওয়া যায়। মিথ্যা জ্ঞানের শাস্তিস্বরূপ আমরা অসংযত আতিশয্যের পথে নীত হই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই যদি আমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিশ্বাস নিবদ্ধ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়;—তখন তাহা

হৈতে যে কোন প্রকারে হউক, আমরা বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা রি,এবং আর একটা কোন অভিনব জ্ঞানের পন্থা বাহির করিবার জন্য লালায়িত হই। পূর্ব্বে যাহারা অদৃশ্য ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতে াহস পায় নাই, তাহারাই এখন স্পর্দ্ধা করিয়া,—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের ায়, চৈতন্য-গ্রাহ্য বিষয়ের ন্যায়,—ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগ নবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রজ্ঞাকে সংশয় করা, প্রজ্ঞাবান ীবের পক্ষে একটা বিষম দুর্ব্বলতা। সহজ জ্ঞানের পথে হতাশ হইয়া, অবশেষে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যোগ নিবদ্ধ করিবার ল্পনা করা নিতান্তই ধৃষ্টতা সন্দেহ নাই। এই যে নৈরাশ্য-প্রসূত হত্যাকাঙ্ক্ষা-দুষ্ট কল্পনা - ইহাই যোগবাদের গুহ্যতত্ত্ব। (Mysticism)

এই অলীক কল্পনার পরিপোষণে একটু বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই, আমরা যে পথ ধরিয়াছি, সেই পথ হইতে এই কল্পনাটিকে সাধ্যমতে অপসারিত করা আবশ্যক মনে করি। এই গুহ্যতত্ত্বটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের খুব সংলগ্ন। ইহার অলীক মহত্ত্বে, অনেক সাধু-আত্মা বিমুগ্ধ হইয়া বিপথে যাইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই আমরা ইহার নিরাকরণে এত সমুৎসুক। বিশেষত আমাদের এই যুগ অবসাদের যুগ। বেশী আশা করিয়া লোকে যখন দারুণ নৈরাশ্যে পতিত হয়—যখন মানব-জ্ঞানের নিজস্ব শক্তিতে বিশ্বাস হারায়, অথচ ঈশ্বরের অভাব অনুভব করে, তখন এই অবিনশ্বর অভাবটি পূরণ করিবার উদ্দেশে, তাহারা নিজের জ্ঞান ছাড়া আর সকলেরই দ্বারস্থ হয়; ঈশ্বরে উপনীত হইবার যে একমাত্র পথ উন্মুক্ত—সেই পথটি না চিনিয়া, এবং যাহা অসঙ্গত—যাহা অসম্ভব—সেইরূপ কোন একটা নূতন পথ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়;—আকাশ-কুসুমকে ধরিবার জন্য সহজ জ্ঞানের বাহিরে আপনাকে নিঃক্ষেপ করে।

এই যোগবাদের মধ্যে,—জ্ঞানের স্থলে এক প্রকার নির্ব্বীর্য্য সন্দেহবাদ এবং সেই সঙ্গে একটা অন্ধবিশ্বাসও নিহিত আছে। যে সকল অকাট্য নিয়মে মানব-প্রকৃতি আবদ্ধ, সেই সকল নিয়ম পর্য্যন্ত যোগবাদীরা বিস্মৃত হয়েন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে ঈশ্বরকে দর্শন করা, সত্যের সত্য বলিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা—ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হয় না, তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। বাহ্যজগতে ঈশ্বর-সত্তার বিবিধ অভিব্যক্তি ও নিদর্শনমাত্র দেখিয়া যোগবাদীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না; তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে চাহেন; তাঁহারা কখন বা ভাবরসের দ্বারা, কখন বা অন্য কোন অপূর্ব্ব উপায়ের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে চাহেন। যেহেতু যোগবাদে ভাবরসের সমধিক প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, অতএব ভাবরস জিনিসটা কি—ভাবরসের প্রকৃতি কি, তাহা প্রথমেই আলোচনা করা আবশ্যক। মানব-প্রকৃতির এই কৌতূকাবহ অংশটি এ পর্য্যন্ত কেহ ভাল করিয়া অনুশীলন করে নাই।

ভাবরসকে ইন্দ্রিয়বোধ হইতে পৃথক্ করা আবশ্যক। একভাবে দেখিতে গেলে—চেতনা দুই প্রকার। একটি বহির্মুখী;—উহার দ্বারা বহির্জগতের প্রতিবিম্ব-সমূহ আত্মার নিকট প্রেরিত হয়; এবং অপরটি অন্তর্মুখী; উহার সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। একটির যোগ বহিঃপ্রকৃতির সহিত; অপরটির যোগ আত্মার সহিত। একটির দ্বারা বহির্ব্যাপার—অপরটির দ্বারা অন্তর্ব্যাপার সকল উপলব্ধ হয়। আমরা যখন কোন সত্য আবিষ্কার করি, তখন আমাদের মধ্যে এমন-একটা কিছু থাকে—এই আবিষ্কারে যাহার সুখানুভব হয়। আমরা কোন সৎকর্ম্ম করিলে সেই সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমরা

। আত্মপ্রসাদ অনুভব করি, তাহা শারীরিক সু.খর ন্যায় তীব্র না উক, তাহা অপেক্ষা অধিক সুকুমার—অধিকতর স্থায়ী। জ্ঞান-চতন্যময় আত্মার এমন একটি বিশেষ যন্ত্র থাকা অবশ্যক যাহার দ্বারা তাহার সুখ দুঃখ বোধ হইতে পারে। আত্মচৈতন্যের অবস্থাভেদে, সুখ দুঃখেরও তারতম্য হইয়া থাকে। শারীরিক ও মানসিক - এই দ্বিবিধ ভাবরসের একটা গভীর উৎস আমাদের অন্তরেই বিদ্যমান; উহার দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তাহাই পরিব্যক্ত হয়। পশুরা ইন্দ্রিয়বোধের পরপারে যাইতে সমর্থ হয় না —এবং বিশুদ্ধ মননক্রিয়াও দেব-প্রকৃতি ছাড়া আর কোথাও সম্ভবে না। যে ভাবরস ইন্দ্রিয়-বোধ ও মননক্রিয়া—এই দুয়ের আংশিক মিশ্রণে উৎপন্ন, সেই ভাবরসই মনুষ্যের নিজস্ব বস্তু। একথা সত্য,—ভাব জ্ঞানের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এই প্রতিধ্বনি কখন কখন জ্ঞানের মূল-ধ্বনি অপেক্ষা আরো সূক্ষ্মরূপে শোনা যায়। কেন না, ভাব,—আত্মার অন্তরতম অংশে, সুকুমারতম অংশে, প্রতিধ্বনিত হইয়া, সমগ্র মানুষটিকে কাঁপাইয়া তুলে।

ইহা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখনি জ্ঞান কোন সত্যকে উপ-লব্ধি করে, অমনি সে তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে—তাহাকে ভাল বাসে। এ ব্যাপারটি সর্ব্ববাদীসম্মত; ইহাতে কোন সংশয় নাই। বাস্তবিকই আত্মা সত্যকে ভাল বাসে। এ এক চমৎকার ব্যাপার! কোন এক ক্ষুদ্র জীব,—যে, জগতের একটা সুদূর কোণে পড়িয়া আছে, বাধা বিঘ্নের সহিত যাহার নিয়ত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, নিজেরই ভাবনা-চিন্তায় যাহার যথেষ্ট ব্যাপৃত থাকিতে হয়, আপনার জীবনকে সুরক্ষিত ও একটু বিভূষিত করিবার জন্য যাহার নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হয়—সেই জীব কি না এমন কোন

কিছুকে ভাল বাসিতে সমর্থ যাহার সহিত তাহার আসলে কোন সম্পর্ক নাই—যাহা নিরবচ্ছিন্ন অদৃশ্য জগতের জিনিস। সত্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম, তাহারই মহত্বের সাক্ষ্য দেয়—যে এই সত্যকে ভালবাসে।

জ্ঞান আর একটু বেশী দূর যায়; জ্ঞান সত্যকে জানিয়াও সন্তুষ্ট নহে—এমন কি, সারসত্যকে জানিয়াও সন্তুষ্ট নহে। সত্যের চিরন্তন মূলতত্ত্বের সহিত যতক্ষণ সত্যের যোগবন্ধন না হয় ততক্ষণ সত্যকে ঠিক জানা হয় না;—সত্য বস্তু আসলে যাহা, তাহার উপলব্ধি হয় না। সত্যের চরম মূলতত্ত্বে পৌঁছিলেই জ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না, তখন সে এমন একটা সীমায় আসিয়া পৌঁছে যাহা দুরতিক্রমনীয়। তখন তাহার আর কিছু পাইবার থাকে না—অন্বেষণ করিবার থাকে না। সুতরাং জ্ঞান সেইখানে আসিয়াই থামিয়া পড়ে। জ্ঞানের চিরসহচর ভাবও জ্ঞানকে বরাবর অনুসরণ করিয়া চলে। জ্ঞান যেরূপ সত্যের চরম মূলতত্ত্বে আসিয়া বিশ্রাম করে, ভাবও সেইরূপ অনাদি অনন্ত পুরুষে আসিয়া তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হয়।

আমরা যখন সসীম বস্তুকে ভাল বাসি,—এমন কি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে ভাল বাসি—তখন আসলে আমরা সেই অসীমকেই ভাল বাসি। আমরা এতই অসীমে আকৃষ্ট, অসীমে মুগ্ধ যে, যতক্ষন না আমরা অসীমের অমৃত-উৎসে উপনীত হই, ততক্ষণ আমরা তৃপ্তিলাভ করি না। আমরা অসীমকে চাহি বলিয়াই আমাদের হৃদয় আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। আমাদের প্রচণ্ড আবেগ সমূহের অন্তঃস্তলে—লঘু বাসনা-সমূহের অন্তঃস্তলে, এই অসীমের ভাব রস—এই অসীমের আকাঙ্খা বিদ্যমান। তারকা-

খচিত নভোমণ্ডলের সম্মুখে আত্মা যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে; যশোলিপ্সা, উচ্চাকাঙ্খা প্রভৃতি হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগ-সমূহের সহিত যে বিষাদ-নৈরাশ্য অনুস্যূত,—এসমস্তে, অসীমের আকাঙ্ক্ষা একটু বেশী সূচিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নীচ চপল প্রেম—পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে আসক্ত হইয়া, জ্বলন্ত বাসনা, সুতীব্র উদ্বেগ, দুঃখময় নৈরাশ্যের মধ্যে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করে, তাহার মধ্যেও অসীমের আকাঙ্ক্ষা গূঢ়ভাবে নিহিত।

ভাব ও জ্ঞানের মধ্যে এই বিষয়ে আর একটু বিশেষত্ব আছে। কি কাজ করিতে যাইতেছে, কি বস্তু উপলব্ধি করিতেছে, কি ভাব অনুভব করিতেছে তাহার প্রতি প্রথমে লক্ষ্য না করিয়া, মন একেবারেই স্বীয় বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়! কিন্তু আমাদের চিন্তাবৃত্তির সহিত, অনুভব-বৃত্তির সহিত, ইচ্ছা-বৃত্তিও বিদ্যমান। মন, ইচ্ছা করিলে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিতে পারে; আপনার চিন্তা ও ভাবসমূহের আলোচনা করিতে পারে, তাহার অনুমোদন কিংবা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, কিংবা তাহা পুনরুৎপাদন করিয়া তাহার উপর একটা নূতনত্বের ছাপ দিতে পারে। স্বতঃস্ফূর্ত্তি ও চিন্তালোচনা—এই দুইটি বুদ্ধিবৃত্তির মুখ্য বিকল্প। এই দুইটি এক নহে। কিন্তু একটা হইতে আর একটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মূলে উভয়ের মধ্যে একই জিনিস বিদ্যমান। যাহা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহাই তমসাচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল; চিন্তালোচনাই সমস্ত বিষয়কে সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট করিয়া তুলে। কিন্তু চিন্তালোচনা, জ্ঞানের প্রথম সোপান নহে। জ্ঞান সত্যকে সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই যখন জ্ঞান, ধারণামাত্র হইতে

সত্তায় পৌঁছে, সত্যের প্রকৃত বিষয়ের সহিত সত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখনও জ্ঞান কিছুই তলাইয়া দেখে না—একটা গভীর অতলস্পর্শের তলদেশে সে যে উপনীত হইয়াছে সে বিষয়ে তাহার একটু সন্দেহ পর্য্যন্ত হয় না। তাহার মধ্যে যে গূঢ় শক্তি নিহিত আছে, শুধু সেই শক্তির বলেই সে এই কার্য্য সম্পন্ন করে; তাহার পর,—আপনার কাজে আপনিই বিস্মিত হয়। তাহার পর আবার যখন জ্ঞান, স্বকীয় স্বাধীনতার বলে আপনার কৃত কার্য্যের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, যাহা একবার স্বীকার করিয়াছে তাহা আবার অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয়—তখন সে আরো আশ্চর্য্য হয়। এইখানেই, মিথ্যা তর্কজল্পনার সহিত সহজ বুদ্ধির—মিথ্যা বিজ্ঞানের সহিত, স্বতঃসিদ্ধ সত্যের,—সু-দর্শনের সহিত কু-দর্শনের, যুঝাযুঝির সূত্রপাত হয়। এ সমস্তই স্বাধীন চিন্তার ফল। ভ্রমে পতিত হওয়াই স্বাধীন চিন্তার একটি উন্নততর অধিকার—একটি শোচনীয় অধিকার। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, স্বাধীনচিন্তাই সেই রোগের ঔষধ। যদিও জ্ঞান, স্বভাবসিদ্ধ সত্যকে অস্বীকার করিতে সমর্থ, তথাপি সে প্রায়ই উহাকে অনুমোদন করে; অল্পই হউক বেশীই হউক একটু ঘোরপাক্ পথ দিয়া আপনাতেই আবার ফিরিয়া আইসে। মানব-প্রকৃতিসিদ্ধ বৃত্তি-সমূহের বিরুদ্ধে স্বাধীনচিন্তা যতই চেষ্টা প্রয়োগ করুক না কেন, শেষে সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিই প্রায় জয়লাভ করে; স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মূলতত্ত্বসমূহে আবার ফিরিয়া আইসে। গোড়ায় যাহা ছিল, শেষে তাহাই থাকিয়া যায়। কেবল, গোড়ার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যাপারে যে একটি শক্তি আছে, সে শক্তিটি আত্মবিস্মৃত; এবং চিন্তালোচনা-সমুৎপন্ন ব্যাপারের মধ্যে যে শক্তি প্রকটিত হয়, সে শক্তিটি আপ

নাকে আপনি জানে—এই মাত্র প্রভেদ। একটিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানের জয়, আর একটিতে চিন্তাপ্রসূত বিজ্ঞানের জয়।

ভাব—যাহা জ্ঞানের চিরসহচর, সেইভাব সম্বন্ধেও এই একইরূপ ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়।

জ্ঞানের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের বৃত্তিও অনন্তকে অনুসরণ করে; প্রভেদ এইমাত্র—কখন কখন হৃদয় অনন্তকে না জানিয়াও অনন্তকে অন্বেষণ করে; এবং কখন কখন,—যে প্রেমের যন্ত্রনায় হৃদয় কষ্ট পায়, সেই প্রেমের অবসান হইয়াছে বলিয়াও হৃদয় উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু যদি সেই প্রেমের সহিত আবার বিচার-বিতর্ক সংযোজিত হয়; এবং বিচার দ্বারা যদি এইরূপ স্থির হয় যে, তাহার প্রেম যোগ্যপাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই প্রেম ক্ষীণ হওয়া দূরে থাক্—আরও দৃঢ়ীভূত হয়। প্লেটো বলেন, তাহাতে প্রেমের স্বর্গীয় পাখা ছাঁটা হয় না, বরং প্রেম আরো পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু যদি তাহার প্রেমাস্পদ, সুন্দরের শুধু ছদ্মবেশ ধারণ করে,—শুধু যদি সে আত্মার তৃষা উদ্দীপিত করে,—পরিতৃপ্ত করিতে না পারে, তখন বিচারবিতর্ক আসিয়া, সেই প্রেমের কুহক ছুটাইয়া দেয়,—সেই প্রেমের গন্ধর্ব্ব-নগরকে ভাঙ্গিয়া দেয়। প্রেমের ভিত্তি কতটা দৃঢ় তাহা না জানিয়া, প্রেমকে বিচার-বিতর্কের হস্তে সমর্পণ করিতে সাহস হয় না। কন্দর্প! তুমি শুধু তোমার সুখই দেখিও;—সুখের রহস্যের মধ্যে কখনও তলাইবার চেষ্টা করিও না। যে অদৃশ্য প্রেমাস্পদের প্রেমে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, তাহার প্রচণ্ড আলোক হইতে তুমি আপনাকে দূরে রাখিও; সেই সাংঘাতিক দীপের প্রথম আলোকেই তোমার প্রেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে—প্রেম পলায়ন করিবে। প্রশান্ত নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের পর,—বিষাদের অনুচরবর্গ-

সমভিব্যাহারে বিচার বিতর্ক যখনি আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই হৃদয়ের পুত্তলী হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বাইবেল-গ্রন্থে যে জ্ঞান-বৃক্ষের কথা বর্ণিত হইয়াছে—ইহাই বোধ হয় তাহার গূঢ় অর্থ। বিজ্ঞানের পূর্ব্বে—বিচার বিতর্কের পূর্ব্বে, নির্দ্দোষিতা ও বিশ্বাসের জন্ম। গোড়ার জ্ঞান ও বিচার-বিতর্ক হইতেই,—সংশয়, উদ্বেগ, অর্জ্জিত বিষয়ের উপর বিরক্তি, অধীর ভাবে অজ্ঞাত পদার্থের অনুসরণ, মন ও আত্মার উদ্বেগ, দারুণ চিন্তা ও জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত দোষের উৎপত্তি। তাহার পর প্রকৃত বিজ্ঞান আসিয়া সেই নির্দ্দোষিতার স্থান—ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অবোধ-সরল বিশ্বাসের স্থান অধিকার করে। ঐ সমস্ত মোহবিভ্রম উত্তীর্ণ হইয়া প্রেম অবশেষে স্বকীয় প্রকৃত প্রেমাস্পদের নিকট উপনীত হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমের মধ্যে একটি অজ্ঞতার মাধুর্য্যশ্রী আছে—একটি সুখের কমনীয়তা আছে। কিন্তু বিচার-সহকৃত প্রেম ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা গুরুগম্ভীর,—ইহা মহান্; এমন কি, ইহার দোষগুলির মধ্যেও গাম্ভীর্য্য আছে, মহত্ব আছে;—এ মহত্ব স্বাধীনতার মহত্ব। আমরা যেন তাড়াতাড়ি বিচার-বিতর্কের প্রতি দোষারোপ না করি। উহা হইতে অনেক সময় যেমন আত্মপ্রীতি উৎপন্ন হয়, তেমনি আবার আত্মোৎসর্গের ভাবও প্রসূত হইয়া থাকে। এই আত্মোৎসর্গের অর্থ কি? জানিয়া-শুনিয়া, স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে দান করাই প্রকৃত আত্মোৎসর্গ। ইহাই প্রেমের উচ্চ উদার ভাব; এই প্রকার প্রেমই উদারচেতা মহৎ ব্যক্তির যোগ্য। অনভিজ্ঞ প্রেম—অন্ধ প্রেম সেরূপ কখনই নহে। যখন ভালবাসা আত্ম-প্রীতির উপর জয়লাভ করে, তখন সে স্বকীয় প্রেমাস্পদকে নিজের জন্য ভালবাসে না;—সেই প্রেমাস্পদের জন্য সে আপনাকে

কাতরে দান করে। প্রেমের এই এক অদ্ভুত কাণ্ড—যতই সে য়, ততই সে আরো পায়। এইরূপে আত্মবলিদানেই আপনাকে রিপুষ্ট করে; এবং আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়াই, আপ-ার সমস্ত শক্তি ও আনন্দকে নিঃশেষিত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু একজন মাত্র আছেন যিনি এইরূপ ভালবাসার যোগ্যপাত্র—যাঁহাকে ভালবাসিলে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে হয় না, আশা-ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না, অনুশোচনার সম্ভাবনা থাকে না, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে হয় না। তিনি সেই পূর্ণ পুরুষ। একমাত্র তিনিই বিচার-বিতর্ককে ভয় করেন না—এবং একমাত্র তিনিই আমাদের হৃদয়ের সমস্ত স্থান পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ। ভাবরসের শক্তিসামর্থ্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া গুহ্যতন্ত্র গোড়াতেই মনুষ্যের জ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে; অন্ততঃ জ্ঞানকে ভাবের অধীনে স্থাপন করিয়া ভাবের চরণে জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দেয়।

গুহ্যতন্ত্র কি বলে, শোনা যাক্ :—"ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যোগ কেবল হৃদয়-সূত্রেই। তাঁহাতে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু অসীম, যাহা কিছু নিত্য—তাহা প্রেমই আমাদের নিকট প্রকাশ করে। জ্ঞানবৃত্তি অলীকবাদী; যেহেতু জ্ঞান বিপথে গমন করিতে পারে এবং প্রায়ই বিপথে গমন করিয়া থাকে; অতএব উহা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—বিপথে গমন করাই জ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ;—উহা চিরকালই বিপথে গমন করিবে।" আসল কথা, অনেক সময় যাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহার সহিত জ্ঞানকে একীভূত করা হয়। ইন্দ্রিয়াদির ভ্রমপ্রমাদ, যুক্তির ভ্রমপ্রমাদ, কল্পনার বিভ্রম, এমন কি

রিপুর আবেগবশে মন কখন কখন যে সব উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা পোষণ করে—তৎসমস্তই জ্ঞানের স্কন্ধে চাপানো হইয়া থাকে। জ্ঞানের নানাবিধ ত্রুটি দেখিয়া কেহ কেহ জয়োল্লাস প্রকাশ করেন—জ্ঞানের দুঃখদৈন্য প্রদর্শন করিয়া পরিতোষ লাভ করেন; ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত যোগ স্থাপন করা যে তন্ত্রের দুরাকাঙ্ক্ষা সেই উদ্ধত মতান্ধ দর্শনতন্ত্র জ্ঞানকে খণ্ডন করিবার নিমিত্তই, সংশয়বাদের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র ধার করিয়া আনে।

গুহ্যতন্ত্র আরো বেশী দূর যায়। গুহ্যতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতাকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। যাঁহার সহিত আমাদের অনন্ত ব্যবধান, তাঁহার সহিত প্রেম-সূত্রে একীভূত হইবার জন্য গুহ্যতন্ত্র আত্মবিসর্জ্জনের উপদেশ দেন। ধর্ম্মের যে আদর্শ-অনুসারে, কোন সাধুব্যক্তি প্রলোভনের সহিত—দুঃখ যন্ত্রণার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের পবিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ইহা সে আদর্শ নহে; অথবা, যে আদর্শ-অনুসারে কোন প্রেমিকপুরুষ, স্বাধীনভাবে, জানিয়া-বুঝিয়া আত্মোৎসর্গ করেন, ইহা সেরূপ আদর্শও নহে; এ আদর্শ—অন্ধভাবে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার ইচ্ছাবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার সমস্ত অস্তিত্বকে বিলোপ করিয়া,—চিন্তাশূন্য ধ্যানে, বাক্যশূন্য আরাধনায়, প্রায় অচেতনভাবে নিমগ্ন থাকা।

যে তত্ত্বদৃষ্টিতে গভীরতর তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, যাহা শুধু চটক্‌দার—যাহা চট্ করিয়া ধরা যায়—যাহা আশুগ্রাহ্য—মানব প্রকৃতির সেইরূপ একটা অসম্পূর্ণ তত্ত্বদৃষ্টি হইতেই গুহ্যতন্ত্র প্রসূত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞানের সেরূপ সোর-সরাবৎ নাই; অনেক সময় জ্ঞানের কথা শুনা যায় না; পক্ষান্তরে, ভাবরসের কথা খুব আড়ম্বর-সহকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপারে,

বাহিঃ-প্রতীয়মান বস্তু, অপেক্ষাকৃত অন্তরতম বস্তুকে যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, তাহা ত স্বাভাবিক।

তাছাড়া, এই জ্ঞান ও ভাবের মধ্যে কত ভ্রান্তিজনক সম্বন্ধসূত্র—কত ভ্রান্তিজনক সাদৃশ্য বিদ্যমান! অবশ্য, এই উভয় বৃত্তি পরিপুষ্টি লাভ করিলে উহাদের প্রভেদ আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যখন জ্ঞান যুক্তিতে পরিণত হয়, তখন ভাবোচ্ছ্বাসের ন্যায় জ্ঞানও অলঙ্কার-আড়ম্বরে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া থাকে; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান ও ভাবরস প্রায় একই বলিয়া প্রতীয়মান হয়;—কেননা, উভয়েরই একইরূপ দ্রুতগতি, একইরূপ অস্পষ্টতা। তাছাড়া, উভয়ই একই পদার্থের অনুসরণ করে,—উভয়ই প্রায় একসঙ্গে গমন করে। অতএব উভয়কেই যে একই জিনিস বলিয়া মনে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

বিজ্ঞ দার্শনিক, উহাদিগকে পৃথক না করিয়াও উহাদের প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়,—জ্ঞান আগে, ভাব তাহার পরে। যাহাকে জানা নাই তাহাকে ভাল বাসিবে কি করিয়া? সত্যকে উপভোগ করিতে হইলে অল্প বিস্তর তাহাকে জানা কি আবশ্যক নহে? কোন বিশেষ তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইলে কতকটা সেই তত্ত্বগুলিকে উপলব্ধি করা কি আবশ্যক হয় না? ভাবের মধ্যে জ্ঞানকে নিমজ্জিত করার অর্থ—কার্য্যের মধ্যে কারণকে রুদ্ধ করিয়া প্রায় তাহার প্রাণসংহার করা। আসলে, ভাবরস হৃদয়াবেগের একটি উৎস,—জ্ঞানের উৎস নহে। প্রজ্ঞাই একমাত্র জানিবার বৃত্তি। মূলে, যদিও ভাবরসবোধ ইন্দ্রিয়বোধ হইতে ভিন্ন, তথাপি সাধারণ বোধগ্রাহিতা বিষয়ে ইন্দ্রিয়বোধের সহিত সর্ব্বাংশেই সমান, এবং ইন্দ্রিয়বোধেরই ন্যায় পরিবর্ত্তন-

শীল। ইন্দ্রিয়বোধের ন্যায় ভাব-রসেও বিরাম বিচ্ছেদ আছে, স্ফূর্ত্তি আছে, অবসাদ আছে, উচ্ছাস আছে, মূহ্যাবস্থা আছে। অতএব, যাহা স্বরূপতঃ সচল ও সবিশেষ—সেই ভাবের প্রেরণাগুলিকে কখনই একটা সার্ব্বভৌম মূলতত্ত্বরূপে খাড়া করা যাইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধে—প্রজ্ঞার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে, সকল মনুষ্যের মধ্যে চিরকাল একই ভাবে বিদ্যমান। যে সকল নিয়মের দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া নিয়মিত হয়, উহা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত জীবেরই পক্ষে সাধারণ বিধি। এমন কোন জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীব নাই যে সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী কোন তত্ত্ব উপলব্ধি করে না—সুতরাং সেই সব তত্ত্বের যিনি মূলতত্ত্ব,—সেই অনন্তপুরুষকেও উপলব্ধি করে না। এই মহান্ তত্ত্বগুলি একবার যদি উপলব্ধ হয়, তখন সকল মনুষ্যের হৃদয়েই স্বভাবতঃ সেই সকল আবেগ উৎপন্ন হয় যাহা আমি পূর্ব্বে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হৃদয়ের এইরূপ আবেগের মধ্যে, যুগপৎ জ্ঞানের গাম্ভীর্য্যশ্রী এবং কল্পনা ও ইন্দ্রিয়বোধের সচলতাও বিদ্যমান। জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বোধ—এই উভয়ের সমঞ্জসীভূত যোগ হইতেই ভাব-রসের উৎপত্তি। এই দুই অবয়বের মধ্যে একটি অবয়বকে উঠাইয়া লও—তাহা হইলে এই যোগটি আর কোথায় থাকে? মনুষ্য সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর পর্য্যন্ত উন্নীত হইতে পারে,—ইহাই গুহ্যতন্ত্রের কথা। কিন্তু গুহ্যতন্ত্র ইহা বুঝে না যে, জ্ঞান হইতে জ্ঞানের শক্তিকে উঠাইয়া লইলে, এমন একটা জিনিস উঠাইয়া লওয়া হয়—ঠিক্ যেটা হইতে মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে এবং একমাত্র যাহা হইতে অনন্ত ও নিত্য সত্যের মধ্যবর্ত্তিতা-সূত্রে, ঈশ্বরের সহিত বৈধরূপে যোগ সংস্থাপিত হইতে পারে।

গুহ্যতন্ত্রের প্রধান দোষ—যেন জ্ঞানের মধ্যবর্ত্তিতা শুধু একটা বাধা মাত্র, যোগবন্ধন নহে—এইরূপ ভাবে গুহ্যতন্ত্র এই মধ্যবর্ত্তিতাকে অপসারিত করিয়া দেয়;—অনন্তকে প্রেমের সাক্ষাৎ পাত্র বলিয়া অবধারিত করে। অমানুষিক প্রযত্ন ভিন্ন এইরূপ প্রেমকে পোষণ করা দুষ্কর এবং ইহার ফলে প্রেম উন্মত্ততায় পরিণত হয়। প্রেম, স্বীয় বিষয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে চাহে; কিন্তু গুহ্যতন্ত্র প্রেমকে আপনার মধ্যে বিলীন করিতে চাহে; গুহ্যতন্ত্রের এইরূপ অসংযত আতিশয্য দেখিয়াই বস্যুয়ে ও খৃষ্টযাজক-মণ্ডলী নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-ধারণাকে দুষিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানধারণা মানুষের উদ্যমচেষ্টাকে প্রসুপ্ত করে, মানুষের জ্ঞানকে নির্ব্বাপিত করে; এবং কতকগুলা অলস উচ্ছৃঙ্খল ধ্যানচিন্তাকে, সত্যানুসন্ধানের স্থলাভিষিক্ত করে—কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের স্থলাভিষিক্ত করে। বস্তুতঃ, একমাত্র সত্যের দ্বারাই—ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই, ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হয়। আর যত প্রকার যোগ, সমস্তই—আকাশকুসুম, মহাবিভ্রাট, এমন কি অবস্থা বিশেষে মহাপাপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহার সত্তায় মানুষের মনুষ্যত্ব, যাহার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে, আপনার মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া দেখিতে পায়—সেই জ্ঞান, সেই স্বাধীনতা, সেই বিবেক-বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া আদৌ মনুষ্যোচিত কাজ নহে। অবশ্য, ধর্ম্মের পথে চলিতে গেলে, সতর্কতা আবশ্যক। ষড়রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইলে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কখন-কখন রিপুর আবেগ নিঃশেষিত হইয়া আপনা-আপনি নিবৃত্ত হয়; কখন কখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। সময়-বিশেষে এইরূপ বিবিধ উপায় বৈধরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে।

ফেনেলোঁ তাঁহার "আধ্যাত্মিক পত্রাবলী"তে, এমন কি তাঁহার "স্বর্গস্থ সিদ্ধপুরুষদিগের মূল-মন্ত্র" -গ্রন্থে, ইহা সত্যের অংশ, ও সাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ, এই পৃথিবীতে থাকিয়া, লোকান্তরিত আত্মার কি কি স্বত্বাধিকার আছে তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা, পরলোকগত সিদ্ধপদারূঢ় ভক্তগণ কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কল্পনা করা কতদূর সত্যনির্ণয়ের অনুকূল তাহা ভাবা উচিত। স্বর্গারূঢ় সিদ্ধ-পুরুষেরা যাহাই করুন না কেন—এ পৃথিবীতে আমাদের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে,—ধর্ম্মের পথে চলিতে হইবে। উৎকৃষ্টতর ধ্যানধারণা—গন্তব্য-পথের একটা বিশ্রাম-স্থানের মত, যুদ্ধের বিরাম-কালের মত, অথবা সংগ্রামের প্রকারান্তর মাত্র। ফলতঃ একেবারে পলায়ন করিয়া কখনই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, শক্তিসঞ্চয় করিয়া যাহাতে দ্বিগুণতর বলে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে, এই উদ্দেশেই কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়। একদিকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু কঠোরতা (Stoicism) আর একদিকে বৃত্তিনিরোধমূলক নিষ্ক্রিয়তা (quietism) —এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। সব-দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বরং প্রথমটি অধিকতর বরণীয় বলিয়া বোধ হয়। কেন না, উহা সকল সময়ে ঈশ্বরে উপনীত করিতে না পারিলেও, অন্তত উহা মানবের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, ও বিবেক-বুদ্ধিকে অক্ষত রাখে। পক্ষান্তরে, গুহ্যতত্ত্ব সে-সব উঠাইয়া দিয়া সমস্ত মানুষটারই অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। যে ঈশ্বরপ্রেম, স্বকীয় প্রেমাস্পদের নিষ্ফল ধ্যানের মধ্যে বিলীন—তাহা হইতে, এইরূপ কতকগুলি ফল প্রসূত হয়, যথা :—জীবনের বিস্মৃতি, জড়তা, আলস্য, আত্মার মৃত্যু

ইত্যাদি। কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে ধ্যানরত ব্যক্তির মনে এইরূপ বিশ্বাস হয়, যেন ঈশ্বরের সহিত আত্মা এক হইয়া গিয়াছে। এই ঐশ্বর্য্য লাভে গর্ব্বিত হইয়া, তখন সে ব্যক্তি মানব-শরীরকে ও মানব-ব্যক্তিত্বকে এতদূর অবজ্ঞা করে যে নিজের সমস্ত কার্য্যে তাহার ঔদাস্য উপস্থিত হয়, এবং তাহার চক্ষে ভাল মন্দ সবই সমান বলিয়া মনে হয়। তাই, এমন কতকগুলি বিশ্বাসান্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায় দেখা যায় যাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত দুষ্কর্ম্ম মিশ্রিত; ধর্ম্মের ছুতা করিয়া তাহারা কত অপকর্ম্ম করে; যোগপ্রসূত আত্মহারা ভাবের দোহাই দিয়া তাহারা কত জঘন্য কাজে—কত নৃশংস কাজে প্রবৃত্ত হয়। হৃদয়কে জ্ঞানের উপর কর্তৃত্ব করিতে দিলে, শুধু ভাবরসকে মানব আত্মার পথ-প্রদর্শকরূপে বরণ করিলে, দৃশ্যমান জগতের মধ্যবর্ত্তিতা-ব্যতীত,—তাহা অপেক্ষাও যাহা আরও নির্ভর-যোগ্য—সেই জ্ঞান ও সত্যের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত—ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করিবার কল্পনা করিলে, এই সমস্ত শোচনীয় পরিণাম যে উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

আর এক জাতীয় গুহ্যতত্ত্ব আছে যাহা আরো অপূর্ব্ব; উহা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানদীপ্ত ও মার্জ্জিত; কিন্তু যুক্তির নাম ধরিয়া উপস্থিত হওয়ায় উহা আরো বেশী অযৌক্তিক।

আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন করিয়াছি:—মূল সত্য, এমন কি, জ্ঞান ও নীতিগত সার্ব্বভৌম মূলতত্ত্বগুলিও মানবজ্ঞানের নিজস্ব জিনিস নহে; সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্বগুলি পূর্ণপুরুষেরই সহিত সংযুক্ত বলিয়া আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। সেই পূর্ণপুরুষ ব্যতীত এই সকল সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বের ব্যাখ্যা আর কিছুতেই হইতে পারে না। কেন না, অবশ্যম্ভাবী সত্তা ও মূল সত্তা

তাঁহাতেই বিদ্যমান,—নিত্যত্ব ও অসীমত্ব তাঁহাতেই বিদ্যমান। ঈশ্বর যেরূপ সৃষ্ট পদার্থসমূহের কারণ, সেইরূপ তিনি অকৃত তত্ত্বসমূহেরও সারবস্তু। ঈশ্বরই অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহের স্বাভাবিক আধার। যদি এই সকল তত্ত্বের স্বরূপ—ঈশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে উলটাইয়া না থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ সকল মূলসত্যগুলি লইয়াই তাঁহার স্বরূপ গঠিত;—তিনি ও মূল সত্য একই জিনিস। তাঁহারই জ্ঞানের অভিব্যক্তিরূপে এই সকল মূলসত্য তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত। যতক্ষণ আমাদের জ্ঞান, ঐ সকল মূলতত্ত্বকে ঈশ্বরিক জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত না করে, ততক্ষণ ঐ সকল মূলতত্ত্ব, কারণহীন কার্য্যরূপে—আধার বস্তুহীন ঘটনারূপেই অবস্থিতি করে। আমাদের জ্ঞান, ঐ সকল মূলতত্ত্বগুলিকে যে তাহাদের মূল কারণের সহিত—তাহাদের আধারবস্তুর সহিত যুক্ত করে, তাহার কারণ, এরূপ না করিয়া সে থাকিতে পারে না। ইহাই প্রজ্ঞার প্রকৃতিসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।

অসীম সত্তা পর্য্যন্ত উঠিবার যে সোপান গুহ্যতন্ত্র সেই সোপানটিকে ভাঙ্গিয়া দেয়। গুহ্যতন্ত্র মনে করে, কেবল মাত্র সেই সত্তাটিই বিদ্যমান—যে সত্যগুলি এই সত্তার বহির্বিকাশ; সেই সত্যগুলি হইতে এই সত্তাটি যেন একেবারে স্বতন্ত্র। তাই গুহ্যতন্ত্রবাদীরা মনে করে,—বিশুদ্ধ পূর্ণতাকে, বিশুদ্ধ একতাকে—স্বরূপসত্তাকে—একমাত্র তাহারাই প্রাপ্ত হইয়াছে। কিসে তাহাদের ধ্যানের বিষয়টিতে কোন প্রকার মিশ্রণ না থাকে, ভাগবিভাগ না থাকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন উপাদান—মানবীয় কোন উপাদান তাহার মধ্যে একেবারেই না থাকে—গুহ্যতন্ত্র সেইরূপ একটা উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত। সেই সহজ উপায়টি এই;—ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে মানবত্বের ছায়া পর্য্যন্ত আসিতে না দেওয়া—ঈশ্বরকে অতীত

সূক্ষ্ম নির্গুণতায় (abstraction)—স্বরূপগত নির্গুণতায় পরিণত করা। ঈশ্বরের স্বরূপে কোন বিভাগ নাই বলিতে গেলে, বলিতে হয় তাঁহার কোন উপাধি নাই, কোন গুণ নাই—এমন কি তিনি সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে একেবারে বর্জ্জিত। কেন না, জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, জ্ঞান বলিলেই সেই সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ বুঝাইয়া যায়। আত্যন্তিক একতা-প্রযুক্ত যে ঈশ্বরের জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না সেইরূপ ঈশ্বরই গুহ্যতন্ত্রের ঈশ্বর।

গ্রীক ও ল্যাটিন্-সভ্যতার আলোকের মধ্যে থাকিয়া, কিরূপে আলেক্জান্দ্রীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়—কিরূপে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা Plotin, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এইরূপ অদ্ভুত ধারণায় উপনীত হইলেন?—প্লেটোনিকতার অপব্যবহার করিয়া, সক্রেটিস ও প্লেটোর উৎকৃষ্টতর ও কঠোরতর দার্শনিক পদ্ধতিকে বিকৃত ও কলুষিত করিয়াই উঁহারা এইরূপ ধারণায় উপনীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই*। বিশেষ পদার্থের মধ্যে, পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের মধ্যে, আগন্তুক পদার্থের মধ্যে যাহা সাধারণ, যাহা স্থায়ী, যাহা "আইডিয়া," অর্থাৎ যাহা মূলতত্ত্ব,—প্লেটোর তর্ক-পদ্ধতি সেইরূপ মূলতত্ত্বেরই সন্ধান করিয়াছে; ঐ পদ্ধতি-অনুসারে সেই সকল মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় যাহা জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; ঐ পদ্ধতি অনুসারে সেই গোড়ার সর্ব্বাদিম মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় যাহার পরে আর কিছুই জানিবার নাই—অন্বেষণ করিবার নাই। এইরূপে সসীম পদার্থসমূহের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া, উহাদের স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে পৃথক্

* গুণ ছাড়া বস্তু থাকিতে পারে, কিংবা বস্তু ছাড়া গুণ থাকিতে পারে—আমার সকল লেখাতেই আমি বরাবর এই দুই অসঙ্গত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছি।

রাখিয়া,—এমন কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় যাহা সেই সকল পদার্থের নিয়ামক মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই মূলতত্ত্ব একটা অতিসূক্ষ্ম শূন্য ভাবমাত্র নহে; ইহা বাস্তবিক তত্ত্ব—ইহা সারতত্ত্ব। প্লেটো, ঈশ্বরকে শুধু "অখণ্ড-এক" বলেন নাই—তিনি তাঁহাকে মঙ্গলময়ও বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর "এক্লেয়েটি"-সম্প্রদায়ের বর্ণিত নির্জীব মৃত ঈশ্বর নহেন; এই ঈশ্বর "জীবন্ত" ঈশ্বর—"ক্রিয়াবান্" ঈশ্বর। এই সুস্পষ্ট উক্তিগুলির দ্বারা বুঝা যায়, প্লেটোর ঈশ্বর ও গুহ্যতন্ত্রের ঈশ্বর—এই উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। প্লেটোর ঈশ্বর "জগতের পিতা।" তা ছাড়া, "যে সত্য আত্মার আলোক স্বরূপ, সেই সত্যেরও তিনি জনক।" তিনি "আইডিয়ার" মধ্যে—মূল-তত্ত্বসমূহের মধ্যে নিয়ত বাস করেন। এবং "এই সকল সত্যের সহিত চিরযুক্ত থাকাতেই তিনি সত্যকার ঈশ্বর হইয়াছেন।" তিনি কোন অবশ্যম্ভাবি বাহ্য কারণে বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; তিনি মঙ্গলময় বলিয়াই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তা ছাড়া তিনি সুন্দরস্বরূপ;—তাঁহার সৌন্দর্য্যে কোন মিশ্রণ নাই—উহা বিকার-রহিত ও অবিনশ্বর। সে সৌন্দর্য্য যে একবার দেখিয়াছে, তাহার নিকট অন্য সমস্ত পার্থিব সৌন্দর্য্য অতীব তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের—সেই পূর্ণ মঙ্গলের জ্যোতিশ্ছটা এরূপ প্রখর-উজ্জ্বল ও দুর্নিরীক্ষ্য, যে মানব-নেত্র তাহার দিকে মুখামুখি তাকাইতে পারে না। সেই পূর্ণ জ্যোতির দিকে তাকাইবার পূর্ব্বে —সেই জ্যোতির যে সকল প্রতিবিম্ব এই পৃথিবীতে মনুষ্যের মধ্যে প্রকাশ পায়—সেই সব সত্যের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মধ্যে, ন্যায়ের মধ্যেই সেই জ্যোতিকে প্রথমে নিরীক্ষণ করিতে হয়। আশৈশব যে ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ, তাহার নেত্র যেরূপ অল্পে অল্পে প্রখর সূর্য্যের

আলোকে অভ্যস্ত হয়, ইহাও সেইরূপ। প্রকৃত বিজ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হইয়া আমাদের জ্ঞান, পরিশেষে সেই অগ্নজ্যোতির সমীপবর্ত্তী হইতে সমর্থ হয়। যথাপথে চালিত হইলে, আমাদের এই জ্ঞানই ঈশ্বর পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে; ঈশ্বরে উপনীত হইবার জন্য অন্য কোন বিশেষ-বৃত্তির আবশ্যক হয় না।

প্লটিন, প্লেটোর তর্ক-পদ্ধতিকে আতিশয্যের সীমায় লইয়া গিয়া, এবং যেখানে থামা উচিত সেখানে না থামিয়া, মার্গভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। প্লেটো, তাঁহার তর্ক-পদ্ধতিতে, "আইডিয়া" অর্থাৎ মূলতত্ত্ব পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছেন;—মঙ্গলের মূলতত্ত্বে গিয়া থামিয়াছেন। তাই তাঁহার ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ; প্লেটিন্, প্লেটোর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কোথাও গিয়া থামেন নাই, এবং এইরূপে তিনি গুহ্যতত্ত্বের অতলস্পর্শ রসাতলে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার তর্ক-পদ্ধতিটি এইরূপ:—সত্য যদি শুধু সামান্যের মধ্যেই থাকে এবং সমস্ত বিশেষই যদি অপূর্ণতা-বাচক হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তটি অনিবার্য্য যে, যাহা কিছু আমরা কোন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি, যাহা কিছুর আমরা ভেদ কিংবা সীমা নির্দ্দেশ করি, তাহা কখনই আমাদের এই পদ্ধতির শেষ তত্ত্ব হইতে পারে না। এই রূপ কিছু হওয়া চাই যাহার কোন প্রকার সীমা থাকিবে না—উপাধি থাকিবে না। এই পদ্ধতি, ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের সত্তাকে পর্য্যন্ত প্রত্যাহৃত করিতে চাহে। ফলতঃ, আমরা যদি বলি ঈশ্বর একটি সত্তা, তাহা হইলে এই সত্তার সঙ্গে যে একত্বটি সংশ্লিষ্ট আছে শুধু সেই একত্বকে পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিবার জন্য উহাকে সত্তা হইতে বিনির্ম্মুক্ত করা যাইতে পারে। এস্থলে, কেবলমাত্র-একত্বটি একেবারে গোড়ার জিনিস;—কেন না, তাহার পরে আর যাওয়া

যায় না। কিন্তু তবুও,—যখনি আমরা বলি "ইহা একমাত্র," তখনই উহাকে উপাধির দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ করি। অতএব আত্যন্তিক একত্ব এমন একটা জিনিস হওয়া চাই যাহা কোন প্রকার উপাধির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে না; যথাযথরূপে বলিতে গেলে—উহা এমন একটা জিনিস যাহার কোন সত্তা নাই—এমন কি, যাহার কোন নাম পর্য্যন্ত নাই; যাহা প্লটিনের উক্তি-অনুসারে "নামহীন"। যে তত্ত্বটির সত্তা পর্য্যন্ত নাই, তাহাকে চিন্তা করাও যায় না; কেন না, চিন্তামাত্রই সীমাবদ্ধ সত্তার বিকার-বিশেষ মাত্র। এইরূপে আত্যন্তিক একত্ব হইতে সত্তা ও চিন্তা—উভয়ই বর্জ্জিত। অ্যালেক্জান্দ্রীয়-সম্প্রদায় যদি সত্তা ও চিন্তাকে স্বীকার করে তাহা হইলে এই একত্বের বিচ্যুতি ও অবনতি ঘটে। চিন্তা ও সত্তার হিসাবে আলোচনা করিলে, সেই পরমতত্ত্বটি আপনা-অপেক্ষা হীন হইয়া পড়ে; অতএব সেই পরমতত্ত্বের স্বরূপগত অনির্দ্দেশ্য বিশুদ্ধ আত্যন্তিক একতা বিজ্ঞানের শেষ-বিষয় নহে—পূর্ণতার শেষ-অবয়ব নহে।

এইরূপ ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে, মনুষ্যের সাধারণ মনোবৃত্তিসমূহে পর্য্যাপ্ত হয় না; এবং এইজন্যই ঐশ্বরিক তত্ত্বনির্ণয়কল্পে অ্যালেক্জান্দ্রীয়-সম্প্রদায় একটা বিশেষ মনোবিজ্ঞানের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন।

আমাদের জ্ঞান,—পদার্থ সমূহের মধ্যে, ঐকান্তিক একত্বকে পূর্ণ পুরুষের উপাধিরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকে, উহার স্বরূপগত স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করে না;—যদি আমাদের জ্ঞান কখন স্বতন্ত্রভাবে উহার আলোচনা করে—সে শুধু আমাদের পৃথককরণী বুদ্ধির (abstraction) সূক্ষ্ম কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞান, ঐকান্তিক একতাকে পূর্ণ পুরুষের উপাধি ছাড়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া কি

দাঁড় করাইতে চাহ, না উহা আমাদের পৃথক্‌করণী বুদ্ধির একটা শূন্য কল্পনা মাত্র? আমাদের জ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি ছাড়া আর কোন হিসাবেই এই একত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না। নির্গুণ শূন্য-একত্ব কি আমাদের প্রেমের পাত্র হইতে পারে? জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের স্পৃহা বাস্তব বিষয়ের প্রতি আরো বেশী। সাধারণতঃ পদার্থমাত্রকেই ভালবাসা যায় না,—সেই পদার্থকেই ভালবাসা যায় যাহার অমুক-অমুক গুণ আছে। মানবীয় স্নেহ প্রেমাদি সম্বন্ধে দেখা যায়—ব্যক্তিগত গুণকে যদি ছাঁটিয়া দেওয়া যায়, কিংবা একটু রূপান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে প্রেমও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত কিংবা রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

অতএব, কি জ্ঞান, কি প্রেম—কেহই গুহ্যতন্ত্রের আত্যন্তিক একত্বে পৌছিতে পারে না। এইরূপ পদার্থের সহিত যোগ নিবদ্ধ হইলে, আমাদের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকা চাই যাহা কতকটা সেই একত্বের অনুরূপ;—জানিবার এমন একটা প্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক যাহার দ্বারা আত্মচৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ চৈতন্যই অহং-এর চিহ্ন; কিন্তু উহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যে কোন-জীব, "আমি" এই কথাটি বলে, সে আসলে অন্য হইতে আপনাকে পৃথক্‌ করিয়া জানে; উহাই আমাদের ব্যক্তিত্বের আদর্শ। যে যুক্তিপদ্ধতি-অনুসারে, ঐকান্তিক একত্বের কোন ভাগবিভাগ নাই, কোনপ্রকার উপাধি নাই,—চৈতন্যের অধিষ্ঠানে সেই একত্বের আদর্শ কাজেই হীন হইয়া পড়ে;—কেননা, ঐরূপ ঐকান্তিক একত্ব আদৌ চৈতন্যের বিষয় হইতেই পারে না;—সে সম্বন্ধে চৈতন্যের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের সহিত বিশুদ্ধ ও সাক্ষাৎ যোগের যে প্রণালী তাহা—উক্ত সম্প্রদায়ের মতে—জ্ঞান নহে, প্রেম

নহে—উহা (ecstasy) যোগানন্দের অবস্থা। আত্মার এই অপূর্ব্ব অবস্থা-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে প্লোটিনই ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। গুহ্যতন্ত্র মনে করে, আপনা হইতে আপনাকে বিযুক্ত করা আবশ্যক; এবং গুহ্যতন্ত্রের বিশ্বাস, মানুষ তাহা সাধন করিতেও সমর্থ। এই ecstacy-ই সেই আত্মহারা অবস্থা। পূর্ণপুরুষের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে, আপনার মধ্য হইতে বাহির হওয়া চাই; মন হইতে সমস্ত সসীম চিন্তাকে বহিষ্কৃত করা চাই। এইরূপ করিলে অন্তরের গভীরতম দেশে প্রবেশ করিয়া এমন একটা আত্মবিস্মৃতির অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়—যখন আত্মচৈতনা বিলুপ্ত হয়, কিংবা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা যোগাবস্থার একটা চিত্র মাত্র; আসলে উহা যে কি—তাহা কেহই জানে না; কেমন করিয়া উহা চৈতনা হইতে বিচ্যুত হয়—স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হয়;—চিন্তা হইতে বিচ্যুত হয়, সুতরাং সমস্ত ভাবা শক্তি হইতে—সমস্ত মানবীয় শব্দসম্পদ হইতে বিচ্যুত হয়—তাহা কেহই বলিতে পারে না।

এই দার্শনিক গুহ্যতন্ত্র, পূর্ণপুরুষ সম্বন্ধীয় এমন একটা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা মূলেই মিথ্যা। এই গুহ্যতন্ত্র, সসীম সত্তার সমস্ত লক্ষণ হইতে ঈশ্বরকে বিনির্মুক্ত করিতে গিয়া, সত্তার লক্ষণ পর্যন্ত তাঁহা হইতে অপসারিত করিয়াছে। গুহ্যতন্ত্রী দার্শনিক-দিগের এই ভয় পাছে, অসীমের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা সসীম পদার্থেও বিদ্যমান। তাঁহারা বুঝেন না যে, সসীম ও অসীমের মধ্যে কেবল মাত্রাগত প্রভেদ; যাহার কোন প্রকার সত্তা নাই তাহা ত একেবারেই শূন্য! অবশ্য, পূর্ণপুরুষে যেরূপ পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান সেইরূপ অখণ্ড একত্বও বিদ্যমান; কিন্তু যে ঐকান্তিক একত্বের

কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহা একেবারেই অবাস্তব—অসত্য। বাস্তব পদার্থ ও বিশেষ সত্তা—উভয়ই তুল্যার্থবাচক। কোন এক সত্তা, অপর সত্তা নহে—এই হিসাবেই সেই সত্তার নিজত্ব ও বিশেষত্ব। সুতরাং সেই সত্তার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই। যাহা কিছু আছে অর্থাৎ যাহা কিছুর সত্তা আছে তাহাকে "অমুক-অমুক" বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়। যে সত্তা সাক্ষাৎ-একত্ব, তাহার বাস্তবতা যদি এই বিশেষত্বের উপরেই নির্ভর করে, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তটি অপরিহার্য্য যে, যত প্রকার সত্তা আছে তন্মধ্যে ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ-সত্তা। এ বিষয়ে প্লোটিন্ অপেক্ষা অ্যারিষ্টটল, প্লেটোর মতের বেশী কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছেন; কেন না অ্যারিষ্টটল্ বলেন;—ঈশ্বরই "চিন্তার চিন্তা"; তিনি কেবল একটা অব্যক্ত শক্তি মাত্র নহেন—তিনি কার্য্যকরী শক্তি, এরূপ শক্তি যাহার বাস্তবতা আছে। বরং এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, অনির্দ্দেশ্য অবিশেষভাবই সসীম প্রকৃতির উপযোগী; কেন না সসীম বলিয়াই তাহার কতকগুলি শক্তি চিরকালই অব্যক্ত থাকিয়া যায়—বাস্তবতায় পরিণত হয় না। সেই সব শক্তি যতই বাস্তবতায় পরিণত হয় ততই তাহার অনির্দ্দেশ্যতাও কমিয়া যায়। অতএব, বাস্তবিক ঐশ্বরিক একত্ব—নির্গুণ শূন্য একত্ব নহে—ইহা সেই পূর্ণ-পুরুষের সুনির্দ্দিষ্ট একত্ব—যাঁহাতে সমস্তই পূর্ব্ব হইতে নিষ্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। সামান্য সত্তার কথা ছাড়িয়া দেও; ঈশ্বরের সেই মহাসত্তা যেমন "একমেব", তেমনি তাঁহার সমস্তই অন্যাপেক্ষা বিভিন্ন। তাঁহার বিভূতিগত পূর্ণ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার সত্তাগত পূর্ণতার নিদর্শন। এই সকল বিভূতির ভেদাভেদ আমরা চিন্তার দ্বারা নির্ণয় করিয়া থাকি; কিন্তু আসলে এই সকল ভেদ সীমাগত ভেদ নহে। তাহার দৃষ্টান্ত;—

আমাদের মনোবৃত্তিসমূহ যতই বিচিত্র হউক না, যতই পরিপুষ্ট হউক না, তাহাতে কি আমাদের সত্তার বিভাগ হয়?—আমাদের ব্যক্তিগত তাদাত্ম্য ও একত্বের কি কিছু মাত্র ইতরবিশেষ হয়? আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ আছে, জ্ঞান আছে, ইচ্ছা আছে—তাই বলিয়া কি আমাদের আমিত্বের একতা-বোধ কিছুমাত্র কমে?—কখনই না। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অ্যালেকজান্দ্রীয়-সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা মনে করে, উপাধিগত বহুলতা—স্বরূপগত একতার সহিত অসঙ্গত; এবং পাছে ঈশ্বরের স্বরূপগত বিশুদ্ধ একতা কোন প্রকারে কলুষিত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা ঈশ্বরকে নির্গুণরূপে কল্পনা করেন। এবিষয়ে তাঁহাদের এতটা সংকোচ যে তাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বরের বিভূতিগুলি ঈশ্বরের স্বরূপে রাখিয়া দিলে, ঈশ্বরের পূর্ণতার লাঘব করা হয়। পূর্ণতার ঐশ্বর্য্যগুলিকেই ঈশ্বরের অপূর্ণতা—ঈশ্বরের সত্তাকেই ঈশ্বরের খর্ব্বতা এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়াকে ঈশ্বরের অধঃপতন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। যাহাই হউক মনুষ্যের ও বিশ্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, তাঁহারা কতকগুলি গুণ ঈশ্বরে আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু সেই সকল গুণকে তাঁহারা ঈশ্বরের হীনতা বলিয়াই অভিহিত করেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে হীনতা বলেন তাহাই বাস্তবপক্ষে অসীম পূর্ণতারই নিদর্শন।

আত্যন্তিক-একতারূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে যেমন এই আত্মহারা-অবস্থার সিদ্ধান্তটি নিতান্তই আবশ্যক, তেমনি আবার আত্মহারা-অবস্থার সিদ্ধান্তের দ্বারাই, আত্যন্তিক একতা-মতটি দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আত্যন্তিক একতা—পূর্ণ একতা যদি সাক্ষাৎ জ্ঞেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে না পারে, তাহা হইলে জ্ঞাতার এই আত্মহারা অবস্থায় কি ফল লাভ হইবে? এই আত্মহারা-অবস্থা,

মনুষ্যকে ঈশ্বরপর্য্যন্ত উন্নীত করা দূরে থাক্, উহা মনুষ্যকে মনুষ্য-পদবী হইতেও নীচে নামাইয়া আনে; কেননা, যে আত্মচৈতন্যের অভাবে চিন্তা সম্ভব হয় না, উহা সেই চিন্তাকেই মানুষের মন হইতে একেবারে অপনীত করে। আত্মচৈতন্যকে রুদ্ধ করিলে, সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াই অসম্ভব হইয়া পড়ে; বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, যে সহজ জ্ঞান, যে সাক্ষাৎ জ্ঞান, যে সুনির্দ্দিষ্ট সবিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা আর উদয় হইতে পারে না; তাহা আর বোধগম্য হইতে পারে না *।

গুহ্যতত্ত্বের যতপ্রকার মত আছে, তন্মধ্যে অ্যালেক্জান্ড্রীয় গুহ্যতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গভীর। এই গুহ্যতত্ত্ব সূক্ষ্ম কল্পনার মহাকাশে এরূপ বিলীন যে, মনে হয়, বুঝি উহা লৌকিক উপধর্ম্মাদি হইতে বহুদূরে; কিন্তু তথাপি এই অ্যালেক্জান্ড্রীয় সম্প্রদায়,—আত্মহারা ধ্যান-সমাধি ও দেবদর্শনবাদ—এই উভয়কেই একত্র সম্মিলিত করিয়াছে। এই দুই জিনিস বাহ্যতঃ পরস্পর অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, উহাদের মূলতত্ত্ব একই। যাহা আমাদের

---

* দর্শন-ইতিহাসের ভূমিকায় আমি বলিয়াছিলাম—"শুধু জানিবার শক্তি থাকাই প্রকৃত জ্ঞান নহে, কার্য্যতঃ জানাই আসল জ্ঞান। কিরূপ অবস্থায় আমাদের জ্ঞান জ্ঞান-নামের যোগ্য হয়? আমাদের অন্তরে জ্ঞান বীজাকারে থাকিলেই যথেষ্ট হয় না—ঐ বীজ অঙ্কুরিত হওয়া চাই, পরিপুষ্ট হওয়া চাই, এবং পরিপুষ্ট হইয়া শেষে আপনিই আপনার বিষয়রূপে পরিণত হওয়া চাই। জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী (condition) উপাধি কি? না, আত্মচৈতন্য, অর্থাৎ চৈতন্য উপলব্ধি। যেস্থলে কতকগুলি অবয়ব আছে, সেই স্থলেই আমাদের জ্ঞানোদয় হয়। তন্মধ্যে একটি অবয়ব অবয়বান্তরকে উপলব্ধি করে এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও আপনি উপলব্ধি করে, তখনই জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মচৈতন্য-বর্জ্জিত যে জ্ঞান, সে জ্ঞান জ্ঞানের সূক্ষ্ম সম্ভাবনা মাত্র—উহা বাস্তবিক জ্ঞান নহে।"

ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তাহা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি উভয়েই দাবী করে। একদিকে জ্ঞানপরিমার্জ্জিত সূক্ষ্মতর গুহ্যতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা,—আত্মহারা-অবস্থার দ্বারা ঈশ্বরে সাক্ষাৎভাবে উপনীত হওয়া; অপরদিকে, স্থূলতর গুহ্যতন্ত্রের বিশ্বাস,—ঈশ্বর স্থূল-ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য।—এই উভয়ের প্রকরণ-পদ্ধতি বিভিন্ন, এবং যে সকল মনোবৃত্তি এতদর্থে নিয়োজিত হইয়া থাকে, তাহাও বিভিন্ন; কিন্তু মূলে এই দুইটি একই জিনিস; উহাদের মূলগত সাধারণ ভূমি হইতেই বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভট আতিশয্যের উৎপত্তি। টিয়ান্-নগরের আপলোনিয়াস্—ইনি অ্যালেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের একজন লোকপ্রিয় ব্যক্তি; এবং জাম্বাক্—ইনি (Plotin যেন পুরোহিত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন) একজন গুহ্যতন্ত্রবাদী ও গুহ্যতন্ত্রের পুরোহিত। এই সময়ে অলৌকিক কাণ্ডের সাহায্যে একটা নবধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। প্রাচীন ধর্ম্মও কতকগুলি অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করিতে লাগিল, এবং তত্ত্বজ্ঞানীরাও সগর্ব্বে বলিতে লাগিল যে, তাহারা অন্য মনুষ্যদিগের সম্মুখে ঈশ্বরকে আনিয়া হাজির করিতে পারে। তাহারা প্রেতসিদ্ধ; প্রেতেরা তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস; উপদেবতাদিগকে তাহারা আর স্তবস্তুতি করিয়া আহ্বান করে না; উপদেবতারা তাহাদের আদেশে আপনারা আসিয়াই উপস্থিত হন। এককথায়,—দীক্ষিতদিগের জন্য আত্মহারা ধ্যান-সমাধি; এবং জনসাধারণের জন্য দেবতাদির সাক্ষাৎদর্শনবাদ।

সকল যুগেই এবং পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই, এই দুই প্রকার গুহ্যতন্ত্র পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, দেখা যায়। ভারতবর্ষে, ও চীনদেশে দেখা যায়, যে সকল সম্প্রদায় অতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞানবাদের (idealism) উপদেষ্টা, তাহারাও অতীব নীচ পৌত্তলিকতার দেখা

লয় হইতে দূরে নহে। একদিন তাহারা ভগবদ্গীতা, কিংবা লাওৎসু পাঠ করে; তাহাতে আছে;—"ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয়, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ"; পরদিন আবার তাহারাই এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করে যে;—সেই ঈশ্বর অমুক অমুক মূর্ত্তিরূপে, অমুক অমুক অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার কোন বিশেষ মূর্ত্তি না থাকিলেও, তিনি সকল মূর্ত্তিই ধারণ করিতে পারেন; যেহেতু তিনি সৎ-স্বরূপ; সুতরাং কি প্রস্তর, কি জলবিন্দু, কি কুকুর, কি বীরপুরুষ, কি মুনি-ঋষি—তিনি সকলেরই মধ্যে আছেন—তিনি সকলেরই সারবস্তু। এইরূপ প্রাচীন গ্রীসেও, জুলিএনের আমলে, একই ব্যক্তি আথেন্‌স্ নগরে টোলের অধ্যাপক এবং মিনর্ভা ও সিবেল-মন্দিরের পরিরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইত। একদিকে উহারা প্লেটোর "রেপাব্লিক" প্রভৃতি গ্রন্থের সূক্ষ্ম টীকা করিয়া ঐ গ্রন্থগুলিকে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিত; পক্ষান্তরে জনসাধারণের সমক্ষে, "পবিত্র অবগুণ্ঠন" ও "মঙ্গলময়ী দেবীর মৃগয়া" প্রভৃতি প্রদর্শন করিত। এইরূপে তাহারা কখন তত্ত্বজ্ঞানীর আসনে উপবিষ্ট হইয়া, মানুষকে মানব-চিত্তের অতীত বস্তুতে উত্তোলন করিত; কখন পুরোহিতের আসনে বসিয়া মানুষকে মানুষের নীচে নামাইয়া আনিত। এইরূপে উহারা দুর্ব্বোধ তত্ত্ববিদ্যার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অতীব জঘন্য উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিত।

যখন খৃষ্টধর্ম্মের জয় হইল, তখন খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিয়া এই শোচনীয় গুহ্যতন্ত্রকে কিয়ৎপরিমাণে দমন করিল; কিন্তু কতবার এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের শাসনাধীনেও গুহ্যতন্ত্র, প্রাকৃতিক ধর্ম্মসমূহের (Natural religon) উদ্ভট আতিশয্য পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দিতে যখন Pagan ভাবের ও Pagan সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান হয়, যখন মানবচিত্ত মধ্যযুগের

দর্শনশাস্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে উপনীত হয় নাই, সেই সময়ে য়ুরোপে গুহ্যতন্ত্র আবার দেখা দেয়। আপ্লনিয়স ও জাম্‌ব্লিক্—ইহাঁদের স্থানে Paracelse ও Van-Helmont আবির্ভূত হয়েন। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীতেও Swedenberg এক প্রকার উন্নত গুহ্যতন্ত্র ও একপ্রকার ইন্দ্রজাল—এই দুইটি একাধারে একত্র সম্মিলিত করেন। তিনি এইরূপে সেই সব মূঢ় ব্যক্তিদিগকে একটা নূতন পথ দেখাইলেন,—যাহারা প্রাতে, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সুদৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিত, এবং তাহার পরই আবার সন্ধ্যাকালে, চক্ষু ব্যতীত অন্য উপায়ে দর্শন করিতে, কর্ণ ব্যতীত অন্য উপায়ে শ্রবণ করিতে, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ব্যতীত অন্য উপায়ে মনোবৃত্তিসমূহকে নিয়োগ করিতে উপদেশ করিত, একটা অতিমানুষিক বিজ্ঞান লোকের হস্তে অর্পণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিত, শুধু এই নিয়মে—যদি তাহার পূর্ব্বেই তাহারা আত্মচৈতন্য, চিন্তা, স্বাধীনতা, স্মৃতি-প্রভৃতি যাহা কিছু থাকায় মানুষ জ্ঞানবান্ ও নীতিমান্ জীব হইয়াছে,—সে সমস্ত বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়;—অর্থাৎ যাহা আমি জানিতে সমর্থ, সেই সব যখন আমি জানিতে পারিব না, তখনই আমি সব জানিতে পারিব; আমি তখন এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য জগতে উন্নীত হইব; কিন্তু জাগ্রৎ হইলে, সচেতন হইলে,—সে জগতে যে গিয়াছিলাম, তাহার লেশমাত্র জ্ঞান কিংবা স্মৃতি আমার থাকিবে না। এই স্থূলতর ও 'কিম্ভূত-কিমাকার' গুহ্যতন্ত্র—কি আত্মতত্ত্ববিদ্যা, কি শারীরতত্ত্ববিদ্যা, উভয়কেই বিকৃত করিয়া ফেলে। এই নূতন গুহ্যতন্ত্রের আত্মহারা-অবস্থা, মূঢ়জনের আত্মহারা-অবস্থার মত, ইহা অ্যালেকজান্দ্রীয় সম্প্রদায়ের আত্মহারা-অবস্থারই একপ্রকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিলেই হয়; কিন্তু

ইহাতে সে প্রতিভা নাই; কোন নূতনত্বও নাই; ইতিহাসের সকল যুগেই এইরূপ গুহ্যতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব সময়ে-সময়ে পরিলক্ষিত হয়।

যে সকল নিয়মের দ্বারা মানব-প্রকৃতি সীমাবদ্ধ, সেই সকল নিয়মের গণ্ডী হইতে বাহির হইলে, দেখ আমরা কোথায় গিয়া পড়ি। প্রথমে (charron) শ্যারেঁা বলিয়াছেন, পরে (Pascal) তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন:—"যিনি দেবতা গড়িতে চাহেন, তিনি পশু গড়িয়া বসেন।" (শিব গড়িতে বানর গড়েন) এই সমস্ত বাতুলতার ঔষধ,—মানব-জ্ঞানের সম্বন্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত-স্থাপন করা; মানবজ্ঞানের পক্ষে কতটা অসাধ্য, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা। মানবজ্ঞান প্রথমে ইন্দ্রিয়ের আবরণে আবৃত থাকে; পরে উহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্ব-সমূহে আরোহণ করে; পরিশেষে, সেই সকল তত্ত্বের যিনি মূলতত্ত্ব, সেই অসীম পুরুষে গিয়া উপনীত হয়; যিনি বাস্তব-সত্তা,—সার-সত্তা, মানবজ্ঞান সেই পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, কিন্তু কস্মিন্ কালেও তাঁহার স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবরস আসিয়া জ্ঞানের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ উচ্চতত্ত্বকে জীবন্ত করিয়া তোলে; কিন্তু এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপারকে কখনই এক করিয়া ফেলে না; ভাবরসের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া জ্ঞানকে বধ করে না। মনুষ্যের ন্যায় সসীম জীব ও সেই অসীম পূর্ণপুরুষ ঈশ্বর—এই উভয়ের মধ্যে দুইটি ব্যাপার মধ্যস্থরূপে অবস্থিত;—একটি এই বিশাল বিশ্ব, যাহা আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রসারিত; অন্যটি,—সেই সব নিত্য সত্য, যাহা জ্ঞানের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা জ্ঞানের দ্বারা উৎপাদিত হয় না; চক্ষু যেমন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে, কিন্তু সৃষ্টি করে না, ইহাও তদ্রূপ।

সেই সকল সত্তার সত্তা পরমপুরুষের নিকট উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় সত্যের অনুশীলনে ও সত্যের অনুরাগে জীবন উৎসর্গ করা, সৌন্দর্য্যের ধ্যান করা, সৌন্দর্য্যকে শিল্পকার্য্যে প্রতিফলিত করা, এবং সর্ব্বোপরি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা, মঙ্গলসাধন করা। ইহাতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে না, আমাদের মস্তক ঘূর্ণিত হইবে না; আমরা যতটা অধিকার—যতটা শক্তি লাভ করিয়াছি, তাহারই পরিমাণ অনুসারে আমরা ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সুন্দর।

মানব-মনে সৌন্দর্য্যজ্ঞান।

যে সকল সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে, ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। আমরা উভয়েরই সহিত যুঝিয়াছি; এবং একজনের দ্বারা অপরের মত খণ্ডন করিয়াছি। প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদে আমরা ইন্দ্রিয়চেতনার অসম্পূর্ণতা, এবং বিজ্ঞানবাদের (idealism) অপরিহার্য্য আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছি। লক্ ও কঁদিয়াকের মতে সায় দিয়া, আমরা স্বীকার করিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়াদি হইতে,—আত্মচৈতন্য হইতে আমাদের জ্ঞানবৃত্তির সূত্রপাত হইয়া থাকে;—বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান ও আগন্তুক জ্ঞানের আরম্ভ হইয়া থাকে; এবং রীড্ ও ক্যাণ্টের মতে সায় দিয়া, আমরা ইহাও স্বীকার করিয়াছি যে,—এই সব বিশেষ-বিশেষ জ্ঞানের সাক্ষাৎ উৎস যে ইন্দ্রিয়চেতনা ও আত্মচৈতন্য, এই দুই বৃত্তির উর্দ্ধে আরও একটি বিশেষ বৃত্তি আছে, যাহা ইন্দ্রিয়চেতনা ও আত্মচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অথচ যাহা উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্ফুটিত হয়। সেই বৃত্তির নাম প্রজ্ঞা। উহা, সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যসমূহের মূল-প্রস্রবণ। আমরা ক্যাণ্টের মত খণ্ডন করিয়া এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রজ্ঞার প্রামাণিকতা এবং প্রজ্ঞার দ্বারা যে সকল সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, সেই সকল সত্যের প্রামাণিকতা যার-পর-নাই

সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও সংশয়াতীত। তাহার পর, সেই সকল প্রজ্ঞা-প্রকাশিত সত্যই আবার তাহাদের চিরন্তন মূলতত্ত্বকে—ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। পরিশেষে, যে যুক্তি-সঙ্গত আধ্যাত্মিকতা সমস্ত মানবমণ্ডলীর বিশ্বাসস্থল, এবং প্রাচীন ও আধুনিক মহাত্মাগণের মতানুগত, সেই আধ্যাত্মিকতার সহিত, 'কিম্ভূতকিমাকার' ও অনিষ্টজনক গুহ্যতন্ত্রের ভেদ সযত্নে নির্ণয় করিয়াছি। এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতা, যিনি সত্যের মূলাধার—সেই সত্যস্বরূপ অসীম পুরুষের অবশ্যম্ভাবিতা, আধ্যাত্মিকতার সহিত গুহ্যতন্ত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য,—এই সমস্ত বিষয় প্রথম-খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

এই দ্বিতীয়-খণ্ডে, আমরা সুন্দরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। একটি নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া এ বিষয়েরও একটা জ্ঞানদীপ্ত সৎ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

সপ্তদশ শতাব্দির দর্শনশাস্ত্রেই সুন্দরের আলোচনা, কলাসৌন্দর্য্যের আলোচনা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। প্লেটো ও আরিষ্টটলের নিকট ইহা সুপরিচিত থাকিলেও, তাঁহাদের শিষ্যদের দ্বারা এ বিষয়টি তেমন সাদরে গৃহীত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দিতে এবিষয়ের যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারা তার কাছ দিয়াও যান নাই। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকসম্প্রদায়, দর্শনের এই বিভাগে আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই। লক্ ও কঁদিয়াক্ সুন্দর-সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছেদও—একটি পৃষ্ঠাও লিখিয়া যান নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা তাঁহাদেরই ন্যায়, সুন্দরকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শনতন্ত্রে সুন্দরের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কিরূপে করিবেন-স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের দর্শনতন্ত্র হইতে উহাকে একেবারে বর্জ্জন করাই সুবিধা মনে করিয়াছিলেন। একথা সত্য, দিদ্রো

(Diderot) সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলার একজন উন্মত্ত ভক্ত। এ বিষয়ে তাঁহার একটু প্রতিভাও ছিল; কিন্তু ভল্‌টেয়ার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক্,—তাঁহার ঐসব ভাব গজাইয়া উঠিয়াছিল মাত্র; কিন্তু পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে নাই। তিনি এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন;—কিন্তু প্রায়ই পরস্পরবিরোধী। তিনি কোন মূলতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তিনি ক্ষণিকভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহারই স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন; আদর্শ বলিয়া যে একটা জিনিস্ আছে, তিনি যেন তাহা আদৌ জানিতেন না। দিদ্রো যেরূপ দর্শন-সম্বন্ধে, সেইরূপ কলা-সম্বন্ধেও জড়বাদী। যাহা হউক, তবু তাঁহার এতটুকু সৌন্দর্য্যবোধ ও কল্পনাশক্তি ছিল—যাহা তাঁহার কালে ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীব বিরল। স্কচ্-সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ ও ক্যাণ্ট, সৌন্দর্য্য-তত্ত্বকে তঁহাদের দর্শনতন্ত্রে স্থান দিয়া স্বকীয় যোগ্যতারই পরিচয় দিয়াছেন। আত্মার মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা সুন্দরকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যের প্রতিভা সুন্দরকে কিরূপে আবার পুনরুৎপাদন করে, সে বিষয়ের কাছ দিয়াও তাঁহারা যান নাই। আমরা এক্ষণে এই বৃহৎ প্রশ্নটি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। সৌন্দর্য্য ও কলাসম্বন্ধে একটা প্রণালীবদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মতবাদ তোমাদের নিকট আমি অর্পণ করিব।

এই আলোচনায় যে প্রণালীটি অনুসৃত হইয়াছে, প্রথমতঃ সেই প্রণালীটি কতদূর সমাচীন, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

দুই প্রকারে সুন্দরের আলোচনা হইতে পারে। হয়—আমাদের বাহিরে, সাক্ষাৎ সুন্দরের মধ্যে, এবং যে সকল পদার্থে সুন্দরের ছায়া পতিত হয়, সেই পদার্থের মধ্যে; নয় যে সকল জ্ঞান ও

ভাব আমাদের অন্তরে সুন্দরকে উদ্বোধিত করে, সেই সকল জ্ঞান ও ভাবের মধ্যে, সুন্দরের আলোচনা হইতে পারে। যে প্রণালীর সহিত তোমরা এক্ষণ সুপরিচিত—সেই প্রণালীটি এই :—অন্তর হইতে যাত্রা সুরু করিয়া যাহাতে বহির্বিষয় পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়, এইরূপ একটি নিয়ম আবিষ্কার করা। অতএব মানসিক বিশ্লেষণ হইতেই প্রথমে আমরা যাত্রা আরম্ভ করিব; পরে, সুন্দরের সম্মুখে অবস্থিত যে আত্মা, তাহার অবস্থা অনুশীলন করিব। এইরূপ করিলে,—সুন্দর আসলে কিরূপ, এবং পদার্থের মধ্যে সুন্দর কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহার অনুশীলনের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারিব।

সুন্দরের সম্মুখে অবস্থিত আমাদের যে আত্মা তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাক্।

ইহা একটি অবিসম্বাদিত সত্য কি না যে—কতকগুলি পদার্থ আমাদের সম্মুখে থাকিলে (যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না) তাহার কোন একটিকে দেখিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই :—"এই জিনিসটি সুন্দর;" এই কথাটি অবশ্য সব সময়ে স্পষ্টরূপে বাহিরে ব্যক্ত হয় না। কখন কখন উহা কেবল একটা অস্ফুট উচ্ছ্বাস-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হয়; কখন বা উহা এত নিঃশব্দে মনোমধ্যে উদিত হয় যে, মন উহা ধরিতে পারে না।

এইরূপে সুন্দর বিবিধ আকারে প্রকটিত হইলেও, ইতর-সাধারণ সকলেরই নিকট ইহা একই রূপে প্রকাশ পায়; এবং সকল দেশের ভাষাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

শুধু যে বাহ্যপদার্থের দ্বারাই আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান উদ্বোধিত হয়, তাহা নহে; সৌন্দর্য্যের রাজ্য আরও বিস্তৃত; উহা দৃশ্যমান

অপসংকেও ছাড়াইয়া যায়। সমস্ত প্রকৃতি-রাজ্যের যে সীমা, সৌন্দর্য্যেরও সেই সীমা; আত্মার যে সীমা, মানব-প্রতিভার যে সীমা, সৌন্দর্য্যেরও সেই সীমা। কোন বীরত্বের কাজ দেখিয়া, কাহারও কোন বিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা স্মরণ করিয়া, এমন কি, সূক্ষ্মতম সত্যসমূহ কোন এক দর্শনতন্ত্রের সূত্রে দৃঢ়রূপে বাঁধা পড়িলে—সেই দর্শনতন্ত্রের সরলতা ও ফলবত্তা দেখিয়া, কারুশিল্পীর কারুকার্য্য দেখিয়া, আমাদের অন্তরে সেই একই ভাব উদ্বোধিত হয়। যতই বিচিত্র হউক না, এই সকল পদার্থের মধ্যে এমন একটি সাধারণ গুণ আছে, যাহার সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে। এই গুণটিকেই আমরা সৌন্দর্য্য বলি।

ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিকেরা, স্বকীয় মতের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য সৌন্দর্য্যকে ইন্দ্রিয়সুখে পরিণত করিতে যে চেষ্টা পাইবেন, তাহা ত ধরা কথা।

অবশ্য, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়প্রিয়ও বটে; অন্ততঃ তাহার দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যথিত হয় না। সৌন্দর্য্যের অধিকাংশ ধারণাই নেত্র ও শ্রোত্রের দ্বার দিয়াই আমাদের নিকট উপনীত হয়; এবং সকল প্রকার কলা-সৌন্দর্য্য শরীর-যোগেই আমাদের আত্মায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে পদার্থের সংস্রবে আমাদের কষ্ট হয়, তাহা আসলে যতই সুন্দর হউক না কেন, আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। দুঃখার্ত্ত আত্মাকে সৌন্দর্য্য বড়-একটা অধিকার করিতে পারে না।

সুখজনকতা অনেক সময়েই সৌন্দর্য্য-বোধের সহচর বলিয়া, উহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, উভয়েই এক জিনিস।

অনেক জিনিস, যাহা মনোরম বা সুখদায়ী, তাহাই যে-সর্ব্বা-

পেক্ষা সুন্দর, তাহাও ঠিক নহে। সুন্দর পদার্থ ও সুখদায়ী পদার্থ যে এক জিনিস্ নহে—ইহাই তা'র নিদর্শন। আমাদের ভূয়োদর্শনই ইহার সাক্ষী। যদি এই দুই জিনিস একই হইত, তাহা হইলে উহাদিগকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারিত না;—যে দ্রব্য যে পরিমাণে সুখদ, তাহা সেই পরিমাণে সুন্দর, এবং যে পরিমাণে সুন্দর, সেই পরিমাণে সুখদ হইত।

সে কথা দূরে থাক্,—যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের সুখবোধ হয়, তন্মধ্যে দুইটি ইন্দ্রিয় মাত্র আমাদের অন্তরে সুন্দরের ভাব উদ্বোধিত করে। কেহ কখন কি এরূপ কথা বলে;—"আহা! কি সুন্দর আস্বাদ!" "আহা কি সুন্দর গন্ধ!"—সুখদ ও সুন্দর পদার্থ এক জিনিস হইলে লোকে ঐরূপই বলিত। পক্ষান্তরে, এমন কতকগুলি ঘ্রাণের সুখ, রসনার সুখ আছে, যাহা উৎকৃষ্টতর প্রাকৃতিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য্যেরই মত আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আলোড়িত করিয়া তুলে। তা'ছাড়া, আমাদের চাক্ষুষ ও শ্রোত্রিক অনুভূতিসমূহের মধ্যে যাহা অধিকতর তীব্র, তাহাই যে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যজ্ঞান উদ্বোধিত করে, তাহাও নহে। যে সকল উজ্জ্বলবর্ণের চিত্র শুধু নেত্রকে মুগ্ধ করে, কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করে না—তাহা অপেক্ষা মৃদু বর্ণের চিত্রে কি অনেক সময়ে আমরা বেশী মুগ্ধ হই না? আরো এই কথা আমি বলি,—আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে শুধু যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহা নহে, পরন্তু কখন কখন উহাদ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া যায়। একজন কারুশিল্পী, বিলাসবিভ্রমময় বিবিধ মূর্ত্তির অনুকৃতি রচনা করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু উহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর হইলেও, আমাদের চিত্তকে উদ্বেজিত করে; আমাদের অন্তরে সুন্দরের যে বিশুদ্ধ অক-

লক্ষ আদর্শ বিদ্যমান আছে, তাহাকে ব্যথিত করে। অতএব সুখজনকতা সুন্দরের পরিমাপক নহে ; কেন না, কোন কোন স্থলে, উহা সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করে—সুন্দরকে ভুলাইয়া দেয়। অতএব যাহা কিছু সুখদ, তাহাই সুন্দর নহে ; যেহেতু, যেখানে সুন্দর বস্তু নাই—সেখানেও সুখদ বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়—সমধিক পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সুন্দর ও সুখদ বস্তুর মধ্যে যে প্রভেদ—উক্ত তত্ত্বটিই তা'র মূলে বিদ্যমান ; অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়চেতনা ও জ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ' উহাদের মধ্যেও সেই প্রভেদ।

যখন কোন পদার্থের সংস্রবে তোমার সুখানুভব হয়, তখন যদি কেহ তোমাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তুমি তা'র কিছুই উত্তর দিতে পার না, তুমি শুধু বল'—এইরূপই আমি অনুভব করি। যদি কেহ তোমাকে জানাইয়া দেয়, যে, ঐ একই পদার্থ হইতে অন্য বক্তিদের ভিন্নপ্রকার অনুভূতি উৎপন্ন হয়—উহা তাহাদের অপ্রীতি উৎপাদন করে ; তাহা হইলে তুমি বোধ হয় বিস্মিত হও না ; কেন না, তুমি জান, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ; সেই জন্য, অনুভূতি-সম্বন্ধে তুমি কাহাকেও প্রতিবাদ করিতে পার না। কিন্তু যদি কোন বস্তু কেবল মাত্র সুখদ না হয়—তাহার উপর আবার যদি তুমি তাহাকে সুন্দর বলিয়া বিবেচনা কর—তাহা হইলে সে স্থলে তুমি কি তাহার প্রতিবাদ কর না ? তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর—এই মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তিটি সুন্দর ; সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য, কিংবা সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটি সুন্দর ; নিঃস্বার্থভাব ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভাবটি সুন্দর ; ধর্ম্ম সুন্দর ; যদি কেহ এই সকল সিদ্ধান্তের সত্যতা-বিষয়ে প্রতিবাদ করে, তখন পূর্ব্বে যেরূপ তুমি সহজে সায় দিয়া গিয়াছিলে, এস্থলে তুমি সেরূপ

সহজে সায় দিতে পার না;—তুমি তাহার সেই প্রতিবাদকে ভিন্ন রুচির অনিবার্য্য পরিণাম বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না; তখন তুমি ইন্দ্রিয়চেতনাশক্তির তারতম্যের দোহাই দেও না; তুমি তখন এমন একটা প্রমাণের দোহাই দেও, যাহা সকলের পক্ষেই সমান বলবৎ,—অর্থাৎ তখন তুমি জ্ঞানের দোহাই দেও।

তখন তোমার মনে হয়, তোমার প্রতিবাদকারীকে ভ্রান্ত বলিতে তুমি অধিকারী; কেন না, এস্থলে তোমার সিদ্ধান্তটি, সুখকর কিংবা কষ্টকর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ন্যায় এমন-কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে যাহা পরিবর্ত্তনশীল ও ব্যক্তিগত। সুখানুভূতি আমাদের নিজের দৈহিক গঠনতন্ত্রের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ; এই গঠনতন্ত্র প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে, বায়ুর শৈত্য-তাপ-অনুসারে, আমাদের স্নায়ুর অবস্থা-অনুসারে নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সুন্দর-সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। সত্যের ন্যায় সুন্দরও আমাদের কাহারও নিজস্ব জিনিস নহে। ইহার সম্বন্ধে যদৃচ্ছাক্রমে বিচারনিষ্পত্তি করা আমাদের কাহারও অধিকারায়ত্ত নহে; এবং যখন আমরা বলি,—"ইহা সত্য," "ইহা সুন্দর,"—তখন উহা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার অনুভূত পরিবর্ত্তনশীল ও ব্যক্তিগত ধারণামাত্র নহে, উহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত - যাহা মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়চেতনাকে যদি জ্ঞানের সহিত এক করিয়া ফেল, সুন্দরকে যদি সুখানুভূতিতে পরিণত কর, তাহা হইলে রুচি-সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম থাকে না। বেলবেডিয়ারের আপলো-প্রতিমাকে দেখিয়া কোন ব্যক্তি যদি বলে,—অন্য প্রতিমা দেখিয়া আমাকে মনে যে সুখানুভব হয়, এই প্রতিমাকে দেখিয়া তদপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক সুখানুভব হয় না,

কিংবা এই প্রতিমাটি আমার আদৌ ভাল লাগে না, ইহাতে কোন সৌন্দর্য্য আমি দেখিতে পাই না, তাহা হইলে আমি তাহার অনুভূতির প্রতিবাদ করিতে পারি না; কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, অ্যাপলো সুন্দর নহে, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিব, আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিব, সে ভ্রমে পতিত হইয়াছে। লোকে সুরুচি ও কুরুচির মধ্যে প্রভেদ করে; কিন্তু যদি সুন্দর শুধু সুখদ-তেই পরিণত হয়, তাহা হইলে এই প্রভেদের অর্থ কি? তুমি আমাকে বলিবে, আমার রুচি নাই; অর্থাৎ—তোমার যেরূপ অনুভূতি হইতেছে, আমার সেরূপ অনুভূতি হইতেছে না—এই না? যে জিনিসটিকে তুমি প্রশংসা করিতেছ, উহা তোমার উপর যে প্রভাব প্রকটিত করিতেছে, আমার উপরেও কি সেই একই প্রভাব প্রকটিত করিতেছে না? তুমি যাহা অনুভব করিতেছ, তাহা যেমন সত্য, আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তাহা কি তেমনই সত্য নহে? তবে কি করিয়া তুমি বলিবে, তোমার অনুভূতিটিই ঠিক্, এবং আমার অনুভবটি ঠিক্ নহে,—যখন আমরা উভয়েই সেই একই বস্তুর অনুভব করিতেছি। তুমি যাহা অনুভব করিতেছ, তাহাই অধিকাংশ লোক অনুভব করে, এবং আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তাহা অধিকাংশ লোক অনুভব করে না—এই জন্যই কি তুমি এই কথা বলিতেছ? কিন্তু মতামতের সংখ্যা এস্থলে কিছুই নহে। সুন্দরের যখন এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক, তাহাই সুন্দর, তখন উহা যদি একজনেরও ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, সমস্ত মানবমণ্ডলীর নিকট উহা কদাকার বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সেই একজন ব্যক্তি যাহার ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হইতেছে, সে উহাকে সুন্দর বলিয়া ন্যায্যরূপে আখ্যাত করিতে পারে; কেন না,

সে, সুন্দরের যে লক্ষণ করিয়াছে, তাহার সহিত উহাঁর সম্পূর্ণ মিল আছে। তাহা হইলে বলিতে হয়, বাস্তবিক সুন্দর বলিয়া কোন জিনিসই নাই; সমস্ত সৌন্দর্য্যই আপেক্ষিক ও পরিবর্ত্তনশীল; সমস্ত সৌন্দর্য্যই অবস্থানুগত, প্রথানুগত, বা প্রচলিত সংস্কারের অনুগত; সৌন্দর্য্যের মধ্যে যতই ভেদ থাকুক না কেন, যদি উহা কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হয়, তাহা হইলে উহা সকলেরই সমান পূজ্য হইবে; এবং যখন এই জগতে লোকের প্রকৃতি-বৈষম্যের অন্ত নাই, তখন কোন-না-কোন জিনিস কোন-না-কোন লোকের প্রীতিকর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি;—তাহা হইলে এমন কিছুই থাকে না, যাহা সুন্দর নহে; অথবা, আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, সুন্দর বলিয়াও কোন জিনিস থাকে না, কুৎসিত বলিয়াও কোন জিনিস থাকে না; তাহা হইলে হটেন্‌টট্ ভীনস্ (Venus) ও মেদিচির ভীনস্—দুই এক-সমান;—এই সিদ্ধান্তটি যেমন অসঙ্গত, যে মূলসূত্র অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছান গিয়াছে, তাহাও সেইরূপ অসঙ্গত। এই অসঙ্গতির হাত হইতে এড়াইবার একটি মাত্র উপায় আছে; সে উপায়—পূর্ব্বোক্ত মূল সূত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করা;—এই কথা স্বীকার করা যে, সুন্দরের একটি ধ্রুব আদর্শ আমাদের অন্তরে নিহিত আছে—উহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

যে চড়ায় ঠেকিয়া প্রত্যক্ষবাদের তরীখানি চূর্ণ হইয়া যায় সেটি এই:—অপূর্ণ ও অসীম সৌন্দর্য্যের একটা ধারণা কি আমাদের অন্তরে নাই? যখন আমরা প্রকৃতির বিচিত্র-শোভাসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, সেই সঙ্গে একটা উচ্চতর সৌন্দর্য্যের দিকে আমাদের চিত্ত কি উন্নীত হয় না,—যাহাকে প্লেটো 'সুন্দরের আইডিয়া" বলেন,

এবং তাঁহার ন্যায় সুকুমার-রুচির লোকমাত্রই—প্রকৃত কলা-গুণী-মাত্রই—যাহাকে সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ বলিয়া অভিহিত করেন? আমরা যখন বিবিধ পদার্থের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য নির্দ্ধারণ করি, তখন অনেক সময়ে আমাদের অজ্ঞাতসারেও আমরা কি সেই মূল-আদর্শের সহিত তাহাদের তুলনা করি না—যে আদর্শটি বিশেষ-বিশেষ সৌন্দর্য্যের মানদণ্ডস্বরূপ? সুন্দরের যে পূর্ণ-আদর্শ আমাদের সমস্ত সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, যে অতীন্দ্রিয় ধ্রুব সৌন্দর্য্যের রূপ কল্পনা অসম্ভব, তাহাকে ইন্দ্রিয়বোধ কি করিয়া প্রকাশ করিবে?

অতএব, যে দর্শনতন্ত্র শুধু ইন্দ্রিয় হইতেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে, সেই দর্শনতন্ত্র এই আদর্শ-সৌন্দর্য্যের সম্মুখে আসিয়াই স্তম্ভিত হয়। ইন্দ্রিয়বোধ হইতে ভিন্ন যে ভাবরস,—সেই ভাব-রসের দ্বারাও ইহার সমুচিত ব্যাখ্যা হয় কি না, দেখা যাক্। জ্ঞানের অনেকটা কাছাকাছি যায় বলিয়া, কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুন্দরের ধারণা ও মঙ্গলের ধারণার মূলে এই ভাবরসকে স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য ইন্দ্রিয়বোধ হইতে ভাব-রসে অগ্রসর হওয়া কতকটা উন্নতি বটে। আমাদের মতে, কঁদিয়াক্ ও হেল্‌ভেসিয়াস্ ছাড়া, হচিসন্ ও স্মিথ্ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দার্শনিক এই মতাবলম্বী।—কিন্তু আমাদের বিশ্বাস,—আমরা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, জ্ঞানের সহিত ভাবকে এক করিয়া ফেলিলে, ভাবের মূলটিকে ভাব হইতে অপসারিত করা হয়। ভাবের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল ও সবিশেষ; যেমন মানুষে মানুষে পার্থক্য, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের ভাবের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তাই ভাব কখনই স্বসম্পূর্ণ বা অনন্যনিরপেক্ষ হইতে পারে না। মূলতত্ত্ব না

হইলেও, ভাব যে একটি প্রধান তথ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে জ্ঞান হইতে ভাবের পার্থক্য ভালরূপে নির্ণয় করিয়া, তাহার পর ভাবকে আমরাই ইন্দ্রিয়বোধ অপেক্ষা উচ্চ আসনে স্থাপন করিব এবং সৌন্দর্য্যগ্রহণে ভাবের কতটা হাত আছে তাহা দেখাইব।

যে প্রকৃতি-রাজ্যে মানুষ সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, সেই প্রাকৃতিক কোন পদার্থের সম্মুখে আপনাকে তুমি স্থাপন কর এবং সেই পদার্থ দর্শনে তোমার অন্তরে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা মনোযোগ সহকারে একবার পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহা কি ঠিক্ নহে—যখন তুমি কোন পদার্থকে সুন্দর বলিয়া স্থির কর, তখন সেই পদার্থের সৌন্দর্য্যও তুমি অনুভব কর,—অর্থাৎ তদ্দর্শনে তোমার অন্তরে একটি মধুর ভাবের সঞ্চার হয় এবং তখন তুমি সহানুভূতি ও প্রীতির আকর্ষণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হও? অন্যস্থলে যখন তুমি ইহার বিপরীত বলিয়াই স্থির কর, তখন তোমার অন্তরে বিপরীত ভাবেরই আবির্ভাব হয়। বিচারে যখন তুমি কোন পদার্থকে কুৎসিৎ বলিয়া স্থির কর, তখন সেই সঙ্গে তোমার অন্তরেও একটা বিরাগের ভাব উপস্থিত হয়; এবং বিচারে যখন কাহাকে সুন্দর বলিয়া স্থির কর তখন সেই সঙ্গে তোমার অন্তরেও একটা অনুরাগের ভাব উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক পদার্থ দর্শনেই যে শুধু এইরূপ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। যে কোন বিষয়ই হোক্ না কেন, বিচারে যাহা কিছু আমরা সুন্দর কিংবা কুৎসিৎ বলিয়া স্থির করি, তাহারই সম্বন্ধে এই-রূপ দুইটি বিপরীত ভাব আমাদের অন্তরে উপস্থিত হয়। যত ইচ্ছা অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দেখ,—একটা চমৎকার অট্টালিকার সম্মুখে কিংবা একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখে আপনাকে স্থাপন কর; দেকার্ট ও নিউটনের মহৎ আবিষ্কার, (Conde) কদের মহতী

বীর-কীর্ত্তি, Saint Vincent de Paul-এর অনুপম ধর্ম্মভাব মনে ভাবিয়া দেখ; আরও ঊর্দ্ধে আপনাকে উত্তোলন কর;—অনন্তপুরুষের ধারণাটিকে আপনার অন্তরে জাগাইয়া তোল;—যাহাই কর না কেন,—যখনই সুন্দরের ভাব তোমার মনে উদ্দীপিত হইবে, সেই সঙ্গে তোমার চিত্ত একপ্রকার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসে পরিপ্লুত হইবে, এবং সেই রসোদ্দীপক বিষয়টির প্রতি তোমার অনুরাগ স্বভাবতই ধাবিত হইবে।

বিষয়টি যে পরিমাণে সুন্দর—আত্মার আনন্দও সেই পরিমাণে তীব্র এবং অনুরাগও সেই পরিমাণে গভীর হইয়া থাকে—অথচ সে অনুরাগের মধ্যে লালসার উদ্দাম আবেগ থাকে না। আমরা যখন কোন বস্তুকে সুন্দর বলিয়া মনে মনে প্রশংসা করি, সেই প্রশংসার মধ্যে আমাদের বিচারবুদ্ধির প্রভাব বেশী থাকিলেও উহা ভাবরসে অনুরঞ্জিত। যখন আমাদের এই গুণমুগ্ধতা (admiration) এমন একটা সীমায় আসিয়া পৌঁছে যে, তাহাতে চিত্ত চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া মানব-প্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন চিত্তের এই অবস্থা,—উন্মত্ত অনুরাগ বা মত্ততা (enthousiasm) নামে অভিহিত হয়।

ইন্দ্রিয়বোধের দর্শনতন্ত্র, সুন্দরসম্বন্ধীয় ধারণার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সৌন্দর্য্যরসের স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন;—সৌন্দর্য্যরস ও সুখানুভূতি, এই উভয়কে এক করিয়া ফেলেন। এই দর্শনতন্ত্রের নিকট সৌন্দর্য্য, বাসনা বই আর কিছুই নহে।

কিন্তু প্রত্যক্ষব্যাপারসমূহ এই মতবাদের বিরুদ্ধে যেরূপ সাক্ষ্য দেয় এমন আর কোন মতবাদের সম্বন্ধে নহে।

বাসনা কাহাকে বলে? প্রকাশ্য ভাবেই হউক, বা গোপনেই হউক, কোন বস্তুকে পাইবার জন্য চিত্তের যে আবেগ, তাহাই বাসনা।

গুণামুগ্ধতার প্রকৃতি ভক্তিরসাত্মক; পক্ষান্তরে বাসনা স্বকীয় বিষয়কে অধোনীত করে।

বাসনা,—অভাববোধ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব বাসনা বলিলেই বুঝায়,—যাহার মনে বাসনার উদয় হয়, তাহার একটা কিছু অভাব আছে, ত্রুটি আছে এবং তজ্জন্য সে কতকটা কষ্টও পাইয়া থাকে; কিন্তু সৌন্দর্য্যরসের পরিতৃপ্তি সৌন্দর্য্যরসেই; সৌন্দর্য্যরস আত্মপরিতৃপ্ত।

বাসনা জ্বালাময়ী, আবেগময়ী ও দুঃখদায়িনী। পক্ষান্তরে, ভয়-বাসনা-বিমুক্ত যে সৌন্দর্য্যরস, সেই সৌন্দর্য্যরস চিত্তকে উন্নত করে, পুলকিত করে, এমন কি কখন কখন মত্ততার সীমা পর্য্যন্ত লইয়া যায়; অথচ উদ্দাম বাসনার যে কষ্ট তাহা ভোগ করিতে হয় না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি যেখানে শুধু ইন্দ্রিয়াকর্ষক ভাব ও ভীষণ ভাব দেখিতে পান, কলাগুণী সেখানে কেবল সৌন্দর্য্যই দেখেন। ঝটিকা-তাড়িত জাহাজের উপর যখন আরোহীগণ উত্তালতরঙ্গ দর্শনে ও মস্তকোপরি ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণে কম্পিতকলেবর হন, তখন কলাগুণী সেই ভীম-কান্ত দৃশ্যের শুধু সৌন্দর্য্যধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন। ঝড়ের মহান্ ও ভীষণ সৌন্দর্য্য অধিকক্ষণ ধ্যান করিতে পারিবেন বলিয়া, কলাগুণী ভের্ণে (Vernet) একটা মাস্তলে আপনাকে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন। যখনই তিনি ভয় পাইলেন, মানব-সাধারণ আবেগের বশবর্ত্তী হইলেন, তখনই তাঁহাতে যে কলাগুণী ছিল, সেই কলাগুণীই যেন মূর্চ্ছিত হইল; তখন সামান্য মানুষ ছাড়া তাঁহাতে আর কিছুই রহিল না।

সৌন্দর্য্যরস ও বাসনা—এই উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ যে, উভয়ই উভয়কে খণ্ডন করে। একটা গ্রাম্যধরণের দৃষ্টান্ত দিই :—

সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন ও অমৃতময় বিবিধ সুরায় সজ্জিত একটা ভোজের স্থান দেখিয়া তোমার চিত্তে ভোগবাসনা জাগিয়া উঠে; কিন্তু সৌন্দর্য্যরসবোধ জাগিয়া উঠে না। আবার নেত্রসমক্ষে সুসজ্জিত এই সমস্ত সামগ্রীর দ্বারা আমার রসনা তৃপ্ত হইবে,—একথা না ভাবিয়া, যদি শুধু আমি ভাবিয়া দেখি, স্থানটি কেমন সাজান হইয়াছে, ভোজের ব্যবস্থা কিরূপ পারিপাটী হইয়াছে, তাহা হইলে, সৌন্দর্য্যরসবোধ কিয়ৎপরিমাণে আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিতে পারে; কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ভোজন-স্থানের এই সজ্জা-সুষমা—ভোজের এই ব্যবস্থা-পারিপাট্য আত্মসাৎ করিবার জন্য আমার মনে কখনই বাসনার উদ্রেক হইবে না।

বাসনার উদ্রেক করা—বাসনাকে উদ্দীপিত করা সৌন্দর্য্যের কাজ নহে; বাসনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলা—মহৎ করিয়া তোলাই তাহার কাজ। যে রমণী যে পরিমাণে সুন্দর—(সেরূপ সাধারণ-ধরণের,—স্থূল-ধরণের সৌন্দর্য্য নহে, যাহা চিত্রকর Rubans রুবা অতীব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন; পরন্তু সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্য, যাহা প্রাচীন গ্রীসের চিত্রগণ, এবং Raphael ও Leseur এমন উৎকৃষ্টভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,) সেই পরিমাণে, তাঁহার সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শনে আমাদের বাসনা, একপ্রকার অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়,—এমন কি, কখন কখন নিঃস্বার্থ ভক্তিরসে পরিণত হয়। "ক্যাপিটলের ভীনস্", কিংবা Sainte Cecile কিংবা Lambert-এর অট্টালিকায় অধিষ্ঠিত Muse—প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শনে যদি তোমার মনে ইন্দ্রিয়লালসা উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে বুঝিব তুমি সৌন্দর্য্যানুভূতির শক্তি লইয়া জন্মাও নাই—সৌন্দর্য্য তোমার জন্য নহে। যিনি প্রকৃত কলাগুণী, তিনি আমাদের

ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আত্মাকে অধিক পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করেন। সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিবার সময় তিনি শুধু আমাদের মনে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসেরই উদ্রেক করিবার প্রয়াস পান; যখন তিনি সৌন্দর্য্যরস এতটা জাগাইয়া তোলেন যে, উহা মত্ততার সীমায় আসিয়া পৌঁছে, তখনই তাঁহার গুণপনা চরম সিদ্ধি লাভ করে;—শিল্পকলা চরম ঔৎকর্ষে উপনীত হয়।

অতএব, সৌন্দর্য্য-রস একটি বিশেষ রস, এবং সৌন্দর্য্যের ধারণাও একটি অমিশ্র ধারণা; কিন্তু এই সৌন্দর্য্যরস কোন একটা বিশেষ আকারে কি প্রকটিত হয় না? কোন-এক বিশেষ জাতীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিই কি উহার প্রয়োগ হয় না? অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, এখানেও প্রত্যক্ষকে সাক্ষী মানিতে হইবে।

যখন আমাদের নেত্রসমক্ষে কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে—যাহা সুস্পষ্ট ও সুপরিস্ফুট, এবং যাহার সমস্তটাকে এক-নজরে আমরা সহজে ধরিতে পারি,—যেমন কোন সুন্দর ফুল, সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি, কিংবা প্রাচীন গ্রীসের কোন অনতি-বিরাট্ শোভন মন্দির,—তখন আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই ঐ পদার্থের প্রতি আসক্ত হয়, এবং এক-প্রকার অবিমিশ্র সন্তোষ-সহকারে তাহার উপর বিশ্রাম করে; আমাদের ইন্দ্রিয়গণ, উহার সমস্ত খুটিনাটি সহজে ধরিতে পারে, এবং আমাদের জ্ঞান উহার সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সহজ সামঞ্জস্য উপলব্ধি করে। ঐ পদার্থটি তিরোহিত হইলেও উহার প্রতিরূপ আমরা স্পষ্টরূপে কল্পনা করিতে পারি;—কেননা, উহার অবয়বগুলি এতই সুনির্দ্দিষ্ট ও সুবিভক্ত। আমাদের অন্তরাত্মা তখন উহার ধ্যানে একপ্রকার মধুর ও প্রশান্ত আনন্দ অনুভব করে, আমাদের চিত্ত উল্লাসে বিকশিত হইয়া উঠে।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি এমন-কোন পদার্থ অবলোকন করি, যাহার আকার-প্রকার তেমন সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট নহে, অথচ যাহা দেখিতে খুবই সুন্দর, অবশ্য তাহা দেখিয়াও আমরা একপ্রকার সুখ অনুভব করি, কিন্তু তাহা ভিন্ন শ্রেণীর সুখ। এই পদার্থটিকে প্রথমটির মত আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। জ্ঞান তাহার একটা স্থূল ধারণা করিতে পারে মাত্র; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়সকল তাহাকে সমগ্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং আমাদের কল্পনাতেও তাহার প্রতিরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না; আমাদের ইন্দ্রিয়াদি, আমাদের কল্পনা, স্বকীয় অন্তিম সীমায় পৌঁছিতে বৃথা প্রয়াস পায়; আমাদের মনোবৃত্তিগুলি ঐ পদার্থটিকে উপলব্ধি করিবার জন্য আপনাদিগকে সাধ্যমত বিবর্দ্ধিত করে, বিস্ফারিত করে; কিন্তু তথাপি ঐ পদার্থটিকে ধরিতে পারে না, পদার্থটি উহাদিগকে অতিক্রম করে। আমরা এইরূপ পদার্থ হইতে যে সুখ অনুভব করি, সে সুখ উহার বৃহত্ত্ব হইতেই উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঐ বৃহত্ত্বই আমাদের অন্তরে একটা বিষাদের ভাব জন্মাইয়া দেয়; কেন না, ঐ বৃহত্ত্বের মাত্রা আমাদের পক্ষে—আমাদের ধারণার পক্ষে অত্যন্ত বেশী। তারকা-খচিত আকাশ, বিশাল সমুদ্র, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত—এই সমস্ত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই বটে; কিন্তু তাহার সহিত একটা বিষাদের ভাবও মিশ্রিত থাকে। তাহার কারণ, সমস্ত জগতের ন্যায় ঐ সকল পদার্থ বাস্তবিক সসীম হইলেও আমাদের নিকট অসীম বলিয়া মনে হয়; কেন না, উহাদের অপরিমেয়তা আমরা ধারণ করিতে পারি না; এবং যাহা বাস্তবিক অসীম, তাহাকে অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের অন্তরে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়; এই অনন্তের ভাব যেমন একদিকে আমাদিগকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে, তেমনি

অপরদিকে আমাদিগকে নীচে নামাইয়া বিনম্র করিয়া তুলে। ইহার অনুরূপ যে ভাবরসটি আমরা অনুভব করি, উহাকে একপ্রকার কঠোর সুখ বলিলেও বলা যায়।

এই প্রভেদটি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য, আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাহা এক-নজরে সহজে দেখা যায়, এইরূপ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট অনতিবিস্তৃত একটা ময়দান দেখিয়া তোমার যে মনোভাব হয়, সাগর-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত-পাদ কোন অভ্রভেদী দুরধিগম্য পর্ব্বত দর্শনেও কি তোমার একই প্রকার মনোভাব হয়? মধুর দিবালোক, সুললিত কণ্ঠস্বর, তোমার মনের উপর যে প্রভাব প্রকটিত করে,—ঘোর অন্ধকার ও মহানিস্তব্ধতাও কি সেই একই প্রকার ভাব তোমার মনে উদ্রেক্ করে? আবার জ্ঞান ও নীতির দিক্ দিয়া দেখ—যখন কোন ধনাঢ্য লোক, তাহার ধনভাণ্ডার অকুণ্ঠিতভাবে দীনদরিদ্রের নিকট উন্মুক্ত করে, কিংবা যখন কোন উদারচেতা ব্যক্তি নিজ শত্রুর প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করে, এবং আপনার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াও সেই শত্রুর প্রাণ রক্ষা করে,—এই উভয় স্থলে তোমার মনোভাব কি একইরূপ হইয়া থাকে? সুললিত ছন্দোবন্ধ ও কোমলকান্তপদাবলীতে পূর্ণ একটা লঘুধরণের কবিতা মনে করিয়া দেখ, Horace-এর পত্র—Valtaireএর ক্ষুদ্র পদ্যগুলি মনে করিয়া দেখ,—আর তাহার পাশাপাশি 'ইলিয়াড্, কিংবা ভারতবাসীদিগের সেই সব মহাকাব্য—যাহা আশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ, যাহাতে উচ্চাঙ্গ-দর্শনের সহিত সুন্দর ও বিষাদময় বর্ণনা সম্মিশ্রিত—যাহার শ্লোকসংখ্যা দ্বিসহস্রাধিক, দেবতা ও রূপক-বিষয়ীভূত ব্যক্তিগণ যাহার নায়ক—সেই সব মহাকাব্য মনে করিয়া দেখ; এই উভয় জাতীয় কাব্য পাঠে তোমার মনে কি একই প্রকার ভাব সমুদিত

রূপ? আর একটা দৃষ্টান্ত দিই—ইহাই শেষ দৃষ্টান্ত;—মনে কর এক-দিকে, একজন লেখক কলমের দুই-এক খোঁচায় সমস্ত মানব জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিলেন; কিন্তু সেই বিশ্লেষণটি বেশ প্রীতিজনক হইলেও তাহাতে গভীরতা নাই; আর এক দিকে, একজন দার্শনিক, জ্ঞান-বৃত্তিকে তন্নতন্নরূপে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশে, দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিয়া জ্ঞানের মূলতত্ত্ব ও তৎপ্রসূত ফলপরম্পরা তোমার সম্মুখে ধারণ করিলেন; তাঁহার প্রণীত সেই "ইন্দ্রিয়-বোধসম্বন্ধীয় সন্দর্ভ" ও "বিশুদ্ধ-জ্ঞানের তত্ত্ববিচার" পাঠ করিয়া দেখ,—সত্য-মিথ্যার কথা না ভাবিয়া শুধু সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াই দেখ,—এবং তাহার পর তুলনা করিয়া বল,—এই উভয় শ্রেণীর লেখা পাঠ করিয়া তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়।

অতএব দেখ, এই দুই প্রকার ভাব, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; একটিকে বিশেষরূপে "সুন্দর," এবং অপরটিকে "মহান্" বলা যায়।

সৌন্দর্য্যগ্রহণে যে সকল মনোবৃত্তি প্রযুক্ত হয়,—সেই সকল মনোবৃত্তির আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য, জ্ঞান ও ভাবের পর আর একটি মনোবৃত্তির উল্লেখ করা আবশ্যক; সে বৃত্তিটিও কম প্রয়োজনীয় নহে; সেই বৃত্তিটি অন্যবৃত্তিগুলিকে সজীব করিয়া তোলে,—সেটি কল্পনা।

কোন বাহ্যপদার্থ সম্মুখে বিদ্যমান থাকিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ, বিচারবুদ্ধি ও ভাবরস যেরূপ সেই পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হয়, সেই-রূপ তাহার অবিদ্যমানেও সেইসকল বৃত্তির পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। সেইস্থলে উহাকে স্মৃতি বলা যায়।

স্মৃতি দ্বিবিধ; কোন পদার্থের সম্মুখে আমি ছিলাম বলিয়াই যে শুধু সেই পদার্থ আমার মনে পড়ে, তাহা নহে; পরন্তু সেই পদার্থের

উপস্থিতিকালে সে যেমনটি ছিল, যেমনটি আমি তা'কে দেখিয়াছিলাম, যেমনটি অনুভব করিয়াছিলাম, বিচারে তাহাকে যেমনটি ভাবিয়াছিলাম, তাহার অবিদ্যমানেও ঠিক্ সেই ভাবেই তাহাকে আমার মানস-পটে অঙ্কিত করি। এইরূপ স্থলে, কোন কোন দার্শনিক, এই স্মৃতিকে কল্পনাত্মক স্মৃতি বলিয়া অভিহিত করেন। উহাই কল্পনা-বৃত্তির মূল ; কিন্তু কল্পনা উহা হইতে আরও কিছু বেশী।

স্মৃতিকর্ত্তৃক যে সকল প্রতিবিম্ব আনীত হয়, মন সেই সকল প্রতিবিম্বকে বিশ্লেষণ করে, উহাদের বিভিন্ন অবয়ব-রেখার মধ্য হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লয়, এবং সেই সকল রেখা লইয়া আবার নূতন প্রতিবিম্ব রচনা করে। নূতন রচনার এই শক্তিটি না থাকিলে কল্পনা, স্মৃতির গণ্ডির মধ্যেই বন্দী হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই।

পদার্থসমূহের দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়া, ঐ সকল পদার্থ অনুপস্থিত, কিংবা অন্তর্হিত হইলেও উহাদের প্রতিবিম্ব পুনরুৎপাদন করা, এবং নূতন করিয়া রচনা করিবার জন্য ঐ সকল প্রতিবিম্বকে রূপান্তরিত করা,—ইহাতেই কি সমস্ত কল্পনা নিঃশেষিত হয় ? না, তাহা নহে। অন্ততঃ ঐগুলি কল্পনার মূল উপাদান ; কিন্তু উহাতে আরও কিছু যোগ করা আবশ্যক ;—সেটি সৌন্দর্য্যরস। এই সৌন্দর্য্যরসের প্রভায় মহতী কল্পনা পরিপোষিত ও উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কোন নাটককার যদি কোন নায়কের চরিত্র ভাল করিয়া অনুশীলন করেন, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি জীবন্ত দৃশ্য প্রদর্শন করেন, চরিত্রের মুখ্য অবয়বগুলি লইয়া সুন্দররূপে যোগাযোগ করেন, তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল ?—না; তা' ছাড়া সৌন্দর্য্যরস চাই, সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ চাই ;—সেই মহৎ অন্তঃকরণ চাই, যাহা হইতে নাটককারের মহতী রচনা প্রসূত হইয়া থাকে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। আমি বলিতেছি না—এই সৌন্দর্য্যরসই কল্পনা; আমি শুধু বলিতেছি, এই সৌন্দর্য্যরসের উৎস হইতেই কল্পনা দৈবস্ফূর্ত্তি লাভ করে, কল্পনা ফলবতী হয়। কল্পনা-বিষয়ে লোকের মধ্যে যে এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ,—কেহবা পদার্থসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াও উত্তেজিত হয় না, যে সকল প্রতিবিম্ব তাহারা স্বকীয় চিত্তে সংরক্ষিত করে, সেই সকল প্রতিবিম্ব দেখিয়াও উত্তেজিত হয় না, যোগাযোগ করিয়া যে সকল নূতন প্রতিবিম্ব তাহারা রচনা করে, সেই সকল নূতন রচনাতেও তাহারা উত্তেজিত হয় না। পক্ষান্তরে, আর কতকগুলি লোক,—যাহাদের একটা বিশেষ প্রকারের ভাব-বোধশক্তি আছে; কোন পদার্থের প্রথম দর্শনেই যাহাদের তীব্রতর গভীরতর একপ্রকার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়,—তাহারাই সেই জনন্ত স্মৃতিগুলিকে অন্তরে রক্ষা করে, এবং তাহাদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরিচালনায় একটা প্রবল আবেগ পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-রসটি অপসারিত কর—সমস্তই নির্জীব হইয়া পড়িবে। এই ভাব-রসের প্রবাহ ছুটুক,—আবার সমস্তই জীবন-স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে—জীবনের রঙে রঞ্জিত হইবে।

কল্পনা শুধু দৃশ্যবস্তু ও দৃশ্যবস্তুর মানসিক প্রতিবিম্বেই বদ্ধ নহে। ধ্বনি দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব না হইলেও, ধ্বনিসমূহ স্মরণে আনিয়া তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইবার জন্য কল্পনার কি আবশ্যক হয় না? যে ব্যক্তি প্রকৃত সঙ্গীতগুণী, তাহার কল্পনাশক্তি চিত্রকরের অপেক্ষা কিছু কম নহে। যখন কোন কবি স্বভাব-বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার প্রতি লোকে কল্পনাশক্তি আরোপ করে; কিন্তু যখন তিনি ভাবরসের অবতারণা করেন, তখন কি তাঁহার কল্পনা অস্বীকার করিবে? কিন্তু কবি তাঁহার কবিতার মধ্যে, দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব

ও ভাবরস ছাড়া,—ন্যায়, স্বাধীনতা, ও ধর্ম্ম,—এই সমস্ত নৈতিক-তত্ত্বেরও কি প্রয়োগ করেন না? এই সকল নৈতিক-চিত্রে—আত্মার এই আভ্যন্তরিক জীবন-চিত্রে, কল্পনার অস্তিত্ব নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারে?

রসবোধ যেমন কল্পনার উপর কাজ করে, তেমনই কল্পনাও তাহার সেই ঋণ সুদ-সমেত পরিশোধ করে।

আমার বক্তব্য কথাটা এই:—এই বিশুদ্ধ ও জলন্ত আবেগ, এই সৌন্দর্য্যানুরাগ—যাহাতে করিয়া কোন ব্যক্তি কলাগুণী হইতে পারে,—ইহা কল্পনা-প্রবণ লোক ছাড়া আর কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষ সুন্দর পদার্থই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সৌন্দর্য্যরস জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই পদার্থটি আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেও, যদি তাহার জলন্ত প্রতিবিম্ব আমাদের অন্তরে থাকিয়া না যায়, তবে মুহূর্ত্তের তরে, যে সৌন্দর্য্যরস আমাদের অন্তরে উদ্বোধিত হইয়াছিল, তাহা অল্পে অল্পে অপনীত হয়; অন্য কোন পদার্থদর্শনে সেই রসবোধ আবার জাগিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার অদর্শনে আবার নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সেই পদার্থটির প্রতিবিম্ব, কল্পনার দ্বারা ক্রমাগত পরিপোষিত, ও পরিবর্দ্ধিত না হওয়া পর্য্যন্তই উহা অন্তরে স্থায়ী হয় না। উহাতে সেই কল্পনাশক্তি থাকা চাই সেই প্রবল অন্তঃস্ফূর্ত্তির প্রেরণা থাকা চাই, যাহা ব্যতীত কেহই কবি হইতে পারে না—কলাগুণী হইতে পারে না।

আর একটা বৃত্তি-সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। সে বৃত্তিটি একটি অমিশ্র বৃত্তি নহে; তাহা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলিরই সহজ সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। ইহাকে কলা-রুচি বলে। এই কলা-রুচি-সম্বন্ধে অনেকেই

অযথারূপে আলোচনা করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যদৃচ্ছাক্রমে কলা-রুচিকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

কোন একটি সুন্দরকাব্যরচনা, কিংবা সাঙ্গীতিক রচনা শ্রবণ করিবার পর, কোন প্রতিমূর্ত্তি কিংবা কোন চিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইবার পর, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, তাহা যদি মানস-পটে আবার আনিতে পার, যে শব্দ আর ধ্বনিত হইতেছে না, সেই শব্দ যদি আবার শুনিতে পার,—এক কথায়, তোমার যদি কল্পনাশক্তি থাকে, তাহা হইলেই বলিতে পারা যায়, তুমি এমন একটা জিনিস পাইয়াছ, যাহার অভাবে প্রকৃত কলা-রুচি জন্মিতে পারে না। ফলতঃ, কল্পনা-প্রসূত রচনার রসাস্বাদ করিতে হইলে, সেইরূপ রচনা করিবার শক্তি কতকটা তোমার নিজেরও থাকা আবশ্যক নহে কি? কোন গ্রন্থকারের রচনা-রস অনুভব করিতে হইলে, সেই গ্রন্থকারের সমকক্ষ হইতে না পারিলেও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার সহিত তোমার সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক নহে কি? কোন ব্যক্তি বেশ বুদ্ধিমান্;—কিন্তু নীরস ও কঠোর-প্রকৃতি (যেমন মনে কর, Le Batteux কিংবা Condillac), তিনি কি প্রতিভার সফল দুঃসাহসিকতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন? তিনি তাঁহার সমালোচনায় একটা সঙ্কীর্ণ কঠোর ভাব ধারণ করিবেন না কি?—তিনি এমন একটা যুক্তির অবতারণা করিবেন না কি, যাহা খুব কমই যুক্তিসঙ্গত?—(কেননা, মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাংশ তিনি বুঝিতে অসমর্থ); তিনি এমন একটা অসহিষ্ণুভাব ধারণ করিবেন না কি,—যাহা কলাকে বিশোধিত করিতে গিয়া উহাকে আরও বিকলাঙ্গ ও শুষ্ক করিয়া ফেলে?

পক্ষান্তরে, সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগ্রহণপক্ষে কল্পনাও পর্য্যাপ্ত নহে;—

আরও কিছু আবশ্যক। সেই অনন্ত জীবন্ত কল্পনা,—যাহা সুরুচির একটি প্রধান সহায়,—উহা যখন মনের উপর একাধিপত্য করে, তখন উহা হইতে যে কলা-রুচি প্রসূত হয়, তাহা অতীব অপূর্ণ; এই কলারুচি জ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত না হওয়ায়, তাহার বিচারের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না; তখন সেই কলারুচি খুব উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যকেও ভুল বুঝিতে পারে—অন্ততঃ সে পক্ষে একটা আশঙ্কা থাকিয়া যায়। রচনার একত্ব, সর্ব্বাংশের মধ্যে সামঞ্জস্য, সমস্ত খুঁটিনাটির মধ্যে একটা যথাযথ অনুপাত, তদুৎপন্ন কার্য্যফলসমূহের একটা নিপুণ সম্মিলন, সুনির্ব্বাচন, সংযম, ও সুপরিমাণ,—এই সমস্ত গুণ, সেই প্রকার কলা-রুচি বড় একটা অনুভব করিতে পারেনা, এবং ঐ সকল গুণকে উহাদের যথাস্থানে স্থাপন করিতেও সমর্থ হয় না। কলা-রচনা-প্রসঙ্গে অনেকে শুধু কল্পনাকেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন; কিন্তু উহাই সেই সব রচনার সর্ব্বস্ব নহে। Polyucte, ও Misantheope এই দুইখানি পরমাশ্চর্য্য অতুলনীয় নাটক শুধু কি কল্পনার দ্বারাই রচিত? সাদাসিধা আখ্যান-বস্তুর মধ্যে, নাট্য-কার্য্যের সুবিভক্ত ক্রমবিকাশের মধ্যে, পাত্রদিগের আদ্যোপান্ত চরিত্র-সঙ্গতির মধ্যে, এমন একটা উৎকৃষ্টতর বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ কি দেখা যায় না, যাহা রংফলানো কল্পনা হইতে ভিন্ন—আবেগময়ী ইন্দ্রিয়চেতনা হইতে ভিন্ন?

কল্পনা ও বুদ্ধিবিবেচনা ছাড়া, সুরুচি-বিশিষ্ট ব্যক্তির থাকা চাই—জ্ঞানোজ্জ্বল অনন্ত সৌন্দর্য্যানুরাগ। তিনি যাহার অন্বেষণ করিতেছেন—যাহাকে আহ্বান করিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলে তিনি পরমানন্দ অনুভব করেন। একটা জিনিস সুন্দর নহে—ইহা বুঝিতে পারায় ও প্রদর্শন করায় যে সুখ, তাহা মধ্যমশ্রেণীর সুখ,

—কাজটাও হীন কাজ; কিন্তু একটা সুন্দর জিনিসের মর্ম্মগ্রহণ করা, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা, প্রমাণের দ্বারা তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং অন্যকে নিজের আস্বাদিত ভাবরসের অংশী করা—ইহা একটি মধুরতর সুখ,—কাজটিও অতীব উদার। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া সুখেরও বিষয়, শ্লাঘারও বিষয়। গভীরভাবে সৌন্দর্য্যকে অনুভব করাতেই সুখ, এবং সৌন্দর্য্যকে চিনিতে পারাই শ্লাঘার বিষয়। উদার-হৃদয়ের দ্বারা পরিসেবিত বুদ্ধিবিবেচনাই গুণমুগ্ধতার (admiration) উৎপাদক। এই প্রকার গুণমুগ্ধতা,—অনুদার সমালোচনা, সন্দিগ্ধ সমালোচনা, দুর্ব্বল সমালোচনার বহুউর্দ্ধে অবস্থিত; ইহা তাবৎ মহতী সমালোচনার—ফলবতী সমালোচনার প্রাণ বলিলেও হয়; বলিতে গেলে ইহাই কলা-রুচির দিব্য-অংশ।

যে সুরুচি, সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ, সেই সুরুচির কথা বলিয়া, তাহার পর, সেই প্রতিভার কথা কি বলিব না, যাহা সৌন্দর্য্যকে পুনর্জীবিত করে? প্রতিভা আর কিছুই নহে,—সুরুচি কাজে প্রবৃত্ত হইলেই প্রতিভা হইয়া দাঁড়ায়;—অর্থাৎ সুরুচির নিজস্ব তিনটি শক্তি, চূড়ান্তসীমায় উপনীত হইয়া যখন আর একটি নূতন ও নিগূঢ় শক্তির সহিত সম্মিলিত হয়,—প্রকাশিনী শক্তির সহিত—ব্যঞ্জনী শক্তির সহিত মিলিত হয়, তখনই তাহা প্রতিভারূপে প্রকাশ পায়। আমরা এক্ষণে কলা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। একটু অপেক্ষা কর, এখনই আবার কলার সহচরী প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

বাহ্য পদার্থের মধ্যে সুন্দর।

আমাদের অন্তরে সুন্দর, কি ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আমাদের যে সকল মনোবৃত্তি সুন্দরকে উপলব্ধি করে, সুন্দরের রসগ্রহণ করে, সেই সকল মনোবৃত্তির মধ্যে, ভাবরসের মধ্যে, কল্পনার মধ্যে, কলারুচির মধ্যে, সুন্দর কিরূপ প্রকটিত হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। মদবলম্বিত পদ্ধতির নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা-অনুসারে আমাদের সম্মুখে এক্ষণে আর কতকগুলি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত ;—বাহ্যপদার্থের মধ্যে কোন্‌গুলি সুন্দর ? সুন্দর জিনিসটা স্বরূপতঃ কি ? সুন্দরের প্রকৃতিগত লক্ষণ কি ? সুন্দরের শ্রেণীভেদ কিরূপ ? এক কথায়, সুন্দরের প্রথম ও শেষ মূলতত্ত্বটি কি ? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমি এক্ষণে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। দর্শন, এইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া মনস্তত্ত্বে প্রবেশ করে ; কিন্তু এই পথের শেষ সীমায় বৈধরূপে উপনীত হইতে হইলে, মানুষকে ছাড়িয়া একেবারে পদার্থসমূহের মধ্যে উপনীত হওয়া আবশ্যক।

দর্শনের ইতিহাসে, সুন্দরের প্রকৃতিসম্বন্ধে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির সংখ্যানির্দ্দেশ, কিংবা আলোচনা করিতে আমি ইচ্ছা করি না ; উহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান, শুধু এখানে তাহাদেরই উল্লেখ করিব।

স্থূলধরণের এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, যাহা ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে, মনোমধ্যে একটা সুখজনক ভাবের উদ্রেক করে, তাহাই সুন্দর। এই সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় করিব না। আমি এই

সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বেই খণ্ডন করিয়াছি—আমি দেখাইয়াছি যে, সুন্দরকে সুখদ-তে পরিণত করা অসম্ভব।

ইন্দ্রিয়বাদকে আর একটু জ্ঞানালোকে রঞ্জিত করিয়া কেহ কেহ সুখদায়িতার স্থানে প্রয়োজনীয়তাকে বসাইবার চেষ্টা করেন;—উভয়ের মূলতত্বটি একই, কেবল উহাদের মধ্যে আকারগত প্রভেদ। এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে, কোন সুন্দর পদার্থ, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে শুধু একটা ক্ষণিক সুখজনক ভাব আমাদের মনে উৎপন্ন করে না; পরন্তু ঐপ্রকার ভাব আমাদের মনে পরেও অনেকবার উদ্রেক করে। কিন্তু সৌন্দর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা যে এক নহে তাহা দেখাইবার জন্য সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি, কিংবা তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি আবশ্যক করে না। যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সকল সময়ে সুন্দর নহে; এবং যাহা কিছু সুন্দর, তাহা সকল সময়ে প্রয়োজনীয় নহে; এবং যাহা কিছু সুন্দর ও প্রয়োজনীয় উভয়ই—তাহারও সৌন্দর্য্য, তাহার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছুর উপর নির্ভর করে। তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর, একটা তৌলদণ্ড, কিংবা কপিকল; উহাদের মত কাজের জিনিস্ আর কি আছে? কিন্তু তাই বলিয়া তুমি উহাদিগকে কখনই সুন্দর বলিবে না। তার পর মনে কর, তুমি চমৎকার খোদাইকাজ-করা প্রাচীন গ্রীসদেশীয় একটি কলস দেখিতে পাইলে; এবং দেখিয়াই তুমি তাহাকে সুন্দর বলিলে; কিসে তোমার কাজে লাগিতে পারে, সে বিষয়ের কোন চিন্তাই তোমার মনে উদয় হইল না। সৌসাম্য ও সুশৃঙ্খলাকেও সুন্দর বলা যায়—এবং উহা প্রয়োজনীয়ও বটে; কেন না, উহার দ্বারা পরিসরের সুব্যবস্থা হয়; যে সকল জিনিস সুসমভাবে বিন্যস্ত, উহাদিগকে আবশ্যকমত সহজে পাওয়া যায়; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার উপর সৌসাম্যের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে না; কেন না, ঐ

শ্রেণীর জিনিস দেখিবামাত্র আমরা সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করি, এবং উহার প্রয়োজনীয়তা অনেক পরে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়। কখন কখন এমনও হয়, কোন সুন্দর বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি। অতএব, সৌন্দর্য্য প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক্, সৌন্দর্য্য প্রয়োজনীয়তা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

আর একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন মত এই যে, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের সম্পূর্ণ সঙ্গতি, সম্পূর্ণ মিল, ও সম্পূর্ণ উপযোগিতার উপরেই কোন বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। এইস্থলে সুন্দরকে আর প্রয়োজনীয় বলা যায় না, উহাকে উপযোগী বলা যায়। এই দুইটি ভাবকে পৃথক করা আবশ্যক। মনে কর, একটা কোন যন্ত্র হইতে কতকগুলি সুবিধাজনক ফল উৎপন্ন হয়; যথা—সময়ের সুব্যবস্থা, কার্য্যের সুব্যবস্থা ইত্যাদি; অতএব ইহা প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। অধিকন্তু যদি ঐ যন্ত্রটির সমস্ত গঠন পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারি যে, উহার প্রত্যেক অংশ যথাস্থানে স্থাপিত, এবং উহার সমস্ত অংশ এরূপ নিপুণভাবে বিন্যস্ত যে, তাহা হইতেই ঐ বিশেষ ফলটি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাক্ষাৎ-ভাবে লক্ষ্য না করিয়াও, কতকগুলি উপায়ের দ্বারা যে উহা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে—শুধু এই ভাবটি তখন আমাদের মনে স্থান পায় এবং তখনই উহাকে আমরা উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। এই রূপে আমারা সুন্দরের আরও একটু নিকটে অগ্রসর হই; কেনন তখন আর উহাকে শুধু প্রয়োজনীয়তার হিসাবে দেখি না,—কেমন যথাযথভাবে, কেমন শোভনভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তখন এই ভাবে

দেখি; কিন্তু তখনও আমরা সুন্দরের প্রকৃত লক্ষণে উপনীত হই না। একটা উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন পদার্থ সর্ব্বাংশে সুব্যবস্থিত বলিয়াই উহাকে আমরা সুন্দর বলি না। মনে কর, একটা কেদারা অলঙ্কারহীন, শোভাহীন;—কিন্তু খুব মজবুৎ, উহার অংশগুলা যথাস্থানে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন; এই কেদারায় বেশ নিরাপদে, সচ্ছন্দে ও আরামে বসা যায়;—উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের কিরূপ সম্পূর্ণ মিল, এই কেদারা তাহারই দৃষ্টান্তস্থল; কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে আমরা সুন্দর বলিতে পারি না। যাহাই হউক, এইস্থলে প্রয়োজনীয় ও উপযোগীর মধ্যে প্রভেদ এই,—সুন্দর হইতে হইলে প্রয়োজনীয় না হইলেও চলে; কিন্তু কোন পদার্থ সুন্দর নহে, যাহার উপযোগিতা নাই—অর্থাৎ উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যাহার মিল নাই।

কেহ কেহ সুপরিমাণের মধ্যে সুন্দরকে দেখিতে পান। উহা সৌন্দর্য্যের নিয়ম বটে; কিন্তু উহা অন্যান্য নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম মাত্র। এ কথা ঠিক,—কোনও বেমানান্ জিনিস্ কখনই সুন্দর হইতে পারে না। তাবং সুন্দর পদার্থের মধ্যে জ্যামিতিক আকার অন্ততঃ দূরভাবেও থাকা চাই; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে বৃক্ষটি উর্দ্ধে উঠিয়াছে, যাহার শাখাপ্রশাখা এমন নমনীয়, এমন সুশোভন, যাহার শাখা পল্লব এমন নিবীড়, এমন বিচিত্রবর্ণ,—সুপরিমাণই কি ইহার সৌন্দর্য্যের একমাত্র বিশেষত্ব?

ঝটিকার ভীষণ সৌন্দর্য্য কিসের উপর নির্ভর করে? একটা উৎকৃষ্ট ছবির সৌন্দর্য্য, একটা কবিতা-পদের সৌন্দর্য্য, উচ্চভাবের কোন একটা গীতি-সৌন্দর্য্য,—এই সকল সৌন্দর্য্য কিসের উপর নির্ভর করে?—উহা নিয়ম-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, উহার উপাদানও নিয়ম পরিমাণ নহে; বরং অনেক সময়ে উহা নিয়ম-

বহির্ভূত বলিয়াই চোখে ঠেকে। যে গুণ দেখিয়া আমরা জ্যামিতিক আকারের তারিফ করি, সেই গুণটি অন্যান্য সুন্দর পদার্থের মধ্যেও আছে বলিয়াই যে আমরা তাহাদিগকে সুন্দর বলি—অর্থাৎ সকল অংশের মধ্যে ঠিক্‌ঠাক মিল আছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে সুন্দর বলি—এ কথা নিতান্তই অসঙ্গত।

সুপরিমাণসম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সুশৃঙ্খলাসম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। সুপরিমাণের ন্যায় সুশৃঙ্খলার মধ্যে ততটা গাণিতিক ভাব নাই বটে; কিন্তু তথাপি উহা সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে না;—যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে মুক্তভাব, সচলভাব, গা-ঢালা-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—উহা সেই সকল সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

যে সকল সিদ্ধান্ত সৌন্দর্য্যকে সুশৃঙ্খলার উপর, সৌসামঞ্জস্যের উপর সুপরিমাণের উপর দাঁড় করায়, উহা মূলে সেই একই সিদ্ধান্ত, যাহা সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই একতাকে সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ করে। অবশ্য একতা সুন্দর; উহা সৌন্দর্য্যের একটা বৃহৎ অংশ; কিন্তু উহাই সৌন্দর্য্যের সমস্ত অংশ নহে।

আরও একটি সম্ভবপর সিদ্ধান্ত এই যে, সুন্দর বস্তুর দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী উপাদান আছে; উহা একতা ও বিচিত্রতা;—সাম্য ও বৈষম্য। মনে কর, একটি সুন্দর ফুল। অবশ্য উহাতে একতা আছে, সুশৃঙ্খলা আছে, সুপরিমাণ আছে, এমন কি সৌসাম্য আছে। কেন না, এই সকল গুণ না থাকিলে, সৌন্দর্য্যের মূলে যুক্তির ভিত্তি থাকে না; এই সকল পদার্থ চমৎকার যুক্তির সহিত গঠিত। আবার সেই সঙ্গে কতই বিচিত্রতা! রঙের মধ্যে কত সূক্ষ্ম ভেদ, প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যে কত কারুগিরি! এমন কি

গণিতের মধ্যেও, গণিতের কোন একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব পৃথক্‌রূপে সুন্দর নহে, পরন্তু ঐ তত্ত্বের সঙ্গেসঙ্গে ফল-পরম্পরার যে একটা দীর্ঘ শৃঙ্খল আসিয়া পড়ে তাহাতেই ঐ তত্ত্বটিকে সুন্দর বলিয়া মনে হয়। জীবন ছাড়া কোন সৌন্দর্য্যই নাই; আর জীবন কি?—না চাঞ্চল্য;—উহাই বিচিত্রতা।

সকল শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের প্রতিই সাম্য ও বৈষম্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে একবার দ্রুতভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

প্রথমতঃ দুই প্রকার সুন্দর বস্তু দেখা যায়—এক, যাহাকে খাস সুন্দর বস্তু বলা যায়, আর এক—চিত্তহারী কোন মহান্ বস্তু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই জিনিস সুন্দর যাহার একটা শেষ আছে, যাহা গণ্ডিবদ্ধ, যাহা সীমাবদ্ধ, এবং আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি যাহাকে সহজে ধরিতে পারে; কেননা, উহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা যথাযথ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। এবং সেই বস্তু মহান্ যাহার আকার এত বৃহৎ—(অবশ্য বেমানান্ নহে—বৃহৎ বলিয়া শুধু ধরিতে পারা কঠিন) যে সেই বৃহত্ত্ব আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে।

এ-ত গেল সৌন্দর্য্যের দুইটি সুস্পষ্ট ভেদ। কিন্তু সৌন্দর্য্য অফুরন্ত।

এক্ষণে অষ্টাদশ শতাব্দির খৃষ্টীয় আচার্য্যদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সারবান ও প্রামাণিক লেখক (Bossuet) বস্যুয়ে কি বলেন শুনা যাক্। তিনি তাঁহার "ন্যায়প্রকরণ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান" নামক গ্রন্থে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্যুয়ে তিন গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত, এরূপ বলা যাইতে পারে;

সেণ্ট অগষ্টিন্, সেণ্ট টমাস্, ও দেকার্ত্ত্। নাভারের মহাবিদ্যালয়ে, সেণ্ট টমাস্-প্রচারিত ঈষৎ রূপান্তরিত অ্যারিষ্টলের মতবাদে প্রথম তিনি দীক্ষিত হন, সেই সঙ্গে সেণ্ট অগষ্টিনের রচনাদি পড়িয়াও তাঁহার মন পরিপুষ্ট হয়; এই সব প্রাচীন টুলো-সম্প্রদায়ের মতবাদ ছাড়া সে সময়ে দেকার্ত্তের দর্শনতন্ত্রও খুব প্রসার লাভ করে। তিনি দেকার্ত্তের মতটিই অবলম্বন করেন; এবং সেই সঙ্গে অগষ্টিনের সহিত কতকটা সমন্বয় ও সেণ্ট টমাসের মত কতকটা রক্ষা করিতেও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে নূতন কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি সমস্তই অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সমস্তই মাৰ্জ্জিত আকারে—পরিশোধিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষার যেমন জোর, তেমনি তাঁহার লেখাতেও সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের সম্মুখে অর্পণ করিব এবং তোমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে মালব্রাঁশের লালিত্য অথবা ফেনেলোঁর অফুরন্ত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা একটা ভাল জিনিস পাইবে। সে কি?—না;—সুস্পষ্টতা ও শব্দাদির যথাযথ-প্রয়োগ।

যে প্রকরণের দ্বারা, মূল-ধারণাগুলি হইতে,—সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী তত্ত্বসমূহ হইতে,—ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, ফেনেলোঁ সেই প্রকরণটি ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। বস্যুয়ে বেশ জোরের সহিত ও পূর্ণমাত্রায় সেই প্রকরণটির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও সেই একই মূলতত্ত্বের দোহাই দিতেছি,—সেই মূলতত্ত্ব যাহা হইতে বিষয়ী-পুরুষের কতকগুলি উপাধি—সত্তা-বিশেষের কতকগুলি গুণ আছে বলিয়া সিদ্ধ

হয়; সেই মূলতত্ত্ব হইতে,—নিয়ন্তার মধ্যে কতকগুলি আদি-নিয়ম রহিয়াছে,—সনাতন পুরুষের মধ্যে, কতকগুলি নিত্যতত্ত্ব অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে,—এইরূপ সিদ্ধ হয়। বসুয়ে,—সেণ্ট আগষ্টিন্ হইতে, এমন কি প্লেটো হইতেও বাক্য সকল প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্লেটোর "আইডিয়া" যাহা বাস্তবপক্ষে ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত—তাহাকে স্বতন্ত্র সত্তাবান্ বলিয়া পাছে কেহ অভিহিত করে এই জন্য তিনি গোড়া হইতেই সেই আইডিয়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

ন্যায়-প্রকরণ—প্রথম খণ্ড, ৩৬ পরিচ্ছেদ · "যখন আমরা বলি, ঋজুভুজ-ত্রিকোণ এমন-একটা আকার যাহা তিনটি ঋজু ভুজের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং যাহার তিনটি কোণ উহার দুই ঋজু ভুজের সমান—কিছুমাত্র কমও নহে, বেশীও নহে; ইহার পরেই যখন তিন ভুজবিশিষ্ট ও তিন সমান কোণ-বিশিষ্ট সমভুজ-ত্রিকোণের আলোচনা করি—তখন উহা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে উক্ত ত্রিকোণের প্রত্যেক কোণ—একটি ঋজু কোণের কম। আবার যখন একটি ঋজু কোণ আলোচনা করিয়া দেখি, পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণাগুলির সহিত সংযুক্ত এই ঋজু কোণের ধারণার মধ্যে ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, এই ত্রিকোণের দুই কোণ অগত্যা তীক্ষ্ণমুখী এবং এই দুই কোণ ঠিক একটি ঋজু কোণের সমান,—বেশীও নহে, কমও, নহে; এই ধারণাটির মধ্যে কিছুই আগন্তুক নহে, পরিবর্ত্তনশীল নহে; অতএব এই ধারণাগুলি নিত্যতত্ত্ব সমূহেরই প্রতিরূপ। এরূপ সম-ভুজ অথবা ঋজু-কোণ ত্রিকোণ,

প্রকৃতি-রাজ্যে যদি নাও থাকে, তথাপি আমরা যে সকল তত্ত্ব এইমাত্র আলোচনা করিলাম, তাহা সত্য ও সংশয়-বিরহিত। ফলত, আমি এক টা সমভুজ অথবা ঋজু কোণ ত্রিকোণ কখন দেখিয়াছি কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। মানুষের হাত যতই কেন নিপুণ হউক না, কম্‌পাস কিম্বা রুলের দ্বারা এমন কোন রেখা টানা যাইতে পারে না যাহা একেবারে ঋজু; কিম্বা ভুজগুলি ও কোণ-গুলি এরূপ হইতে পারে না যাহা সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সহিত সমান। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা চোখে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের আঁকা রেখাগুলি ঠিক্ ঋজুও নহে, ঠিক্ ধারাবাহিকও নহে—সুতরাং ঠিক্ সমান নহে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা সমভুজ ও ঋজু কোণবিশিষ্ট ত্রিকোণের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ মাত্র; তাই আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে ঐরূপ ত্রিকোণ প্রকৃতি রাজ্যে আছে কিংবা মানুষের হাতে রচিত হইতে পারে।

ইহা সত্বেও, ত্রিকোণের যে প্রকৃতি ও গুণসকল আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিরপেক্ষভাবেই সত্য ও সংশয়রহিত;—তাহার প্রমাণের জন্য জগতে-বিদ্যমান কোন বাস্তব ত্রিকোণের অপেক্ষা রাখে না। সকল কালেই এই তত্ত্বগুলি বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, সুতরাং ইহা নিত্য সত্য। তা ছাড়া, যেহেতু মানব-বুদ্ধি সত্যকে উৎপাদন করে না, পরন্তু সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য তাহার দিকে শুধু মুখ ফিরাইয়া থাকে;—অতএব সমস্ত সৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি যদি ধ্বংস হইয়াও যায়, তবু এই সকল সত্য অপরিবর্ত্তিতভাবেই অবস্থিতি করিবে।”

* * * *

২৭ পরিচ্ছেদ। “যেহেতু, ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নিত্য নহে, ধ্রুব নহে, স্বতন্ত্র নহে,—অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে,

এই সব সত্য আপনাদের মধ্যে অবস্থিতি করে না, কেবল ঈশ্বরেতেই অবস্থিতি করে; সেই সব নিত্য তত্ত্ব চিৎ-সত্তার মধ্যেই অবস্থিতি করে,—যাহা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

"আমাদের প্রস্তাবিত এই সকল নিত্য সত্যগুলিকে আরো প্রকৃত সত্যরূপে দাঁড় করাইবার জন্য, কেহ কেহ এইরূপ কল্পনা করেন যে, ঈশ্বরের বাহিরে কতকগুলি নিত্য সারসত্তা আছে। ইহা একটা নিছক্ ভ্রান্তি। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে ঈশ্বরই সকল সত্তার মূল; তাঁহারই জ্ঞানশক্তি হইতে বিবিধ সত্তা উৎপন্ন হয়; তাঁহারই জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বাদিম চিৎ-কল্পনাগুলি অবস্থিতি করে—অথবা সেণ্ট অগষ্টিন যেরূপ বলেন,—নিত্য বস্তু-সমূহের হেতুগুলি অবস্থিতি করে।"

"এইরূপ, বাস্তুশিল্পীর মানসপটেও একটা বাড়ীর কল্পনা অঙ্কিত থাকে; সেই বাড়ীটি শিল্পী আপনার অন্তরেই দেখিতে পায়; এই আভ্যন্তরিক আদর্শের নকলে নির্ম্মিত বাড়ীগুলা ধ্বংস হইয়া গেলেও, তাঁহার সেই মানসী অট্টালিকা ধ্বংস হয় না; এবং যদি এই শিল্পী নিত্যপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার বাড়ীর কল্পনা ও হেতুটিও নিত্য হইবে। মর্ত্ত্য শিল্পীর কথা ছাড়িয়া দিয়া অমর শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার কথা ধর; সেই বিশ্বকর্ম্মা ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় ধ্যানের মধ্যে একটা আদিম পরা-শিল্পকলার আদর্শ চিরবিগ্মমান;—উহাই সকল পরিমাণের, সকল নিয়মের সকল সুষমার, সকল যুক্তির, সকল সত্যের মূলপ্রস্রবণ। এই সব নিত্যকালের সত্য যাহা আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়,—ইহা বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; যাহাতে আমরা বাস্তবিক পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারি, এইজন্য প্লেটো সেই সব আইডিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; সেই

সব আইডিয়া—যাহা গঠিত হয় না, যাহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে; যাহা জন্মায় না, যাহা কলুষিত হয় না, যাহা আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, আবার আপনিই লয় হয়—যাহা নিত্যকাল বিদ্যমান। প্লেটো বলেন, ইহাই সেই মানস-জগৎ, যাহা সৃষ্টজগতের পূর্ব্বে বিধাতার চিদাকাশে অবস্থিতি করে, এবং উহাই সেই অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ যাহার নকল এই মহতী বিশ্ব-রচনা। সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য, প্লেটো আমাদিগকে এই সব নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, জন্ম-জরার অতীত "আইডিয়ার" নিকট যাইতে বলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন এই আইডিয়াগুলি, ঐশ্বরিক আইডিয়ারই প্রতিরূপ,—তাঁহা হইতেই সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন, উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া আইসে না; ইন্দ্রিয় উহাদিগকে আমাদিগের চিত্তে প্রকাশ করে মাত্র,—গড়িয়া তোলে না। কেন না, আমরা কোন নিত্যবস্তু প্রত্যক্ষ দেখি নাই অথচ নিত্যবস্তুর ধারণা আমাদের মনে স্পষ্ট রহিয়াছে—অর্থাৎ চিরকাল সমান রহিয়াছে; পূর্ণ ত্রিকোণ আমরা কখন দেখি নাই, অথচ স্পষ্টরূপ উহা বুঝিতে পারি, সংশয়রহিত বিবিধ তত্ত্বের দ্বারা উহা আমরা সিদ্ধ করি। এই সকল কিসের নিদর্শন? প্লেটো বলেন, এই সমস্ত আইডিয়া যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া আইসে না—ইহা তাহারই নিদর্শন।"

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে,—বর্ণ, ধ্বনি, আকার, গতি এই সমস্তই সৌন্দর্য্যরস উদ্বোধনে সমর্থ। সকারণেই হউক, অকারণেই হউক—এই জাতীয় সৌন্দর্য্য, ভৌতিক-সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে যদি আমরা আধ্যাত্মিক জগতে, সত্যের জগতে, বিজ্ঞানের জগতে আরোহণ করি, সেখানে অপেক্ষাকৃত একটু

কঠোর ভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব, যদিও সে সৌন্দর্য্য বাস্তবতায় কিছুমাত্র ন্যূন নহে। যে সকল সার্ব্বভৌমিক নিয়মে জড়পিণ্ডসমূহ নিয়মিত হয়, যে সকল নিয়মে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন জীবসমূহ পরিশাসিত হয়, সুদীর্ঘ সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সকল মূলসূত্র বিদ্যমান, এবং যে সকল মূলসূত্র হইতে সিদ্ধান্তসমূহ উৎপন্ন হয়,—গুণী, কবি, ও দর্শনবেত্তার যে প্রতিভা নূতন-জিনিসের সৃষ্টি করে,—তৎসমস্তই সুন্দর, প্রকৃতির মতই সুন্দর। ইহাকে মানসিক সৌন্দর্য্য বলে।

পরিশেষে, যদি আমরা নৈতিক-জগৎ ও উহার নিয়মাদির আলোচনা করি,—স্বাধীনতা, সাধুতা, সেবানিষ্ঠার আলোচনা করি,—অ্যারিস্টাইডিসের ন্যায়পরতা, লিওনিডাসের বীরত্ব, দান-বীর ও ও স্বদেশনিষ্ঠ মহাত্মাদিগের কথা আলোচনা করি—এই সমস্তের মধ্যে আমরা তৃতীয় জাতীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি; এই সৌন্দর্য্য অপর দুই জাতীয় সৌন্দর্য্যকেও অতিক্রম করে; ইহা নৈতিক সৌন্দর্য্য।

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই সমস্তের মধ্যেও সুন্দর ও মহানের ভেদ আছে। অতএব, কি প্রকৃতি-রাজ্যে, কি মনো-রাজ্যে, কি জ্ঞানে, কি ভাবে, কি কার্য্যে, সুন্দর ও মহান সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যের মধ্যে কি অসীম বৈচিত্র্য!

এই সমস্ত ভেদ নির্ণয় করিবার পর, উহাদের সংখ্যা কি আমরা কমাইয়া আনিতে পারি না? এই সমস্ত বৈষম্য অকাট্য হইলেও উহার মধ্যে কি সাম্য নাই, একটি মূল সৌন্দর্য্য নাই—এই বিশেষ-বিশেষ সৌন্দর্য্য যাহার ছায়া, যাহার আভা, যাহার উচ্চনীচ ধাপ মাত্র?

Plotin তাঁহার "সুন্দর"-সম্বন্ধীয় সন্দর্ভে, এই প্রশ্নটিই উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন:—সুন্দর

জিনিস্‌টা স্বরূপতঃ কি? এই আকারটি সুন্দর, কিংবা ঐ আকারটি সুন্দর,—এই কার্য্যটি সুন্দর, কিংবা ঐ কার্য্যটি সুন্দর বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি; কিন্তু বিভিন্ন হইয়া এই দুই পদার্থই কি করিয়া সুন্দর হইল? এ দুয়ের মধ্যে সাধারণ গুণটি কি যাহার দরুণ উভয়ই সুন্দর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে?

এই প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে, সৌন্দর্য্যের সমস্যাটি আমাদের নিকট গোলকধাঁধার মত থাকিয়া যায়—উহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বস্তুর একই নাম দেওয়া হইতেছে, অথচ যাহার বলে উহাদিগকে একই নামে অভিহিত করা হয় সেই বাস্তবিক ঐক্যস্থলটি কোথায় তাহা আমরা অবগত নহি।

অথবা, সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সকল বৈষম্য আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি সে এরূপ বৈষম্য যে তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার যোগ-সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব; অথবা এই সকল বৈষম্য শুধু বাহ্যিক, উহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব—একটা একতার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন এই একতা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, তাহা হইলে এ কথাও বলিতে হয় যে, ভৌতিক সৌন্দর্য্য, মানসিক সৌন্দর্য্য, ও নৈতিক সৌন্দর্য্য—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। তাহা হইলে, কলা-গুণী কিরূপে কাজ করিবেন?* তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে—কিন্তু তাহার মধ্য হইতে একটিমাত্র রচনার বিষয় তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইবে; কেন না, ইহাই কলাশাস্ত্রের নিয়ম। এই নিয়মটি যদি কৃত্রিম হয়, যদি প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক সৌন্দর্য্যই স্বরূপত বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে কলাশাস্ত্র আমাদিগকে ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহার কথা সর্ব্বৈব

মিথ্যা। কিরূপে একটা মিথ্যা কথা শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম হইল, আমি তাহা জানিতে চাই। তাহা হইতেই পারে না। শিল্পকলার মধ্যে এই যে একটি একতার ভাব পরিব্যক্ত হয়, ইহার একটু আভাস প্রকৃতির মধ্যে না পাইলে, কলা-গুণীরা কখনই উহা তাঁহাদের রচনার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

সুন্দর ও মহানের ভেদ এবং অন্যান্য ভেদ যাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই সকল ভেদ আমি প্রত্যাহার করিতেছি না; কিন্তু সেই সকল ভেদের মধ্যে কিরূপে একটা মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক। এই সকল ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে। একতা ও বিচিত্রতা যেমন সত্যের তেমনি সৌন্দর্য্যেরও একটা প্রধান নিয়ম। সমস্তই এক ও সমস্তই বিচিত্র। আমরা সৌন্দর্য্যকে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ভৌতিক সৌন্দর্য্য, মানসিক সৌন্দর্য্য, ও নৈতিক সৌন্দর্য্য। এক্ষণে এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঐক্যস্থল কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এই তিন সৌন্দর্য্য আসলে একই এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যেরই অন্তর্গত। এই মতটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সপ্রমাণ করা যাউক।

যাহাকে বেল্‌ভেডিয়ারের অ্যাপলো বলে, সেই অ্যাপোলো-মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া একবার দাঁড়াও, এবং সেই উৎকৃষ্ট কলারচনার মধ্যে কোন্ অংশটি বিশেষরূপে তোমার নেত্রকে আকর্ষণ করে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। যিনি দার্শনিক নহেন, যিনি শুধু একজন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, কোন বিশেষ পদ্ধতির পক্ষপাতী না হইয়াও কলা-সম্বন্ধে যাঁহার সুরুচি ছিল, সেই Winkleman এই প্রসিদ্ধ Apollo মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা অতীব কৌতূ-

হলজনক। ঐ সুন্দর মূর্ত্তিটিতে অমর যৌবনশ্রী যেন ফুটিয়া রহিয়াছে, সচরাচর মানব-শরীর অপেক্ষা একটু অধিক উচ্চ, তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে রাজমহিমা পরিব্যক্ত—এই সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে যে দেবত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে Winkleman সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ ললাট দেবতারই উপযুক্ত, উহাতে অচলা শান্তি বিরাজমান। আর একটু অধোভাগে মানবত্বের লক্ষণ আবার দেখা দিয়াছে ; এবং এইরূপ মানবীয় লক্ষণ থাকাতেই এই সকল কলা-রচনার প্রতি মানব-চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টিতে তৃপ্তির ভাব, নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত, নীচের ঠোঁট একটু তোলা ;—এই সমস্ত লক্ষণে বিজয়গর্ব্ব এবং বিজয়সাধনের শ্রান্তি প্রকাশ পাইতেছে। এই সমালোচকের প্রত্যেক কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ ; দেখিবে তাহাতে একটা নৈতিক ভাবের ছাপ পড়িয়াছে। এই পুরাতত্ত্ব পণ্ডিত এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহার তত্ত্ববিশ্লেষণ ক্রমে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য-ভক্তের ভক্তি-বন্দনায় পরিণত হইয়াছে।

প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, এখন একজন আসল মানুষকে—একজন জীবন্ত মানুষকে নিরীক্ষণ কর। মনে কর কোনব্যক্তি সুখসম্পদের নিকট কর্ত্তব্যকেবলিদান দিবার জন্য—বলবৎ প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও—বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া নীচ স্বার্থের উপর জয়লাভ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের জন্য সুখসম্পদকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যখন তিনি এই মহৎ সঙ্কল্পটি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যদি তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার মূর্ত্তিটি তোমার নিকট নিশ্চয়ই অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কেননা, সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার আত্মার সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত। হয়ত আর কোন অবস্থায় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মানব-মূর্ত্তির মতই মনে

হইত—এমন কি, তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত; কিন্তু এইস্থলে, আত্মার আলোকে আলোকিত হওয়ায় উহা হইতে একটা স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে। এইরূপ' সক্রেটিসের স্বাভাবিক আকৃতির সহিত গ্রীক-সৌন্দর্য্যের আদর্শ-মূর্ত্তির তুলনা করিয়া দেখ,—উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ; মৃত্যুশয্যায় শয়ান সক্রেটিস্‌কে দেখ—যখন তিনি বিষ পান করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সহিত আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন—তাঁহার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিশ্চয়ই তুমি মুগ্ধ হইতে।

মৃত্যুকালে সক্রেটিস্, নৈতিক মাহাত্ম্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তোমার নেত্রসমক্ষে শুধু তাঁহার মৃত কলেবরটি রহিয়াছে। যতক্ষণ তাঁহার মৃতদেহে আত্মার কিছু চিহ্ন ছিল, ততক্ষণই উহাতে সৌন্দর্য্য ও রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমশ যখন সেই ভাবটি চলিয়া গেল, তখন সেই দেহ আবার পূর্ব্ববৎ গ্রাম্য ও কুৎসিৎ হইয়া পড়িল। মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডলে হয় বীভৎস ভাব, নয় স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়।

আত্মা যখন ভৌতিক দেহকে আর ধরিয়া রাখে না, যখন দেহ হইতে পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তখনই সেই মৃতদেহ কুৎসিৎ আকার ধারণ করে; যখন উহা আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে, তখনই উহা স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে।

মানুষের মূর্ত্তি একবার আলোচনা করিয়া দেখ; ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মূর্ত্তি সুন্দর, আবার সমস্ত নির্জীব পদার্থ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি সুন্দর। তাহার কারণ, ধর্ম্ম ও প্রতিভার অসদ্ভাব হইলেও, মনুষ্য-মূর্ত্তিতে জ্ঞান ও নীতির ভাব নিয়ত প্রকাশ পায়; ইতর প্রাণীর মূর্ত্তিতে অন্ততঃ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পায়;

এবং পূর্ণমাত্রায় না হউক অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আত্মার ভাব প্রকাশ পায়। যদি আমরা প্রাণীজগৎ হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভৌতিক জগতে অবতরণ করি,—যতক্ষণ তাহাতে আমরা জ্ঞানের লেশমাত্র ছায়া উপলব্ধি করি, যতক্ষণ উহা আমাদের মনে কি-জানি-কেন কোন প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদ্রেক করে, ততক্ষণই তাহাতে আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। যদি কোন জড়পদার্থ, কোন প্রকার ভাব কিংবা ভাবার্থ প্রকাশ না করে, তখন আর তাহাতে আমরা কোন সৌন্দর্য দেখিতে পাই না। কিন্তু সত্তা মাত্রই সজীব। ভৌতিক পদার্থ্য মূক হইলেও অভৌতিক শক্তিসমূহে তাহা ওতপ্রোত; এবং উহা যে সকল নিয়মের অধীন তাহা সর্ব্বত্র-বিদ্যমান জ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। মৃত জড় পদার্থে, সূক্ষ্মতম রাসায়নিক বিশ্লেষণ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যাহারই কোন প্রকার দেহযন্ত্র আছে, এবং যে-কোন পদার্থ শক্তি হইতে বঞ্চিত নহে, তাহাতেই ঐরূপ বিশ্লেষণক্রিয়া সম্ভব। কি গভীর সাগর-গর্ভে, কি উচ্চ আকাশ-তলে, কি বালুকণার মধ্যে, কি প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শিখরে,—উহাদের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া, ভূমা-আত্মার অমৃত কিরণ সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইতেছে। চর্ম্ম-চক্ষুর ন্যায় আত্মার চক্ষু দিয়া প্রকৃতি-রাজ্যকে দর্শন কর,—সর্ব্বত্রই নৈতিক ভাব তোমার চোখে পড়িবে, এবং প্রত্যেক পদার্থের রূপ আমাদের চিন্তারই প্রতিরূপ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কি মনুষ্য-মূর্ত্তি, কি ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি, ভাবের প্রকাশেই উহাকে সুন্দর দেখায়। কিন্তু যখন তুমি উত্তুঙ্গ হিমালয়-শিখরে আরোহণ কর, যখন তুমি সূর্য্যোর উদয়াস্ত, আলোকের জন্ম মৃত্যু নিরীক্ষণ কর—এই সমস্ত আশ্চর্য্য গভীর দৃশ্য তোমার উপর কি কোন নৈতিক প্রভাব প্রকটিত করে না? এই সকল মহান দৃশ্য অবশ্যই কোন এক

পরাশক্তির অভিব্যক্তি, পরমাশ্চর্য্য পরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি—এইরূপ কি তোমার মনে হয় না? এবং তখন মানুষের মুখের মত, প্রকৃতির মুখেও কি তুমি এক প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাও না?

কোন আকৃতিই একক থাকিতে পারে না, উহা কোন-না-কোন পদার্থেরই আকৃতি। অতএব ভৌতিক সৌন্দর্য্য কোন এক আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরই নিদর্শন। উহাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য; এবং উহাই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি, সৌন্দর্য্যের মূল-তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যের ঐক্য-সূত্র।

আমরা সৌন্দর্য্যের যত প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমস্তই বাস্তব সৌন্দর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাস্তব সৌন্দর্য্যের উপরে আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে—সেটি মনোগত আদর্শ-সৌন্দর্য্য। এই আদর্শ-সৌন্দর্য্য, কোন ব্যক্তি বিশেষে কিংবা ব্যক্তিসমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে না। এইরূপ সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে আনিবার জন্য, বাহ্যপ্রকৃতি কিংবা আমাদের বহুদর্শিতা শুধু এক-একটা উপলক্ষ যোগাইয়া দেয় মাত্র; কিন্তু আসলে এই সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর। এই প্রকার সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে একবার প্রকাশ পাইলে, কোন প্রাকৃতিক মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন,—উহা ঐ পরম সৌন্দর্য্যেরই একটা নকল বলিয়া মনে হয়; উহা কিছুতেই ঐ সৌন্দর্য্যের সমান হইতে পারে না। কোন একটা সুন্দর কাজের কথা আমার নিকট বল—আমি উহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কাজ মনে কল্পনা করিতে পারি। এমন যে অ্যাপলো মূর্ত্তি তাহারও অনেক দোষদর্শী সমালোচক আছে। আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হও, আদর্শটি ততই যেন পিছাইয়া যায়। আদর্শ-সৌন্দর্য্যের চরম অংশটি অনন্তের মধ্যে—অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত; কিংবা আরও

ভাল করিয়া বলিতে গেলে—সেই ধ্রুব আদর্শটি, পূর্ণ আদর্শটি, স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যেহেতু ঈশ্বর সকল পদার্থেরই মূলতত্ত্ব, অতএব সেই অধিকার-সূত্রে তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যেরও মূলতত্ত্ব; সুতরাং ন্যূনাধিক অপূর্ণ-ভাবে যে কোন পদার্থেই সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও তিনি মূলতত্ত্ব; তিনি যেমন ভৌতিক জগতের স্রষ্টা, মানসিক-জগৎ ও নৈতিক-জগতের পিতা, তেমনি তিনি সকল সৌন্দর্য্যের মূলাধার।

গতি, আকার, ধ্বনি, বর্ণ প্রভৃতির বিচিত্র সম্মিলন ও সুমিশ্রনে এই দৃশ্যমান জগতে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা এত মুগ্ধ হই;—আর এই সুব্যবস্থিত বিরাট দৃশ্যের পশ্চাতে, যে নিয়ন্তা, যে বিধাতা, যে বিশ্বকর্ম্মা মহাশিল্পী রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি আমরা উপলব্ধি করিব না?

ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই এক প্রকার আচ্ছাদন।

এই সত্য-জ্যোতি, এই মানসিক সৌন্দর্য্য,—ইহার মূলতত্ত্বটি কি? সকল সত্যের যে মূলতত্ত্ব, ইহারও সেই মূলতত্ত্ব।

নৈতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, দুইটি স্বতন্ত্র উপাদান বিদ্যমান,—উভয়ই সুন্দর, কিন্তু বিভিন্নভাবে সুন্দর। যথা:—ন্যায়পরতা ও উদারতা, প্রেম ও ভক্তি। যে ব্যক্তি স্বকীয় আচরণে ন্যায়পরতা ও উদারতা প্রকাশ করে, তাহার সম্পাদিত কার্য্য যার পর নাই সুন্দর। কিন্তু যিনি ন্যায়ের মূলাধার, প্রেমের অফুরন্ত উৎস, তাঁহার সৌন্দর্য্য কি বলিয়া বর্ণনা করিবে? আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যদি সুন্দর হয়, যিনি এই নৈতিক প্রকৃতির স্রষ্টা তিনি কত না সুন্দর! তাঁহার ন্যায়, তাঁহার করুণা, আমাদের অন্তরে, আমাদের

বাহিরে,—সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তাঁহার ন্যায়ব্যবস্থাই জগতের এই নৈতিক ব্যবস্থা; কোন মানব-বিধি তাহা রচনা করে নাই; প্রত্যুত মনুষ্য-রচিত বিধি-ব্যবস্থাদি চিরকাল সেই ন্যায়কেই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; এবং সেই ন্যায় নিজ-বলেই এতাবৎকাল এই জগতে সংরক্ষিত হইয়াছে, স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। নিজের অন্তরে যদি অবতরণ করি, আমাদের অন্তরাত্মাই সাক্ষ্য দিবে যে, ধর্ম্মের সহচর যে শান্তি ও সন্তোষ—তাহার মধ্যে ঐশ্বরিক ন্যায়ই বিরাজমান; হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, পাপের অপরিহার্য্য কঠোর শাস্তিই প্রকাশ পায়। আমাদের প্রতি মঙ্গলময় বিধাতার কত করুণা, কত স্নেহযত্ন তাহার পরিচয় আমরা প্রতিপদে প্রাপ্ত হইতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তই তাহা অভিনব জলন্ত বাক্যে ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার মঙ্গলভাব,—কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ,—প্রকৃতির সকল ঘটনার মধ্যেই দেদীপ্যমান। ঐ সকল ঘটনা আমাদের নিকট অতিপরিচিত বলিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উহা আমাদের বিস্ময়মিশ্র কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করে, এবং জীবের প্রতি যাঁহার অসীম প্রেম সেই প্রেমময় পরম দেবের মহিমা ঘোষণা করে।

এইরূপে, আমরা যে তিন শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছি, ঈশ্বর সেই তিনি শ্রেণীয় সৌন্দর্য্যের,—অর্থাৎ ভৌতিক, মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।

আবার এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রকার রূপ বিদ্যমান—অর্থাৎ সুন্দর ও মহান্—তাহা তাঁহাতেই আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঈশ্বরই পরম সুন্দর; কেননা, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিকে - জ্ঞান, কল্পনা ও হৃদয়কে তিনি তিন

আর কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? তিনিই আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম ধারণা—যাহার পর আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই। তিনিই আমাদের কল্পনার আত্মহারা ধ্যান, তিনিই আমাদের হৃদয়ের পরম প্রেমাস্পদ। অতএব তিনিই পূর্ণরূপে সুন্দর। তিনি যেরূপ সুন্দর, সেইরূপ কি তিনি মহান্‌ও নহেন? স্বকীয় অসীম মহিমার দ্বারা তিনি যেমন একদিকে আমাদের চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করিতেছেন, তেমনি আবার তাঁহার অতলস্পর্শ মহিমার মধ্যে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছেন। তাঁহার করুণা-রশ্মি যেমন আমাদের হৃদয়পদ্মকে প্রস্ফুটিত করে, তেমনি তাঁর কঠোর ন্যায় কি আমাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করে না? ঈশ্বরের স্বরূপে প্রসন্ন ও রুদ্রভাব উভয়ই বিদ্যমান। ঈশ্বর যেমন একদিকে মধুর, তেমনি আবার তিনি ভীষণ। একদিকে যেমন তিনি এই দৃশ্যমান সসীম জগতের জীবন, আলোক, গতি ও অক্ষয় শোভা, তেমনি আবার তিনি অনাদি, অদৃশ্য, অসীম অনন্ত, পরিপূর্ণ অদ্বৈত ও সত্তার সত্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঈশ্বরের এই ভীষণ উপাধিগুলি যাহা পূর্ব্বোল্লিখিত উপাধিরই মত সুনিশ্চিত—উহা কি আমাদের কল্পনায় একপ্রকার বিষাদের ভাব উৎপাদন করে না—যাহা ভীষণ-গম্ভীর দৃশ্য দর্শনে আমাদের মনে নিয়ত উত্তেজিত হইয়া থাকে? ঈশ্বর, আমাদের নিকট সুন্দর ও মহান্‌; এই দুই প্রকার সৌন্দর্য্য-রূপেরই তিনি যেমন একদিকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা, তেমনি আবার সকল প্রহেলিকার তিনিই সুস্পষ্ট সমস্যা। আমরা সীমাবদ্ধ জীব,—আমরা অসীমকে যেমন বুঝিতে পারি না, তেমনি আবার অসীমকে ছাড়িয়াও কিছুরই সমীচীন ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের যে সত্তা আছে, সেই

সত্তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সেই অসীম সত্তার কতকটা আভাস পাই ; আমাদের মধ্যে যে অসত্তা বিদ্যমান, সেই অসত্তার দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে বিলীন হই। এইরূপে, কোন কিছুর ব্যাখ্যা করিতে হইলেই নিয়ত তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয় ; এবং তাঁহার অনন্ততার ভারে প্রপীড়িত হইয়া যখন আবার আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসি, তখন—যিনি আমাদিগকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে অভিভূত করিতেছেন, সেই ঈশ্বরের প্রতি আমরা পর্য্যায়ক্রমে, অথবা যুগপৎ, একটা অদম্য আকর্ষণের ভাব, বিস্ময়ের ভাব, দুরতিক্রম্য ভীতির ভাব অনুভব করি, যাহা একমাত্র তিনিই উৎপাদন করেন এবং যাহা তিনিই প্রশমিত করিতে পারেন ; কেন না একমাত্র তিনিই ভীষণ ও সুন্দরের ঐক্যস্থল।

এইরূপে সেই পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরই,—পূর্ণ একত্ব ও অসীম বৈচিত্র্যের সমবায় ; সুতরাং তিনিই সমস্ত সৌন্দর্য্যের চরম হেতু, চরম ভিত্তি, চরম আদর্শ। Diotime এই চিরন্তন সৌন্দর্য্যেরই একটু আভাস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার "Le Banquet" নামক সন্দর্ভে সক্রেটিসের নিকট সেই সৌন্দর্য্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

"সেই অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য্য, অজাত অবিনশ্বর সৌন্দর্য্য, যাহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই ; যাহার এক অংশ সুন্দর ও অপরাংশ কুৎসিৎ—এরূপ নহে ; শুধু অমুক সময়ে সুন্দর, অমুক স্থানে সুন্দর, অমুক সম্বন্ধে সুন্দর, এরূপও নহে ; যে সৌন্দর্য্যের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ নাই,—মুখ নাই, হস্ত নাই, শারীরিক কিছুই নাই ; অথবা যাহা অমুক চিন্তাও নহে, অমুক বিশেষ বিজ্ঞানও নহে, আপনা হইতে ভিন্ন অন্য কোন সত্তার মধ্যেও যাহা অবস্থিতি করে না ; যাহা কোন জীব,

কিংবা পৃথিবী, কিংবা আকাশ কিংবা অন্য কোন বস্তু নহে; যাহা সম্পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যবিশিষ্ট, যাহা আত্মবিকারশূন্য, অন্য সকল সৌন্দর্য্য যাহার অংশ মাত্র; যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, কোন পরিবর্ত্তন নাই।

এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে হইলে, এই মর্ত্ত্যলোকের সৌন্দর্য্য হইতে আরম্ভ করিতে হয়; এবং সেই পরম সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত আরোহণ করিতে হয়, যাত্রাকালে সোপানের সমস্ত ধাপগুলা মাড়াইয়া যাইতে হয়;—একটা সুন্দর দেহ হইতে দুইটি সুন্দর দেহে, দুইটি সুন্দর দেহ হইতে, অন্য সমস্তসুন্দর দেহে; সুন্দর দেহ হইতে, সুন্দর ভাবে; সুন্দর ভাব হইতে সুন্দর জ্ঞানে, এইরূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে আসিয়া, পরে সেই পরম জ্ঞানে আমরা উপনীত হই,—যে জ্ঞানের বিষয়,—সুন্দর স্বরূপ স্বয়ং। এইরূপে অবশেষে আমরা সুন্দরকে স্বরূপতঃ জানিতে সমর্থ হই।”

“মাতিনের বিদেশী আরও এইরূপ বলিতে লাগিলেন:—প্রিয় সখা সক্রেটিস, সেই অনাদি সৌন্দর্য্যের দর্শনেই জীবন সার্থক হয় .. যে ব্যক্তি অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যকে, সরল সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছে—যে সৌন্দর্য্য নর-মাংসে, নরবর্ণে আচ্ছাদিত নহে, যাহা নশ্বর উপাদানে গঠিত নহে,—সেই অদ্বৈত সৌন্দর্য্যের, সেই ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের যে সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছে, তাহার কি সৌভাগ্য!—সেই ধন্য! সেই ধন্য!”

তৃতীয় উপদেশ।

শিল্পকলা।

প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে সুন্দরকে শুধু জানা ও ভালবাসাই মানুষের একমাত্র কাজ নহে; মানুষ উহাকে পুনরুৎপাদন করিতেও পারে। ভৌতিক কিংবা নৈতিক যে প্রকারেরই হউক না কেন, কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র মানুষ তাহা অনুভব করে, তাহাতে মুগ্ধ হয়, সৌন্দর্য্যরসে আপ্লুত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি প্রবল হইলে, উহা বেশীক্ষণ নিষ্ফল থাকে না। যাহা হইতে আমরা একটা তীব্রতর সুখ অনুভব করি তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, পুনর্ব্বার অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়; যে সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে আমাদের প্রবল আকাঙ্খা হয়; সে যেমনটি ঠিক্ তাহাই নহে, পরন্তু আমাদের কল্পনা তাহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে সেইভাবেই তাহাকে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইতেই মানুষের নিজস্ব মৌলিক রচনার উৎপত্তি—শিল্পকলার উৎপত্তি। সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা এবং এই পুররুৎপাদনের শক্তিকেই প্রতিভা বলে।

সৌন্দর্য্যের এই পুনরুৎপাদনের জন্য কোন্ কোন্ মনোবৃত্তির প্রয়োজন? সৌন্দর্য্যকে চিনিবার জন্য, অনুভব করিবার জন্য যে যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন ইহাতেও সেই সব মনোবৃত্তির প্রয়োজন। কলারুচি চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইলেই প্রতিভা হইয়া দাঁড়ায়,—

শুধু যদি তাহাতে আর একটি উপাদান সংযোজিত হয়। সে উপাদানটি কি?

মনের সেই মিশ্র বৃত্তি—যাহাকে রুচি বলে—তাহাতে তিনটি মনোবৃত্তির সমাবেশ আছে:—কল্পনা, রসবোধ, বুদ্ধি-বিবেচনা।

প্রতিভার স্ফূর্তির পক্ষে এই তিনটি মনোবৃত্তি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। প্রতিভা, সৃজনী-শক্তিরই উপাধি; উহাই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ। কলা-রুচি অনুভব করে, বিচার করে, তর্ক বিতর্ক করে, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু উদ্ভাবন করে না। প্রতিভা উদ্ভাবক, ও স্রষ্টা। প্রতিভাবান পুরুষের মধ্যে যে শক্তি অবস্থিত, প্রতিভাবান পুরুষ সেই শক্তির প্রভু নহেন। তিনি যাহা অন্তরে অনুভব করেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার যে দুর্দ্দমনীয় জ্বলন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্খা উপস্থিত হয় তাহাই তাঁহাকে প্রতিভাবান করিয়া তোলে। যে সকল ভাব, যে সকল কল্পনা, যে সকল চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করে, তাহার দরুণ তিনি কষ্ট অনুভব করেন। লোকে বলে গুণীলোক মাত্রেরই একটু ছিট্ আছে, কিন্তু এ 'ছিট্' জ্ঞানেরই একটি দিব্য অংশ। সক্রেটিস, এই রহস্যময়ী শক্তিকেই, তাঁহার "দানব" (দানা Demon) বলিতেন। ভল্‌টেয়ার ইহার নাম দিয়াছিলেন,—মূর্ত্তিমান সয়তান; প্রতিভাবান নাটককার হইতে হইলে, মন্ত্রের দ্বারা এই সয়তানকে আহ্বান করিতে হয়। নাম যাহাই দেও না কেন, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে—জানিনা সে জিনিসটা কি—যাহা প্রতিভাকে জাগাইয়া তোলে। এবং প্রতিভাবান পুরুষ যতক্ষণ অন্তরের ভাব বাহিরে ব্যক্ত করিতে না পারেন, স্বকীয় সুখ দুঃখ, স্বকীয় মনোভাব, স্বকীয় কল্পনাকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে সান্ত্বনা

নাই—আরাম নাই। অতএব প্রতিভাতে দুইটি জিনিস্ বিশেষ-রূপে থাকা চাই। প্রথমত উৎপাদন করিবার জন্য একটা জলন্ত আগ্রহ; দ্বিতীয়ত উৎপাদন করিবার শক্তি। কেননা, শক্তি বিনা শুধু আগ্রহ—সে একটা ব্যাধি বিশেষ।

কার্য্য-সম্পাদনী শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনীশক্তি—মুখ্যরূপে ইহাই প্রতিভা। সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই কলারুচি সন্তুষ্ট। মিথ্যা প্রতিভা, জলন্ত অথচ অকর্ম্মণ্য কল্পনা, —নিস্ফল স্বপ্নেই আপনাকে নিঃশেষিত করে; সে এমন কিছুই উৎপাদন করে না যাহা বৃহৎ কিংবা মহৎ। কল্পনাকে সৃষ্টিতে পরিণত করাই প্রতিভার ধর্ম্ম।

প্রতিভা সৃষ্টি করে—নকল করে না। কেহ কেহ বলেন, প্রতিভা প্রকৃতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেন না প্রতিভা প্রকৃতিকে নকল করে না। প্রকৃতি ঈশ্বরের রচনা; অতএব মানুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইহার উত্তর খুব সোজা। না, প্রতিভাবান পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তিনি ঐশী রচনার শুধু ব্যাখ্যাকর্ত্তা। প্রকৃতি তাঁহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করেন, মানব-প্রতিভাও তাহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করে।

শিল্পকলা প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই কথা লইয়া পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই কথাটি আমরাও একটু বিচার করিয়া দেখিব। অবশ্য একভাবে দেখিতে গেলে, শিল্পকলা অনুকরণই বটে; কেন না, নিরবলম্ব নিরাধার সৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। যাহা প্রকৃতিরই অংশ সেই সব মূল-উপাদান ভিন্ন প্রতিভা আর কি লইয়া কাজ করিবে? কিন্তু প্রকৃতির

অনুকরণ ভিন্ন তাহার কি আর কোন কাজ নাই?—ঐ গণ্ডির মধ্যেই কি সে বদ্ধ? প্রতিভা কি বাস্তবের শুধু নকল-নবীশ? অবিকল নকল করাতেই কি তাহার একমাত্র গুণপনা? যে জীবসৃষ্টি আসলে অননুকরণীয় তাহার অবিকল নকল করা অপেক্ষা নিষ্ফল উদ্যম আর কি হইতে পারে? যদি শিল্পকলা প্রকৃতির দাসবৎ শিষ্য হয়, তবে সে শিষ্য নিতান্তই অক্ষম বলিতে হইবে।

যে প্রকৃত কলাগুণী সে প্রকৃতিকে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে, সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতির সকল পদার্থই সমান চিত্ত-বিমোহন নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিতে এমন একটা জিনিস আছে, যাহাতে-করিয়া প্রকৃতি শিল্প কলাকে অনন্তগুণে অতিক্রম করে—সে জিনিসটা কি?—না জীবন। এই জীবনকে ছাড়িয়া দিলে, শিল্পকলা প্রকৃতিকেও অতিক্রম করে—কেবল যদি সে অবিকল অনুকরণের প্রয়াসী না হয়। যতই সুন্দর হউক না কেন, কোনও প্রাকৃতিক পদার্থই সর্ব্বাংশে নিখুঁৎ নহে। যাহা কিছু বাস্তব তাহাই অপূর্ণ। কোন-কোন স্থলে দেখা যায়, লালিত্য ও শোভনতা,—মহান ভাব হইতে, শক্তির ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন। সৌন্দর্য্যের অবয়বগুলি বিক্ষিপ্তভাবে, বিভক্তভাবে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিলে,—কোন একটা নিয়মের অধীন না হইয়া, এ-মুখ হইতে একটা ঠোঁট, ও-মুখ হইতে একটা চোখ্ বাছিয়া লইলে—একটা অস্বাভাবিক কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হয় মাত্র। এই নির্ব্বাচনে যদি কোন একটা নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলেই একটা আদর্শ স্বীকার করা হইল—যাহা ব্যক্তিবিশেষ হইতে ভিন্ন। যে ব্যক্তি প্রকৃত কলাগুণী সে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া এইরূপ একটা আদর্শ খাড়া

করিয়া তোলে। অবশ্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়া এরূপ আদর্শ সে কখন কল্পনা করিতেও পারিত না; কিন্তু এই আদর্শটি পাইয়াই সে তাহার দ্বারা স্বয়ং প্রকৃতিকেও বিচার করে—সংশোধন করে; এমন কি প্রকৃতির সমকক্ষ হইতেও স্পর্দ্ধা করে।

কল্পনার আদর্শই গুণীজনের অনন্ত অনুরাগ ও ধ্যানের বিষয়। চিন্তার দ্বারা বিশোধিত, ভাব-রসের দ্বারা সঞ্জীবিত যে আদর্শ সেই আদর্শটিকে নীরবে ও একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে গুণীজনের প্রতিভা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কিরূপে সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায়—জীবন্ত করিয়া তোলা যায়, তৎপ্রতি গুণীজনের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাহা কিছু তাঁহার কাজে লাগিতে পারে সেই সমস্ত উপাদান তিনি প্রকৃতি হইতে সংগ্রহ করেন এবং মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যেরূপ সুনম্য মার্ব্বেলের উপর তাঁহার খনিত্রের ছাপ দিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি নিজ হস্তের প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সেই উপাদান হইতে এরূপ রচনা বাহির করেন যাহার অনুরূপ আদর্শ প্রকৃতির মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁহার সেই মানস-আদর্শেরই অনুকরণ করেন যাহা একপ্রকার দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিলেও হয়। ব্যক্তিত্ব ও জীবনের হিসাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায় যে, মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্যের হিসাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তাঁহার সেই রচনার উপর মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য মুদ্রিত থাকে।

নৈতিক সৌন্দর্য্যই সমস্ত প্রকৃত সৌন্দর্য্যের মূল। প্রকৃতি-রাজ্যে এই মূলটি একটু আচ্ছন্ন ভাবে একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। ঐ আবরণ হইতে শিল্পকলাই উহাকে বিনির্ম্মুক্ত করে এবং উহাকে স্বচ্ছ করিয়া

তোলে। শিল্পকলা, নিজের শক্তি-সম্বন্ধ যদি ঠিক বুঝে, তাহা হইলে ঐ দিক্ হইতেই প্রকৃতির সঙ্গে সে টক্কর দিতে পারে এবং তাহাতে কতকটা সফল হইতেও পারে।

শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য কি প্রথমে তাহাই নির্দ্ধারণ করা যাক্। শিল্পকলার নিজস্ব শক্তি যেখানে, উহার চরম উদ্দেশ্যও সেইখানে। ভৌতিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কিরূপে নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় ইহাই শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য। ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই সাঙ্কেতিক রূপ। অনেক সময়ে এই সাঙ্কেতিক রূপটি প্রকৃতির মধ্যে তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শিল্পকলা উহাকে আলোকে আনিয়া উহার উপর এরূপ প্রভাব প্রকটিত করে যাহা প্রকৃতিও সব সময়ে সেরূপ করিয়া উঠিতে পারে না। প্রকৃতি চিত্তরঞ্জনে অধিকতর সমর্থ; কেন না, প্রকৃতির রচনায় জীবন আছে—জীবন থাকায় কল্পনা ও নেত্র উভয়ই মুগ্ধ হয়। পক্ষান্তরে শিল্পকলা মানুষের মর্ম্মস্পর্শ করে, কেন না উহা প্রধানতঃ নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া, মনের গভীর আবেগ-সমূহের যে সূত্রস্থান একেবারে সেইখানে গিয়া আঘাত করে; এবং এই মর্ম্মস্পর্শিতাই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের নিদর্শন ও প্রমাণ। দুই সীম-প্রান্তই সমান বিপজ্জনক; এক, মৃত মানস-আদর্শ, আর এক, মানস-আদর্শের অভাব। বাস্তব আদর্শের (model) যতই কেন নকল কর না, হয়ত সেই রচনায় প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অভাব হইবে; আবার নিছক্ স্বকপোলকল্পিত কোন রচনা করিলেও হয়ত এমন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিকতা আসিয়া পড়িবে যাহাতে কোন একটা বিশেষত্ব নাই।

কি পরিমাণে মানসের সহিত বাস্তবের—রূপের সহিত ভাবের মিলন হওয়া উচিত, প্রতিভা তাহা চট্ করিয়া ধরিতে পারে—ঠিক্

ধরিতে পারে। এই সম্মিলনই শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ। এবং ইহাই উৎকৃষ্ট রচনা-সমূহের প্রকৃত মূল্য।

আমার মতে, শিল্পশিক্ষাতেও এই নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। লোকে জিজ্ঞাসা করে, ছাত্রেরা মানস-আদর্শের অনুশীলনের দ্বারা, না বাস্তবের অনুকরণের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করিবে? আমি কোন দ্বিধা না করিয়া এইরূপ উত্তর করি:—শিক্ষার আরম্ভে উভয়েরই অনুশীলন আবশ্যক। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী, বিশেষকে ছাড়িয়া সামান্যকে, কিংবা সামান্যকে ছাড়িয়া বিশেষকে আমাদের সম্মুখে কখনই অর্পণ করেন না। প্রত্যেক মানব-মূর্ত্তিতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষ লক্ষণ আছে—যাহা অন্য সমস্ত হইতে ভিন্ন; এবং তাছাড়া সাধারণ লক্ষণও আছে যাহাতে-করিয়া উহা মানবমূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। যাহারা চিত্রবিদ্যা শিখিতে প্রথম আরম্ভ করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন মূর্ত্তির ব্যক্তিগত বিশেষ-লক্ষণ ও আদর্শ-লক্ষণ উভয়ই অনুশীলন করা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, শুষ্ক ও সূক্ষ্ম নির্ব্বিশেষতা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, প্রথম হইতেই কোন স্বাভাবিক পদার্থের —বিশেষতঃ কোন জীবন্ত মূর্ত্তির নকল করা ভাল। এইরূপ করিলে, ছাত্রেরা প্রকৃতির বিদ্যালয়েই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, সৌন্দর্য্যের যে দুইটি প্রধান উপাদান, শিল্পকলার যে দুইটি অপরিহার্য্য নিয়ম তাহা কখনই তাহারা বিসর্জ্জন করিবে না; উহাতে তাহারা গোড়া হইতেই অভ্যস্ত হইবে।

কিন্তু এই দুইট উপাদান সম্মিলিত করিবার সময় উহাদের প্রত্যেককে ঠিক্ চেনা আবশ্যক এবং কোন স্থানে কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও বুঝা আবশ্যক।

এমন কোন মানস-মূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে না যাহার

একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নাই; এমন কোন একতা হইতে পারে না, যাহাতে বিচিত্রতা নাই; এমন কোন জাতি থাকিতে পারে না, যাহাতে ব্যক্তি নাই; কিন্তু যাই হোক্, মানস-আদর্শই সুন্দরের ভিতরকার জিনিস; এই মানস-আদর্শকে বাস্তবতায় পরিণত করাই প্রকৃত শিল্পকলা,—অমুক অমুক বিশেষ-আকারের অনুকরণে প্রকৃত শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমাদের শতাব্দির প্রারম্ভে ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনপরিষৎ নিম্নলিখিত প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন:—"প্রাচীন গ্রীস-দেশীয় ভাস্কর-শিল্পের চরম উৎকর্ষের কারণগুলি কি এবং কি উপায়ে ঐ প্রকার চরম উৎকর্ষে উপনীত হওয়া যাইতে পারে?" এই প্রশ্নটির সদুত্তর দিয়া যিনি জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম এমেরিক ডেভিড্। সেই সময়ে যে মতটি প্রবল ছিল সেই মতেরই পোষকতা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ঐকান্তিক অনুশীলনেই প্রাচীন ভাস্কর-কলা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং প্রকৃতির অনুকরণই ঐ প্রকার উৎকর্ষ লাভের একমাত্র পথ। কাতরমেয়ার দেকাঁসি নামক এক ব্যক্তি এই মত খণ্ডন করিয়া মানসিক আদর্শ-সৌন্দর্য্যের পক্ষ সমর্থন করেন। সমস্ত গ্রীক ভাস্কর-কলার ইতিহাস এবং তখনকার খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচকদিগের মতামত আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতির অনুকরণের উপর গ্রীকদিগের শিল্প-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বাস্তব-আদর্শ যতই সুন্দর হউক না কেন, তবু তাহা খুবই অপূর্ণ এবং অনেকগুলি বাস্তব আদর্শের অনুকরণেও একটি অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি কখনই গঠিত হইতে পারে না। প্রাচীন গ্রীকেরা সেই মানস আদর্শেরই অনুসরণ করিত যাহার প্রতিরূপ বাস্তব জগতে তখনও দেখা যাইত না, এখনও দেখা যায় না।

শিল্পকলা সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা প্রকারান্তরে অনুকরণ-মতেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকে। এই মতবাদীরা বলেন, বিভ্রম-মোহ উৎপাদন করাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। যে চিত্র-সৌন্দর্য্য চোখে ধাঁদা লাগাইয়া দেয়, তাহাই আদর্শ সৌন্দর্য্য। যেমন জিউক্সিস নামক চিত্রকারের আঙ্গুর ফলের উৎকৃষ্ট চিত্র। উহা এতটা প্রকৃতির অনুরূপ যে, সত্যকার আঙ্গুর মনে করিয়া পাখীরা আসিয়া ঠোক্‌রাইত। কোন নাট্যাভিনয়ে যখন কোন দৃশ্য বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয় তখনই তাহা কলানৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য তাহা এই :—কোন কলারচনা সুন্দর হইতে হইলে তাহাতে জীবন্ত ভাব থাকা চাই। তাহার দৃষ্টান্ত,—নাট্যকলার নিয়ম এই যে, অতীত কালের অপরিস্ফুট ছায়া-মূর্ত্তিসকল নাট্যমঞ্চে প্রদর্শিত হইবে না, পরন্তু কাল্পনিক কিংবা ঐতিহাসিক পাত্রগণ জীবন্ত ধরণের হইবে, আবেগময় হইবে; মানুষের ছায়ার মতন নহে—পরন্তু জীবন্তমানুষের মত কথা কহিবে, কাজকরিবে। অভিনয়ের ইন্দ্রজাল, মানব-প্রকৃতিকে বিকৃতরূপে প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাকে আরও উন্নত আকারে প্রদর্শন করিবে। এমন কি, এই ইন্দ্রজালই নাট্যকলার মূলমন্ত্র। এই ইন্দ্রজালই আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অপসারিত করে, আমাদিগকে সেই চির-আকাঙ্খা চির-আশার দেশে লইয়া যায়,—যেখানে বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতা সকল তিরোহিত হইয়া কতকটা পূর্ণতার আবির্ভাব হয়, যেখানকার কথিত ভাষা আরও উন্নত, যেখানকার ব্যক্তিগণ আরও সুন্দর, যেখানে কদর্য্যতার অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না; —অথচ সেই অভিনয়ের ইন্দ্রজাল ইতিহাসের মর্য্যাদা অতিক্রম করে না, এবং মানব-প্রকৃতির যে সকল অকাট্য নিয়ম তাহারও বাহিরে যায় না। শিল্পকলা যদি

মানুষকে অতিমাত্র বিস্মৃত হয় তাহা হইলে সে তাহার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে—তাহার গম্য-পথে কখনই উপনীত হয় না; সে এমন কতকগুলা অলীক বস্তু সৃষ্টি করে যাহার প্রতি আমাদের চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। আবার যদি শিল্পকলা বেশীমাত্রায় মানুষ-ঘেঁসা হয়, বেশীমাত্রায় বাস্তব হইয়া পড়ে, বেশীমাত্রায় নগ্নতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে তাহার গম্য-স্থানের এধারেই থাকিয়া যায়—তাহার ওদিকে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিভ্রম উৎপাদন শিল্পকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, কেননা কোন কলা-রচনা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারিলেও তাহা চিত্তাকর্ষণ না করিতেও পারে। আজকাল বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে, নাটমঞ্চে পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা হইয়া থাকে; কিন্তু আসলে উহাতে কিছুই যায় আসে না। নাট্যাভিনয়ে, যে ক্রটাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সে যদিও প্রাচীন রোমক বীরের পরিচ্ছদ পরিধান করে, এমন কি, যে ছোরা দিয়া সীজারকে বধ করা হইয়াছিল ঠিক সেই ছোরাখানা অভিনয়-কালে ব্যবহার করে—তথাপি, উহা প্রকৃত সমজ্‌দারের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। আরও এক কথা;—বিভ্রমমোহ বেশীমাত্রায় উৎপাদন করিলে, শিল্পকলার রসটি মরিয়া যায়, এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপ বাস্তবতা কখন কখন অসহ্য হইয়া উঠে। যদি আমার বিশ্বাস হয়, আমার অনতিদূরে, এফিজেনির পিতা এফিজেনিকে সত্যসত্যই বলি দিতেছে, তাহা হইলে আমি ভয় আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে নাট্যশালা হইতে বাহির হইয়া পড়ি।

কিন্তু এইরূপ প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়,—করুণ ও ভয়ানক

রস উদ্রেক করাই কি কবির উদ্দেশ্য নহে ? হাঁ, গোড়ায় কতকটা তাহাই উদ্দেশ্য বটে ; কিন্তু তাহার পর, উহাতে আর একটা রস মিশ্রিত করিয়া উহার তীব্রতা কমান হইয়া থাকে। চূড়ান্ত-পরিমাণে করুণা ও ভয়ানক রস উদ্রেক করাই যদি নাট্যকলার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিকট শিল্পকলাকে হার মানিতে হয়—এই বিষয়ে শিল্পকলা, প্রকৃতির অক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা বাস্তব-জীবনে প্রতিদিন যে সকল শোচনীয় দৃশ্য সচরাচর দেখিয়া থাকি, তাহার নিকট নাট্য-মঞ্চে প্রদর্শিত দুঃখ কষ্ট নিতান্ত লঘু বলিয়াই মনে হয়। কোন একটা প্রধান হাসপাতালে যে-সব করুণ ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায়, সমস্ত নাট্যশালা মিলিয়া তাহা দেখাইতে পারে না। যে মতটি আমরা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি সেই মতের অনুসরণ করিতে হইলে, কবি কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন ? তিনি যতদূর পারেন রঙ্গমঞ্চে বাস্তবতার অবতারণা করিবেন, এবং ভীষণ দুঃখ কষ্টের দৃশ্য আনিয়া আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত ও কম্পিত করিয়া তুলিবেন। করুণারস উদ্রেক করিবার প্রধান উপায়—মৃত্যু-দৃশ্যের অবতারণা। পক্ষান্তরে হৃদয় বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হইলে, শিল্পকলার রসভঙ্গ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত ;—ঝটিকা-দৃশ্যের কিংবা ভগ্নতরী-দৃশ্যের যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্যটি কি ? প্রকৃতির এই সকল মহান দৃশ্যের প্রতি আমরা কিসে এত আকৃষ্ট হই ? ইহা নিশ্চিত, করুণা কিংবা ভয়ে আকৃষ্ট হই না। এই দুই তীব্র ও মর্ম্মভেদী ভাব বরং ঐরূপ দৃশ্য হইতে আমাদিগকে পরাঙ্মুখ করে। করুণা কিংবা ভয় ছাড়া আর একটি রসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা ঐরূপ দৃশ্য দেখিবার জন্য তীরে দাঁড়াইয়া থাকি। উহা নিছক সৌন্দর্য্য-রস ও গাম্ভীর্য্যরস। সম্মুখের গম্ভীর দৃশ্য, সমুদ্রের বিশালতা, ফেনময়

উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ, বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ,—এই ভাবকে উদ্দীপ্ত করে। তখন কি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি যে কতকগুলি হত-ভাগ্য লোক কষ্ট পাইতেছে, কিংবা তাহাদের মৃত্যু আসন্ন? তাহা যদি ভাবিতাম তাহা হইলে ঐরূপ দৃশ্য আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিত। শিল্পকলা সম্বন্ধেও এইরূপ। যে কোন ভাবেই আমরা উত্তেজিত হই না কেন, সেই ভাবটিকে সৌন্দর্য্যরসের দ্বারা একটু আর্দ্র করা চাই, উহাকে সৌন্দর্য্যরসের অধীনে রাখা চাই। যদি কোন কলা-রচনা, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া কেবল করুণা ও ভয়ানক রসের উদ্রেক করে, বিশেষত শারীরিক করুণা ও শারীরিক ভয়ের উদ্রেক করে, তাহা হইলে আমরা উহার প্রতি বিমুখ হই—উহার প্রতি আর আ-কৃষ্ট হই না।

আর একদল আছেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে ধর্ম্মভাব ও নৈতিক ভাবের সহিত এক করিয়া ফেলেন, শিল্পকলাকে ধর্ম্ম ও নীতির সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে ভাল করিয়া তোলা, —আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে উন্নত করাই শিল্পকলার প্রকৃত উ-দ্দেশ্য। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে একটা মুখ্য প্রভেদ আছে। যদি সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই নৈতিক সৌন্দর্য্য নিহিত থাকে, যদি সৌন্দ-র্য্যের আদর্শ ক্রমাগত অনন্তের অভিমুখেই উত্থিত হয়, তবে যে শিল্পকলা সেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যকে পরিব্যক্ত করে, সেই শিল্পকলাও মানব আত্মাকে অনন্তের দিকে—অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে উন্নীত করিয়া তাহাকে বিমল করিয়া তোলে সন্দেহ নাই। অতএব শিল্পকলা মানব-আত্মার উৎকর্ষসাধন করে বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে। যে তত্ত্বদর্শী কার্য্যকারণের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তিনিই জানেন যে, শিল্প-কলা সৌন্দর্য্যেরই চরমতত্ত্ব এবং শিল্পকলার প্রভাব পরোক্ষ ও দূর-

বর্ত্তী হইলেও উহা ধ্রুবনিশ্চিত। কিন্তু কলাগুণীর নিকট সর্ব্বাগ্রে শিল্পকলাই অনুশীলনের বিষয়। যে ভাবরসে তাঁর চিত্ত ভরপূর সেই ভাবরস তিনি অন্য দর্শকের মনেও উদ্রেক করিতে চেষ্টা পান। তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সেই সৌন্দর্য্যকে সমস্ত বিভূতির দ্বারা, মানস-আদর্শের সমস্ত 'মোহিনী'র দ্বারা আবৃত করিয়া তাহাকে সংরক্ষিত করেন। তাহার পর সেই সৌন্দর্য্যই তাঁহার রচনাকে গড়িয়া তোলে; কতকগুলি বাছা-বাছা লোকের মনে সৌন্দর্য্যরসের উদ্রেক করিতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই বিমল ও নিস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্ম্মভাবের ও নৈতিকভাবের পরম সহায়; এই সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্ম্ম ও নীতির ভাবকে উদ্বোধিত করে, পরিপুষ্ট করে, বিকসিত করে, কিন্তু তথাপি এই সৌন্দর্য্যের ভাব একটি পৃথক ভাব—একটি বিশেষ ভাব। এমন কি, যে শিল্পকলা এই সৌন্দর্য্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যের দ্বারা উদ্দীপিত, সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—সেই শিল্পকলারও একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে। যদিও শিল্পকলা ধর্ম্মের সহচর, নীতির সহচর, যাহা কিছু মানব-আত্মাকে উন্নত করে তাহারই সহচর, তথাপি শিল্পকলা আপনার নিজস্ব শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত।

শিল্পকলার জন্য স্বাধীনতার দাবী, নিজস্ব মর্য্যাদার দাবী, বিশেষ উদ্দেশ্যের দাবী করিতেছি বলিয়া, কেহ না বুঝেন,—আমরা উহাকে ধর্ম্ম হইতে, নীতি হইতে, দেশানুরাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি। শিল্পকলা যেরূপ স্বকীয় গভীর উৎস হইতে—সেইরূপ চির-উদ্‌ঘাটিত প্রকৃতির নিকট হইতেও ভাবরস আকর্ষণ করে। কিন্তু একথাও সত্য,—কি শিল্পকলা, কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম্ম—ইহাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন অধিকার আছে, বিশেষ-বিশেষ কার্য্যশক্তি আছে; ইহারা

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু কেহ কাহারও অধীন নহে; উহাদের মধ্যে কেহ যদি স্বকীয় উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত হয়,—অমনি সে পথভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়; যদি শিল্পকলা অন্ধভাবে, ধর্ম্মের সেবায়—মাতৃভূমির সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়—সে তাহার মোহিনীশক্তি হারায়—তাহার প্রভুত্ব হারায়।

তৃতীয় উপদেশ।

শিল্পকলার ভেদ নির্ণয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শিল্পকলার লক্ষণ, উদ্দেশ্য ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নহে, প্রকৃতি ও প্রতিভার সাহায্যে মানব-চিত্ত যে আদর্শ-সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, সেই সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা। আদর্শ-সৌন্দর্য্য অসীমকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। যাহাতে প্রাকৃতিক সৃষ্টির ন্যায় মানব-রচনার মধ্যেও—বরং আরো বেশীমাত্রায়—অসীমের মোহন সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় তাহাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করিয়া—কোন্ মায়া-মন্ত্রের দ্বারা, অসীমকে সসীম হইতে বাহির করা যাইতে পারে? ইহাই শিল্পকলার বাধা এবং ইহাই শিল্পকলার গৌরব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কি আছে যাহা আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে পারে? ঐ সৌন্দর্য্যের যেটি মানসিক দিক্ সেই মানসিক আদর্শ-সৌন্দর্য্যই আমাদিগকে অসীমের দিকে লইয়া যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যের এই মানস-আদর্শই আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমে উন্নীত করে। অতএব, স্বকীয় মানস-আদর্শকে বাহিরে প্রকাশ করার দিকেই যেন কলা-গুণীর নিয়ত চেষ্টা হয়। মানস-আদর্শই কলাগুণীর সর্ব্বস্ব। কলাগুণী আর যাহাই করুন,—তাঁহার রচনার বিষয়ের মধ্যে যে মানস-আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তিনি সেই মানস-আদর্শটিকে প্রথমে ধরিবার চেষ্টা করিবেন; কেননা, তাঁহার বিষয়ের মধ্যে একটি মানস-আদর্শ অবশ্যই আছে। আদর্শটি একবার ধরিতে পারিলে তাহার পর কিসে এই

আদর্শটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়—মানব-চিত্তের গ্রাহ্য হয়, তাহার উপায় তিনি অবলম্বন করিবেন। তাঁহার মানস-আদর্শকে বাহিরে প্রকটিত করিবার জন্য তিনি অবস্থানুসারে, প্রস্তর, বর্ণ, ধ্বনি, কিংবা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এইরূপে, মানস-আদর্শকে ও অসীমকে কোন-না-কোন প্রকারে প্রকাশ করা—ইহাই শিল্পকলার নিয়ম; শিল্পরচনার যেটি প্রধান গুণ সেই ভাবব্যঞ্জকতার সাহায্যেই মানবচিত্তে সুন্দর ও অসীমের ভাব উদ্বোধিত হয়; এবং সুন্দর ও অসীম—এই দুই ভাবের সংস্রবেই শিল্পকলা শিল্পকলানামের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই ভাবব্যঞ্জকতা গুণটি আসলে মানস-আদর্শঘটিত। যাহা চক্ষু দর্শন করে ও হস্ত স্পর্শ করে, তাহা ছাড়া এই ভাবব্যঞ্জকতা এমন একটা জিনিস অন্তরে অনুভব করাইবার জন্য প্রয়াস পায় যাহা অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য।

শরীরের পথ দিয়া কিরূপে মন পর্যান্ত পৌঁছান যায়—ইহাই শিল্পকলার সমস্যা। বহিরিন্দ্রিয়ের অন্তরালে যে অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সেই অন্তঃকরণে, সৌন্দর্য্যের স্বরূপনেয় ভাবরত্নটিকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই শিল্পকলা বহিরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে,—আকৃতি, বর্ণ, ধ্বনি, বাক্য প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করে।

বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত যেরূপ আকৃতির সংস্রব, অন্তঃকরণের সহিত সেইরূপ ভাবের সংস্রব। ভিতরকার ভাব প্রকাশের পক্ষে আকার যেরূপ একমাত্র অমোঘ উপায়, সেইরূপ, আকারই আবার ভাব-প্রকাশের অন্তরায়। কলাগুণী, আকারের উপর সমস্ত রচনা-চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া, স্বকীয় ধৈর্য্য ও প্রতিভার বলে, ঐ অন্তরায়কেই উপায়ে পরিণত করেন।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকল শিল্পকলাই একরূপ। যতক্ষণ কোন শিল্পকলা অদৃশ্যকে প্রকাশ না করে ততক্ষণ সে শিল্প-কলাই নহে। একথা বারংবার আবৃত্তি করিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ভাবব্যঞ্জকতাই শিল্পকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম। যাহা প্রকাশ করিতে হইবে তাহা একই জিনিস;—উহাই ভিতরকার ভাব, উহাই মন, উহাই আত্মা; উহা অদৃশ্য, উহা অসীম। প্রকাশ করিবার জিনিসটি এক হইলেও, যাহার নিকট উহাকে প্রকাশ করিতে হইবে সেই ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা প্রযুক্তই শিল্পকলা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে :—মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটি ইন্দ্রিয়—রস গন্ধ ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়—ইহারা আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যরস উৎপাদন করিতে অসমর্থ। অন্য দুই ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া উহারা সৌন্দর্য্যরস উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু উহারা স্বয়ং উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা কিছু মুখরোচক, রসনা শুধু তাহারই বিচার করিতে সমর্থ, কিন্তু সুন্দরের বিচার করিতে রসনা সমর্থ নহে। যে ইন্দ্রিয় শরীরের সেবায় অতিমাত্র নিযুক্ত, আত্মার সহিত তাহার যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। উদরই রসনার প্রধান মনিব। রসনা উহারই তুষ্টিসাধনে—উহারই সেবায় নিয়ত নিযুক্ত। কখন কখন মনে হয় যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যরস গ্রহণে সমর্থ; তাহার কারণ, যে পদার্থ হইতে সৌরভ নিঃসৃত হয়, সে পদার্থটি হয়ত নিজেই সুন্দর এবং অন্য কারণে সুন্দর। সুন্দর গঠন ও উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্রের দরুণই গোলাপ ফুল সুন্দর। উহার গন্ধ সুখদ কিন্তু সুন্দর নহে। দৃষ্টির সাহায্য ব্যতীত স্পর্শ একাকী আকার-সৌষ্ঠবের বিচার করিতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবশিষ্ট দুই ইন্দ্রিয়ই আমাদের অন্তরে সৌন্দর্য্যভাব উদ্দীপনে সমর্থ। এই দুই ইন্দ্রিয়ই যেন বিশেষরূপে আত্মার সেবায় নিযুক্ত। এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতে এমন কিছু জিনিস আমরা প্রাপ্ত হই যাহা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ—অপেক্ষাকৃত মানসিক। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই দুই ইন্দ্রিয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। আমাদের ভরণপোষণের সাহায্য করা অপেক্ষা আমাদের জীবনের শোভা সম্পাদনেই উহারা অধিক সাহায্য করিয়া থাকে। উহারা আমাদিগকে যে প্রকার সুখ বিধান করে, শরীরের সহিত তাহার ততটা সংস্রব নাই। এই দুই ইন্দ্রিয়েরই সহিত শিল্পকলার যোগ নিবদ্ধ করা বিধেয়; এবং শিল্পকলা কার্যাতঃ তাহাই করিয়া থাকে; এই দুই ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়াই শিল্পকলা মানব-চিত্তে প্রবেশ লাভ করে। এইজন্যই শিল্পকলা দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিল্পকলা ও দর্শনেন্দ্রিয়ের শিল্পকলা; একদিকে সঙ্গীত ও কবিতা; অপর দিকে, চিত্র-কলা, ভাস্কর-কলা, বাস্তু-কলা, উদ্যান-কলা।

আমরা শিল্পকলার মধ্যে বাগ্মিতা, ইতিহাস, ও দর্শনকে ধরিলাম না বলিয়া হয়ত কেহ কেহ বিস্মিত হইবেন।

শিল্পকলা ললিতকলা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না, দর্শক কিংবা শিল্পীর সাংসারিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব উৎপাদন করাই শিল্পকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাকে স্বাধীন শিল্পও বলে। কেন না, ইহা স্বাধীন লোকের শিল্প, দাসের শিল্প নহে। এই শিল্পকলা আত্মার মুক্তিসাধন করে, জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে, মহৎ করিয়া তোলে। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে স্বাধীন শিল্প বলিত। এমনও

কতকগুলি শিল্প আছে যাহার মহত্ত্ব নাই, আর্থিক প্রয়োজন—সাংসারিক প্রয়োজনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ শিল্পকে ব্যবসায়-শিল্প বলা যায়। যেমন কুমোরের শিল্প, কামারের শিল্প। উহাতে প্রকৃত শিল্পকলা সংযোজিত হইতে পারে, শিল্পকলার দ্বারা উহার চাকচিক্য সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল একটা আনুষঙ্গিক কার্য্য।

বাগ্মিতা, ইতিহাস, দর্শন—অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন; উহাদের যে গৌরব, উহাদের যে শ্রেষ্ঠতা, সে গৌরব ও শ্রেষ্ঠতাকে আর কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু খুব ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, উহারা শিল্পকলা নহে।

শ্রোতৃবর্গের অন্তরে নিঃস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব সঞ্চারিত করা বাগ্মিতার উদ্দেশ্য নহে। যদি কখন উহার দ্বারা কার্য্যত ঐ ফল উৎপন্ন হয়,—সে উহার স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টায় নহে। কোন বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করা, কোন বিষয়ে প্ররোচনা করা—ইহাই বাগ্মিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বকীয় মক্কেলকে রক্ষা করা কিংবা তাহার জয়লাভে সাহায্য করাই বাগ্মিতার কাজ; সে মক্কেল যেই হউক না কেন—হউক সে মনুষ্য, হউক সে কোন মতামত, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাগ্যবান সেই বাগ্মী যে লোকের মুখ হইতে এই কথা বাহির করিতে পারে—"উহার বক্তৃতাটি বড়ই সুন্দর!" ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু হতভাগ্য সেই বাগ্মী যে উহা ভিন্ন আর কিছুই লোকের মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না; কেননা, কেবল সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া গেলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ডেমসথিনিস্ রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতার ও বসুয়ে ধর্ম্মবিষয়ক বাগ্মিতার মহৎ আদর্শ; ইহাদের প্রতি দেশরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার যে পবিত্র ভার

অর্পিত হইয়াছিল, কিসে সেই ভার তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বহন করিবেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল; পক্ষান্তরে, ফিডিয়াস ও র‍্যাফেল কেবল সুন্দর বস্তুর উৎপাদনেই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিক বাগ্মিতা—এই উভয়ের মধ্যে বহুল প্রভেদ। প্রকৃত বাগ্মিতা কার্য্যসিদ্ধির কতকগুলি উপায়কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অবশ্য লোকরঞ্জনে তাহার আপত্তি নাই—কিন্তু এমন কোন উপায়ে নহে যাহা তাহার অযোগ্য। যাহা তাহার অধিকার-বহির্ভূত—এরূপ অলঙ্কার প্রয়োগে তাহার হীনতা হয়। প্রকৃত বাগ্মিতার আসল লক্ষণ—সরলতা ও আন্তরিকতা; যাহা শুধু আন্তরিকতার ভাব ধারণ করে, আন্তরিকতার ভাণ করে, সেরূপ আন্তরিকতার কথা আমি বলিতেছি না;—সেত সর্ব্বপ্রকার প্রতারণার মধ্যে অধম প্রতারণা। যাহা অকপট হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, সেই আন্তরিকতার কথাই আমি বলিতেছি। সক্রেটিস প্রভৃতি মহোদয়গণ বাগ্মিতাকে এই ভাবেই বুঝিতেন।

বাগ্মিতার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। দর্শনকার বলেন ও লেখেন। দার্শনিকও কি বাগ্মীর ন্যায় নানা রং ফলাইয়া মর্ম্মস্পর্শী অলন্ত ভাষায় এমন করিয়া সত্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যাহাতে তাঁহার প্রতিপাদিত সত্য মানব-চিত্তে সহজে প্রবেশ লাভ করে? যে সকল উপায়ে তাঁহার কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে সেই সকল উপায় যদি তিনি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তিনি আপনিই আপনার কাজের হন্তা হয়েন। এই স্থলে, কলানৈপুণ্য একটা উপায় মাত্র, কিন্তু দর্শনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, দর্শন—শিল্পকলা নহে। অবশ্য প্লেটো একজন কলাগুণী ছিলেন;

প্যাস্‌কাল যেমন কোন-কোন স্থলে ডেমস্থিনিস ও বসুয়ের প্রতিদ্বন্দী, সেইরূপ প্লেটো ও সোফোক্লিস্‌ও ফিডিয়াসের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু আসলে উভয়ে সত্য ও ধর্ম্মেরই ঐকান্তিক সেবক।

বর্ণনা করিবার জন্যই বর্ণনা করা কিংবা চিত্র করিবার জন্যই চিত্র করা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে।

ইতিহাস এই জন্যই অতীতের বর্ণনা করে, অতীতের চিত্র অঙ্কিত করে যে তাহার দ্বারা ভাবীবংশের লোক জীবন্ত ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতীত যুগের প্রধান প্রধান ঘটনার অবিকল চিত্র প্রদর্শন করিয়া, মানব ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি, যে সমস্ত গুণ, যে সমস্ত অপরাধ জড়িত রহিয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া, নব্যবংশীয়দিগকে উপদেশ দেওয়াই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। দূরদৃষ্টি ও সাহস সম্বন্ধে ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। যে সকল মত গভীর চিন্তা হইতে প্রসূত হইয়া নিয়ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে,—দৃঢ়ভাবে ও সংযতভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, ইতিহাস সেই সকল মতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। অসংযত অতিমাত্র উদ্যমের নিষ্ফলতা, জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রচণ্ড শক্তি, বাতুলতা ও বদমাইসির অক্ষমতা—এই সমস্ত, ইতিহাসে জ্বলন্তভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

থুসিডিডিস, পলিবস ও ট্যাসিটস প্রভৃতি ইতিহাস-লেখক শুধু আমাদের অলস কৌতূহল ও বিকৃত কল্পনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন,—তা ছাড়াও তাঁহাদের আর কিছু করিবার আছে। অবশ্য লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক নহেন; কিন্তু শিক্ষাদানই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহারা রাষ্ট্রপরিচালকদিগের উপদেষ্টা ও মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু।

সুন্দর বস্তুই শিল্পকলার একমাত্র বিষয়। তাহা হইতে বিচ্যুত

হইলেই, শিল্পকলা আত্মবিনাশ সাধন করে। অনেক সময় বাধ্য হইয়া শিল্পকলাকে বাহ্য অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহার মধ্যেও শিল্পকলা একটু স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। বাস্তু-শিল্প ও উদ্যান-শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা কম স্বাধীন; উহারা কতকগুলি অনিবার্য্য বাধার অধীন। যেরূপ কবি, ছন্দ ও পদ্যের দাসত্বকেই অভাবনীয় একটি সৌন্দর্য্যের উৎসে পরিণত করেন, সেইরূপ বাস্তু-শিল্পীও কতকগুলি অপরিহার্য্য বাধা সত্ত্বেও প্রতিভা-বলে তাহার উপর স্বকীয় প্রভাব প্রকটিত করেন। শৃঙ্খলের অতিমাত্র ভারে শিল্পকলা যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অতিমাত্র স্বাধীনতাতেও শিল্পকলা খামখেয়ালি ভাব ধারণ করিয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়। সুখ-সুবিধার বেশী খাতির রাখিতে গেলে—তাহার অধীন হইয়া চলিতে গেলে—স্থাপত্যকলাকে বধ করা হয়। কোন বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে, বাস্তুশিল্পী অনেক সময়ে তাঁহার ইমারতের সাধারণ গঠন-কল্পনার সৌষ্ঠব ও সুপরিমাণ রক্ষা করিতে পারেন না। তখন বাহ্য অলঙ্কারের খুটিনাটিতেই তাঁহার সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবসিত হয়; তিনি শুধু ইমারতের অপ্রয়োজনীয় অংশেই তাঁহার গুণপনা দেখাইবার অবসর পান। ভাস্কর-কলা ও চিত্র-কলা, বিশেষতঃ সঙ্গীত ও কবিতা—ইহারা বাস্তুকলা ও উদ্যানকলা অপেক্ষা স্বাধীন। উহা-দিগকেও শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি-লাভ করা উহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

সকল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু কার্য্যফল ও কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন। পরস্পরের সহিত কার্য্যপ্রণালী বিনিময় করিয়া, পরস্পরের নির্দ্দিষ্ট সীমা-ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া কোন লাভ নাই। এবিষয়ে আমি প্রাচীন গ্রীকের মতকেই প্রমাণ বলিয়া শিরোধার্য্য করি

কিন্তু অভ্যাসের অভাব বশতই হউক, কিম্বা অন্ধসংস্কার বশতই হউক, বিভিন্ন ধাতুময় মূর্ত্তি কিংবা রং-করা মূর্ত্তি আমার তেমন ভাল লাগে না। অমিশ্র উপাদানে গঠিত, অচিত্রিত মূর্ত্তিই আমার ভাল লাগে। মার্ব্বেলের মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহাতে যে একটা কৃত্রিম মাংসের পেলবতা বিধান করিবার চেষ্টা করা হয় সেটা আমার রুচির সহিত মেলে না। ভাস্কর-সরস্বতী একটু কঠোর-প্রকৃতির দেবতা; কিন্তু তবু তাঁহাতে এমন কতকগুলি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে যাহা অন্য শিল্পকলায় নাই। ভাস্করকলার সহিত বর্ণের কোন সম্বন্ধ না রাখাই ভাল। ভাস্কর-শিল্পে যদি চিত্রকর্ম্ম আনিয়া ফেল, তাহা হইলে বল না কেন, তাহাতে কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট ভাবও আনা যাইতে পারে। যে সঙ্গীতকলা অনুভূতি-মূলক, তাহাকে যদি চিত্রবৎ মূর্ত্তিমান করিবার চেষ্টা কর—সে কি বৃথা চেষ্টা নহে? যে সঙ্গীতগুণী সমবেত-যন্ত্রসঙ্গীতে সুনিপুণ, তাহাকে একটা ঝড়ের অনুকরণে সঙ্গীত রচনা করিতে বল দেখি। অবশ্য, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের অনুকরণ ও বজ্রধ্বনির অনুকরণ করা খুবই সহজ। কিন্তু যে বিদ্যুচ্ছটা যামিনীর তিমিরাবগুণ্ঠনকে সহসা বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, কিংবা প্রচণ্ড ঝটিকার সময়, পর্ব্বত সমান উত্তুঙ্গ যে সাগর-তরঙ্গ একবার গগন স্পর্শ করিয়া আবার পরক্ষণে অতল রসাতলে নামিয়া যায়—এই সমস্ত দৃশ্য কি কোন প্রকার স্বর-সম্মিলনে প্রকাশিত হইতে পারে? যদি পূর্ব্ব হইতে শ্রোতাকে জানাইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সঙ্গীত-প্রকটিত এই দৃশ্য—ঝড়ের দৃশ্য, কি যুদ্ধের দৃশ্য, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে?—কখনই পারে না। বিজ্ঞান ও প্রতিভার যতই শক্তি থাকুক না, শব্দের দ্বারা কখনই রূপ চিত্রিত হইতে পারে না। যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য. তাহা চেষ্টা

না করাই সঙ্গীতের পক্ষে সুপরামর্শ। সঙ্গীত, তরঙ্গের উত্থান পতন অনুকরণ করিতে না পারুক, তাহা অপেক্ষা আরও ভাল কাজ করিতে পারে। ঝটিকার বিভিন্ন দৃশ্যে, আমাদের মনে পরম্পরাক্রমে যে সকল ভাবের উদয় হয়, সঙ্গীত সেই ভাব সকল আমাদের মনে উদ্বোধিত করিতে পারে। এইরূপেই সঙ্গীতগুণী হেড্‌নের নিকট চিত্রকরও পরাস্ত হয়; কেন না, চিত্রকর্ম্ম অপেক্ষাও সঙ্গীত আমাদের অন্তরের অন্তস্তলকে গভীররূপে আলোড়িত করিয়া তোলে। "কবিতা একপ্রকার চিত্র"—এই কথাটি সাধারণের মধ্যে খুব প্রচলিত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, কবিতার দ্বারা যে সব কাজ সাধিত হয়, চিত্রের দ্বারা কখনই তাহা সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতে পারে না।

কবিবর ভার্জ্জিল, যশের যে চিত্র আঁকিয়াছেন,—সকলেই তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু যদি কোন চিত্রকর এই রূপক-কল্পনাটিকে চিত্রের দ্বারা মূর্ত্তিমান করিবার চেষ্টা করেন, যদি ইহাকে এইরূপ একটা অতিকায় দৈত্যরূপে চিত্রিত করেন—যাহার শত মুখ, শত কর্ণ, যাহার পদদ্বয় ধরা ছুঁইয়া আছে এবং যাহার মুণ্ড আকাশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,—এইরূপ মূর্ত্তি কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না?

অতএব সকল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য সমান, কিন্তু উপায়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কারণেই সকল শিল্পকলার একই সাধারণ নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-কলার বিশেষ বিশেষ নিয়ম। এই বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি ধরিয়া আলোচনা করিবার আমাদের সময়ও নাই, অধিকারও নাই। আমরা শুধু এই কথাটি পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিব যে, সকল শিল্পকলারই উপর ভাবের পূর্ণ আধিপত্য। যে শিল্পরচনা কোন একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ না করে, সে শিল্পরচনার কোন অর্থই নাই। যে শিল্পরচনা কোন একটা বিশেষ ইন্দ্রিয় দি

অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে, কোন প্রকার উন্নত চিন্তা, মর্ম্মস্পর্শী ভাব, মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্প-কলাই সার্থক। এই মূল নিয়মটি হইতেই আর সকল নিয়ম প্রসূত হইয়াছে। যেমন মনে কর—কলা-রচনার নিয়ম। রচনাকার্য্যে সাম্য ও বৈষম্য বিষয়ক উপদেশটি বিশেষরূপে প্রযুজ্য। কিন্তু সাম্যের প্রকৃতি যতক্ষণ না নির্ণীত হয়, ততক্ষণ ইহা শুধু কথামাত্রেই থাকিয়া যায়। ভাবের একতাই প্রকৃত একতা। যে ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে সেই ভাবটি যাহাতে সমস্ত রচনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়, সেই জন্যই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এইরূপ রচনা এবং কৃত্রিম সাম্যরক্ষা ও অংশবিভাগের সুব্যবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। ভাব-ব্যঞ্জকতাই প্রকৃত রচনার মুখ্য উপাদান।

ভাবব্যঞ্জকতা হইতে শিল্পকলার শুধু যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়, তাহা নহে, উহা হইতে এরূপ একটি মূলসূত্র পাওয়া যায় যাহার দ্বারা শিল্পকলাকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

ফলতঃ শ্রেণীবিভাগ বলিতে গেলেই তাহার মধ্যে একটা সাধারণ মূলতত্ত্ব আছে এইরূপ বুঝায়—এবং সেই মূলতত্ত্বটিই সাধারণ মানদণ্ডের কাজ করে।

কেহ-কেহ আমাদের সুখের মধ্যেও এইরূপ একটি মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মতে, সেই শিল্পই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহার দ্বারা আমরা সুখানুভব করি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে শিল্পের উদ্দেশ্য সুখ নহে। শিল্পকলা হইতে আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে যে সুখানুভব করি তাহা উহার প্রকৃত মূল্যের পরিমাপক নহে।

শিল্পের প্রকৃত পরিমাপক ভাবব্যঞ্জকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেহেতু ভাব প্রকাশ করাই শিল্পের পরম উদ্দেশ্য। অতএব যাহার দ্বারা বেশী ভাব প্রকাশ হয়, শিল্পের মধ্যে সেই শিল্পই অগ্রগণ্য।

প্রকৃত শিল্পকলামাত্রেই ভাবব্যঞ্জক, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাব প্রকাশ করে। ধর, সঙ্গীত; এই সঙ্গীতকলাটি যে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, সর্ব্বাপেক্ষা গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিক, তাহাতে কাহারও বিরুক্তি নাই। কি ভৌতিক হিসাবে, কি নৈতিক হিসাবে, মানব-আত্মার সহিত ধ্বনির একটা আশ্চর্য্য যোগ আছে। মনে হয়, আমাদের আত্মা যেন একটা প্রতিধ্বনি, ধ্বনি যাহার দ্বারা একটা নূতন শক্তি লাভ করে। পুরাকালের সঙ্গীতসম্বন্ধে কতই অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। এই সঙ্গীতের প্রভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত করিতে হইলে, অতীব আড়ম্বরময় জটিল উপায় অবলম্বন করা যে আবশ্যক তাহাও মনে হয় না। বরং যে সঙ্গীত যত অধিক শব্দকারী সেই পরিমাণে সে তত কম মর্ম্মস্পর্শী। একজন সুকণ্ঠ গায়ক মৃদুস্বরে সঙ্গীতের আলাপ করিয়াও আমাদিগকে যেন সপ্তম স্বর্গে উত্তোলন করেন, আকাশের অসীম শূন্যে লইয়া যান, আমাদের চিত্তকে স্বপ্নসাগরে নিমজ্জিত করেন। কল্পনার সম্মুখে একটা অসীম বিচরণভূমি উন্মুক্ত করা—খুব সাদা-সিধা সুরের দ্বারা আমাদের অভ্যস্ত হৃদয়-ভাবগুলিকে উত্তেজিত করা, আমাদের ভালবাসার জিনিসগুলিকে জাগাইয়া তোলা—ইহাই সঙ্গীতের বিশেষ-শক্তি। এই হিসাবে, সঙ্গীত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তথাপি শিল্পকলার মধ্যে সঙ্গীতও সর্ব্বপ্রধান নহে।

সঙ্গীতের অপরিমেয় প্রভাব। অন্য সকল কলা অপেক্ষা সঙ্গীতই বেশী অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে; কেন না উহার কার্য্যফল

অস্পষ্ট, তিমিরাচ্ছন্ন ও অনির্দ্দিষ্ট। এই সঙ্গীতকলা, বাস্তুকলার ঠিক্ বিপরীত। বাস্তুকলা আমাদিগকে ততটা অনন্তের দিকে লইয়া যায় না, কেন না উহার সমস্তই সুনির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ—এক স্থানে গিয়া উহা থামিয়া যায়। অস্পষ্টতাই সঙ্গীতের বল ও দুর্ব্বলতা—উভয়ই। সঙ্গীত সমস্তই প্রকাশ করে, অথচ বিশেষ কিছুই প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে বাস্তুকলা অনির্দ্দিষ্ট কল্পনার হাতে কিছুই ছাড়িয়া দেয় না; এটি অমুক জিনিস কিংবা অমুক জিনিস নহে—বাস্তুকলা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। সঙ্গীত চিত্র করে না, সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শ করে; যে কল্পনা কতকগুলি মানস-প্রতিবিম্বমাত্র,—সঙ্গীত সেরূপ কল্পনার উদ্রেক করে না, পরন্তু সেইরূপ কল্পনার উদ্রেক করে যাহার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত হয়। হৃদয় একবার বিচলিত হইলে, আর সমস্তই বিচলিত হইয়া উঠে; এইরূপ পরোক্ষভাবে সঙ্গীতও কতকগুলি মানস-প্রতিবিম্বকে,—কতকগুলি মনঃকল্পিত রূপকে কিয়ৎপরিমাণে জাগাইয়া তোলে; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ও স্বাভাবিকভাবে ইহার শক্তি কল্পনার উপর কিংবা বুদ্ধির উপর প্রকটিত হয় না;—প্রকটিত হয় শুধু হৃদয়ের উপর। সঙ্গীতের পক্ষে ইহাও একটা কম সুবিধার কথা নহে।

সঙ্গীতের রাজ্য—ভাবরসের রাজ্য। কিন্তু ইহাতেও বিস্তার অপেক্ষা গভীরতাই বেশী। সঙ্গীত কতকগুলি ভাবকে খুব সজোরে প্রকাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুবই কম। সঙ্গীত স্মৃতির পথ দিয়া আনুসঙ্গিকভাবে সকল প্রকার ভাবকেই এবং প্রত্যক্ষভাবে অতি অল্পসংখ্যক ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে—তাও আবার যে ভাবগুলি খুব সাদাসিধা—যেমন হর্ষ ও বিষাদের সূক্ষ্ম ভেদ-সমূহ—সেই সকল ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে।

মহানুভাবতা, কোন সাধু প্রতিজ্ঞা, কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন ভাব সঙ্গীতকে প্রকাশ করিতে বল দেখি,—হ্রদ কিংবা পর্ব্বত চিত্রিত করিতে যেমন সে পারিবে না, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেও সে তেমনি অসমর্থ হইবে।

সঙ্গীতে, দ্রুত, বিলম্ব, মৃদু, তীব্র এই সকল বিবিধ প্রকারের ধ্বনি প্রযুক্ত হয়—কিন্তু বাকী আর সমস্তই কল্পনার কাজ; কল্পনার যেটি ভাল লাগে কল্পনা সেইটিই গ্রহণ করে। সঙ্গীত একই ছন্দে, একই তালে পর্ব্বতেরও ভাব প্রকাশ করে—সমুদ্রের ভাবও প্রকাশ করে; কোন যোদ্ধৃ পুরুষ উহার দ্বারা বীর-রসে মাতিয়া উঠেন—এবং কোন ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ উহার দ্বারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন। অবশ্য সঙ্গীতের ভাব অনেক সময়ে বাক্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু সে গুণপনা বাক্যের—সঙ্গীতের নহে। কখন কখন বাক্যের দ্বারা সঙ্গীতে এমন একটা বদ্ধভাব আসিয়া পড়ে, যে তাহার দ্বারা সঙ্গীতের "জান্" টুকু মরিয়া যায়—সঙ্গীতের সেই অস্পষ্ট অনির্দ্দেশ্য কি-জানি-ভাবটি চলিয়া যায়—তাহার বিস্তার, তাহার গভীরতা, তাহার অনন্তত্ব বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গান কি?—না, স্বরাত্মক বাক্য; কিন্তু সঙ্গীতের এই প্রসিদ্ধ লক্ষণটি আমি কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কোন সাদাসিধা সুপঠিত বাক্য,—কর্ণবধিরকর সঙ্গীত-সংকৃত বাক্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল। সঙ্গীতের নিজ প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক; তাহার নিজস্ব দোষগুণ কিছুই তাহা হইতে অপসারিত করা বিধেয় নহে। বিশেষত তাহার স্বকীয় উদ্দেশ্য হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিয়া, এমন কিছু তাহার নিকট হইতে চাওয়া উচিত নহে যাহা সে দিতে পারিবে না। জটিল ধরণের কৃত্রিম ভাব কিংবা ইতর ও

গ্রাম্য ভাব প্রকাশ করা সঙ্গীতের কাজ নহে। অনন্তের দিকে আত্মাকে উন্নত করাতেই তাহার বিশেষ মনোহারিত্ব। অতএব সঙ্গীত স্বভাবতই ধর্ম্মের সহচর, বিশেষতঃ সেই প্রকার ধর্ম্মের সহচর, যে ধর্ম্ম অনন্তের ধর্ম্ম ও হৃদয়ের ধর্ম্ম—উভয়ই। সঙ্গীত আত্মাকে অনুতাপের প্রস্রবণে লইয়া গিয়া বিমল করিয়া তোলে, আশা ও প্রেমের দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করে। যাঁহারা রোমে গিয়া পোপভবনে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের সুগম্ভীর ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান্। তৎশ্রবণে ক্ষণেকের জন্য আত্মা যেন স্বর্গের আভাস প্রাপ্ত হয়; দেশভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ বিচার না করিয়া, সহজ স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন ভাবের একটি অদৃশ্য রহস্যময় সোপান দিয়া সেই সঙ্গীত প্রত্যেক মানব-আত্মাকে উর্দ্ধে লইয়া যায়। তখন সংসারের পরপারে সেই শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য মানবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

বাস্তুকলা ও সঙ্গীতকলা—এই দুই বিপরীত ভাবাপন্ন শিল্পকলার মাঝামাঝি স্থানে চিত্রকলা অবস্থিত। চিত্রকলা বাস্তুকলারই মত সুনির্দ্দিষ্ট এবং সঙ্গীতকলারই মত মর্ম্মস্পর্শী। চিত্রকলা পদার্থসমূহের দৃশ্যমান রূপ নির্দ্দেশ করে এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে একটু জীবনের ভাবও প্রকাশ করে; সঙ্গীতের ন্যায়, চিত্রকলাও আত্মার গভীর ভাবগুলি ব্যক্ত করে—বলিতে গেলে, সকল ভাবই প্রকটিত করে। বল দেখি এমন কোন্ ভাব আছে যাহা চিত্রকরের পটে চিত্রিত না হয়? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই চিত্রকরের কার্য্যক্ষেত্র; ভৌতিক জগৎ, নৈতিক জগৎ, কোন বহির্দৃশ্য, সূর্য্যাস্ত, সমুদ্র, রাষ্ট্রজীবনের ও ধর্ম্ম-জীবনের বৃহৎ দৃশ্য, সৃষ্টির সমস্ত জীবজন্তু, সর্ব্বোপরি মানুষের মুখশ্রী, সেই মানব-দৃষ্টি যাহা মানব-চিত্তের দর্পণ—সমস্তই তাঁহার চিত্রকর্ম্মের

বিষয়। বাস্তুকলা অপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী, সঙ্গীতকলা অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট এই যে চিত্রকলা,—ইহা আমাদের মতে, উক্ত কলাদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেননা উহা সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য, ও মানব-আত্মার বিচিত্র ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু সমস্ত কলার মধ্যে কবিতাই শ্রেষ্ঠ ; ইহা সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে ; কেননা ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক।

বাক্যই কবিতার সাধন-যন্ত্র ; কবিতা, বাক্যকে আপনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়, এবং আদর্শ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে মনোবস্তুতে পরিণত করে। কবিতা, বাক্যকে ছন্দের দ্বারা সুন্দর করিয়া তোলে ; বাক্যকে, সামান্য কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া দাঁড় করায় ; উহাকে এমন কিছু করিয়া তোলে যাহা মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—উভয়ই, যাহা আকৃতি ও দেহগঠনের ন্যায় সীমাবদ্ধ, পরিস্ফুট, সুনির্দ্দিষ্ট ; যাহা বর্ণচ্ছটার ন্যায় জীবন্ত-ভাবাপন্ন, যাহা ধ্বনির ন্যায় মর্ম্মস্পর্শী ও অনন্ত। শব্দ স্বয়ং—বিশেষতঃ কবিতার নির্ব্বাচিত ও রূপান্তরিত শব্দ—একটি প্রবল বিশ্বজনীন সঙ্কেত। এই শব্দ মন্ত্রের সাহায্যে, কবিতা প্রত্যক্ষ জগতের সমস্ত বিচিত্র প্রতিবিম্বকে প্রতিভাত করিতে পারে—যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য,—এবং একটার পর একটা এরূপ দ্রুতভাবে প্রকাশ করিতে পারে যে, চিত্রকলা সেরূপ করিয়া উঠিতে পারে না ; আবার বাস্তুকলার ন্যায় উহাদিগকে সুস্থিত ও অচল করিয়াও রাখিতে পারে। কবিতা যে শুধু এই সমস্তই প্রকাশ করে তাহা নহে, উহা আরও কিছু প্রকাশ করে যাহা অন্য সমস্ত কলার অনধিগম্য অর্থাৎ উহা চিন্তাবস্তুকে প্রকাশ করে, যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে এমন কি হৃদয়ের ভাব হইতেও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ;—সেই চিন্তা

যাহার কোন রূপ নাই, সেই চিন্তাবস্তু যাহার কোন বর্ণ নাই, সেই চিন্তাবস্তু যাহা হইতে কোন শব্দ নিঃসৃত হয় না, সেই চিন্তাবস্তু যাহা কাহারও দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না, সেই চিন্তাবস্তু যাহা জগৎ ছাড়াইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া উর্দ্ধে গমন করে—সেই চিন্তাবস্তু যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর।

ভাবিয়া দেখ,—"স্বদেশ" এই শব্দটির দ্বারা কত মানস-ছবি, কত হৃদয় ভাব, পরিস্ফুট হয়, কত চিন্তাই আমাদের মনে উদ্রিক্ত হয়; "ঈশ্বর"—এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি বৃহৎ, ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট অথচ গভীর ও ব্যাপক শব্দ আর কি আছে?

বাস্তুশিল্পীকে, ভাস্করকে, চিত্রকরকে, এমন কি সঙ্গীতগুণীকে—প্রকৃতি ও আত্মার সমস্ত শক্তিকে একাধারে প্রকাশ করিতে বল দেখি;—তাহারা কখনই পারিবে না; এবং ইহাতে করিয়াই প্রকারান্তরে কবিতার শ্রেষ্ঠতা তাহাদের স্বীকার করা হয়। এই শ্রেষ্ঠতা উহারা আপনা হইতেই ঘোষণা করে, কেননা কবিতাকেই উহারা নিজ নিজ রচনার সৌন্দর্য্য-পরিমাপক রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে; তাহাদের রচনা, কবিত্ব-আদর্শের যতটা কাছাকাছি যায় ততই তাহাদের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। কলাগুণীদিগের ন্যায় জনসাধারণও এইভাবে কার্য্য করে। কোন সুন্দর চিত্র দেখিয়া, জীবন্তবং ভাবব্যঞ্জক কোন মূর্ত্তি দেখিয়া, একটি মহৎ ভাবের সুর শুনিয়া, তাহারা বলিয়া উঠে,: "আহা কি কবিত্ব"। ইহা কেবল একটা খামখেয়ালি তুলনা মাত্র নহে; কিন্তু কবিতাই যে কলার পূর্ণ আদর্শ, সকলের শ্রেষ্ঠ, সকল কলাই যে ইহার অন্তর্গত, সকল কলাই যে উহার নিকটে উপনীত হইতে আকাঙ্খা করে কিন্তু কেহই উপনীত হইতে সমর্থ হয় না—ইহা স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিরই কথা।

কবিতা, মানব-বাক্যকে ভাবের আকারে পরিণত করিলে, উহাই সঙ্গীতের ন্যায় গভীরতা ও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। কবিতা যেমন দীপ্তিমান তেমনি মর্ম্মস্পর্শী; ইহা যেমন মনের সঙ্গে—তেমনি হৃদয়ের সঙ্গে কথা কহে। সকল প্রকার দ্বন্দ্বভাবের সাদৃশ্য—বিপরীত ভাবের সাদৃশ্য কবিতার মধ্যে উপলব্ধি হয়। অথচ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া উহার প্রভাব যেন দ্বিগুনিত হয়। কবিতায় মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ছবি, সর্ব্বপ্রকার ভাবরস, সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি, মনের সকল দিক্, পদার্থের সর্ব্বাংশ, সমস্ত দৃশ্যমান্ জগৎ, সমস্ত অদৃশ্য জগৎ—সমস্তই পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই কবিতার সহিত আর কোন কলার তুলনা হয় না। উহা অনুকরণীয়।

তৃতীয় খণ্ড।

মঙ্গল

প্রথম উপদেশ।

আমাদের সত্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইয়া এক্ষণে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, অধ্যাত্মবিদ্যা, ন্যায়, তত্ত্ববিদ্যা সেই জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরের ধারণা হইতে রস-শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং মঙ্গলের ধারণা হইতে সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের উৎপত্তি।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে যে নৈতিক ধারণা বদ্ধ তাহা মিথ্যা ও সংকীর্ণ। যেরূপ ব্যক্তিগত নীতি আছে, সেইরূপ সার্ব্বজনিক নীতিও আছে। মানুষে মানুষে যে সাধারণ সম্বন্ধ, সে ত আছেই, তা ছাড়া এক নগরের লোক—এক রাষ্ট্রের লোক বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সকল সম্বন্ধও সার্ব্বজনিক নীতির অন্তর্ভূত। মঙ্গলের ভাব যেখানে লেশমাত্র আছে, সেইখানেই নীতির অধিকার। রাষ্ট্রিক জীবনের রঙ্গভূমিতে, এই মঙ্গলের ধারণা, ন্যায় অন্যায়ের ধারণা, সুকৃতি দুষ্কৃতির ধারণা, বীরত্ব দুর্ব্বলতার ধারণা, যেরূপ অনাবৃত ভাবে ও বলবৎরূপে প্রকাশ পায়, এমন আর কোথায়? নীতির উপর—এমন কি, ব্যক্তিগত নীতির উপর,—লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, ও রাষ্ট্রপ্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার যে প্রভাব সেরূপ প্রভাব আর কোথায় লক্ষিত হয়? যদি মঙ্গলের সীমা অতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে মঙ্গলকে ততদূর পর্য্যন্তই অনুসরণ করিতে হইবে। সুন্দরের ধারণা যেরূপ আমাদিগকে কলা-রাজ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, মঙ্গলের ধারণা সেইরূপ আমাদিগকে

রাষ্ট্রিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্রেও আনিয়া ফেলিবে। দর্শনশাস্ত্র কোন অপরিচিত নূতন শক্তিকে জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করে না, পরন্তু মানব-প্রকৃতির যে সকল মহতী অভিব্যক্তি—দর্শনশাস্ত্র সেই সকল অভিব্যক্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে না। যে দর্শনশাস্ত্র নীতিতত্ত্বে পর্য্যবসিত না হয় তাহা দর্শন নামের যোগ্য কি না সন্দেহ; এবং যে নীতি অন্ততঃ সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত না হয়, সে নীতি নিতান্তই শক্তি-হীন, মানবের দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদে সে নীতি কোন সুপরামর্শ দিতে পারে না, কোন নিয়মের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

একথা মনে হইতে পারে—ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইয়াছি, যে তত্ত্ববিস্তার ও যে রসতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছি তাহা হইতেই নীতি-সমস্যার মীমাংসা আপনা-আপনি হইয়া যাইবে—কোন্‌টি নীতি, কোন্‌টি নীতি নহে, সহজেই নির্দ্ধারিত হইবে।

এরূপ মনে হইতে পারে—আমরা যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছি, তাহার দ্বারা মঙ্গলের এই দূর-পরিণাম-স্পর্শী ও বৃহৎ সমস্যাটি পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের সত্য-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ও সুন্দরসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হইতেই, স্বাভাবিক যুক্তি-পরম্পরাক্রমেই আমরা নীতিসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব; হয় ত পারিব কিন্তু আমরা তাহা করিব না। তাহা হইলে, আমরা এ পর্য্যন্ত যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই প্রণালী প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত, কোন স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির উপর স্থাপিত নহে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরামর্শ অনুসারে ইহার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। পরীক্ষা-কার্য্যে যেন আমরা ক্লান্তি বোধ না করি; অধ্যাত্মবিস্তার প্রণালী

যেন আমরা যথাযথরূপে অনুসরণ করি। উহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটে, অনেক পুনরাবৃত্তি হয়, এ সমস্তই সত্য; কিন্তু উহা আমাদিগকে সমস্ত বাস্তবতার—সমস্ত জ্ঞানালোকের মূলে লইয়া যায়।

অধ্যাত্মবিদ্যার অনুমোদিত প্রণালীর মূলসূত্রটি এই:—প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র, নূতন কিছুই উদ্ভাবন করে না, উহা তত্ত্বসকল নির্দ্ধারণ করে মাত্র;—যে জিনিসটি যাহা, তাহারই বর্ণনা করে মাত্র। এস্থলে জিনিসটিকি,—না, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস। অতএব মঙ্গল-সম্বন্ধে, মানুষের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসটি কি—আমাদের নিকট ইহাই প্রধান সমস্যা।

এক দিক্ দিয়া মানবজাতি এবং অপর দিক্ দিয়া দর্শনশাস্ত্র যাত্রা আরম্ভ করে—এ কথা আমরা বলি না। দর্শনশাস্ত্র মানবজাতির ব্যাখ্যাকর্ত্তা। মানবজাতি যাহা কিছু বিশ্বাস করে ও চিন্তা করে (অনেক সময়ে আপনার অজ্ঞাতসারে) দর্শনশাস্ত্র তাহাই সঙ্কলন করে, ব্যাখ্যা করে, স্থাপনা করে। উহা সমগ্র মানব-প্রকৃতির যথাযথ ও পূর্ণ অভিব্যক্তি। যে মানব-প্রকৃতি প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান, তাহা প্রত্যেকেরই অহংজ্ঞানে উপলব্ধি হয়; এবং যে মানব-প্রকৃতি অন্যের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা অন্যের বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ পায়। উভয়কেই জিজ্ঞাসা করা যাক্, বিশেষতঃ আমাদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্; সমস্ত মানবজাতি কি চিন্তা করে,-অনুসন্ধান করিয়া জানা যাক্; তাহার পর আমরা দেখিব দর্শনের প্রকৃত কাজ কি।

এমন কোন জাতি কি আমাদের জানা আছে যাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, ন্যায় অন্যায়—এই সকলের প্রতিশব্দ নাই? এমন কোন ভাষা কি আছে, যাহাতে, সুখ, স্বার্থ, প্রয়োজন, হিত—

এই সকল শব্দের পাশাপাশি—স্বার্থবিসর্জ্জন, নিঃস্বার্থভাব, আত্মোৎসর্গ—এই সকল শব্দ লক্ষিত হয় না। প্রত্যেক ভাষার ন্যায় প্রত্যেক জাতিও কি স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য ও স্বত্বাধিকারের কথা বলে না ?

এইখানে বোধ হয়, কঁদিয়াক্ ও হেল্‌ভেস্যসের কোন শিষ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—পর্য্যটকেরা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে যে সকল অসভ্য জাতি দেখিয়াছেন, তাহাদের ভাষার কোন প্রামাণিক অভিধান আমার নিকট আছে কি না ?—না, আমার নিকট নাই ; কিন্তু আমরা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের উপধর্ম্ম ও কুসংস্কার লইয়া আমাদের দার্শনিক ধর্ম্মমত গঠন করি নাই ; কোন দ্বীপবাসী অসভ্য-জাতির মানব-প্রকৃতি অনুশীলন করা আবশ্যক, ইহা আমরা একেবারেই অস্বীকার করি। অসভ্যদিগের অবস্থা—মানবজাতির শৈশবাবস্থা, মানবজাতির বীজাবস্থা ; উহা মানবজাতির পরিণত অবস্থা নহে। মানবজাতির মধ্যে যে মনুষ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃত মনুষ্য। যেমন, যে মানবসমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত মানব-সমাজ, সেইরূপ যে মানব-প্রকৃতি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত মানব-প্রকৃতি। অ্যাপলো বেল্‌ভিডিয়ার সম্বন্ধে কোন অসভ্য মনুষ্যের মতামত কি, তাহা আমরা জানিবার জন্য লালায়িত হই না। কি কি মূলতত্ত্ব লইয়া মানবের নৈতিক প্রকৃতি গঠিত তাহাও আমরা অসভ্য মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, অসভ্য মনুষ্যের নৈতিক প্রকৃতির সবেমাত্র রেখাপাত হইয়াছে, তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। আমাদের সপ্তদশ শতাব্দির বিপুল দর্শনশাস্ত্র অনেকস্থলে বিবিধ সিদ্ধান্তের অবতারণায় একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে ; তাহাতে ঈশ্বরই কর্ম্ম-রঙ্গভূমির প্রধান

নায়ক, তাহাতে মনুষ্যের স্বাধীনতা একেবারে বিদলিত হইয়াছে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দির দর্শনশাস্ত্র ঠিক্ তাহার বিপরীত সীমায় উপনীত। উহা অন্য ধরণের সিদ্ধান্তসকল অবলম্বন করিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই;—আদিম মানবের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেই এখনকার সমস্ত মনুষ্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য রুসো অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর—দেখিবে, এই স্বাভাবিক অবস্থার মতপ্রচারক, একদিকের আতিশয্যের অভিমুখে ধাবিত হইয়া বিপরীত দিকের আতিশয্যে উপনীত হইয়াছেন; বন্য স্বাধীনতার মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে, তিনি ল্যাসিডেমোনিয়া-প্রচলিত সামাজিক চুক্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার কঁডিয়াক্ একটি প্রতিমূর্ত্তিতে কি করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল তাহাই কল্পনা করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রতিমূর্ত্তিটি, আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয় পরে পরে লাভ করিল, কিন্তু একটা জিনিস লাভ করিল না—সে জিনিসটা মনুষ্যের মন—মনুষ্যের আত্মা। ইহাই তখনকার পরীক্ষা-পদ্ধতি! এই সকল আনুমানিক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দেও। সত্যকে জানিবার জন্য সত্যের অনুশীলন আবশ্যক—শুধু কল্পনা করিলে চলিবে না। পরিণত মনুষ্যের বাস্তবিক লক্ষণ ও অবস্থা এখন যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বন্য অবস্থার—আদিম অবস্থার মনুষ্যের কিরূপ প্রকৃতি ও লক্ষণ ছিল, তাহা শুধু অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। অবশ্য বন্যদিগের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শৈশব-অন্ধকারের মধ্যেও দুই একটা বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ পায়, এখনকার ন্যায় উচ্চতর ধর্ম্মবৃত্তির নিদর্শন উপলব্ধি হয়—পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হইতে ইহা আমরা দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার এ স্থান নহে। কিন্তু যাহাতে আমরা প্রকৃত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যথাযথরূপে অনুসরণ করিতে পারি, এই জন্য শিশু ও বন্য মনুষ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া একটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব—সেই বিষয়টি বর্ত্তমানকালের মনুষ্য, প্রকৃত মনুষ্য, পূর্ণবিকশিত মনুষ্য।

এমন কোন ভাষা কিংবা জাতি কি দেখাইতে পার যাহার মধ্যে "নিঃস্বার্থভাব" এই কথাটি নাই? লোকে কাহাকে সাধু ব্যক্তি বলে? যে বিষয়কর্ম্মে খুব দক্ষ ও হিসাবী তাহাকে, না যে আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধেও ন্যায়ধর্ম্ম পালন করিতে সতত ইচ্ছুক—তাহাকে? নিজ স্বার্থের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে লোক-মত ও সুখ-সুবিধার বিরুদ্ধেও কতকটা ত্যাগস্বীকার করিতে সমর্থ—এই ভাবটি যদি কোন সাধু ব্যক্তির চরিত্র হইতে উঠাইয়া লও, তাহা হইলে তাহার সাধুতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। যাহাতে আমার নিজের সুখ হয়, যাহা কিছু আমার নিজের কাজে লাগে তাহাই আমার বরণীয়—এইরূপ মনের প্রবৃত্তি যে পরিমাণে কম কিংবা বেশী হয়, ক্ষীণ কিংবা প্রবল হয়, অল্প কিংবা অধিক স্থায়ী হয়, সেই অনুসারে সাধুতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। খুব সামান্য অবস্থার লোকই হউক, কিংবা রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয়ের পাত্রই হউক, যদি কোন ব্যক্তির নিঃস্বার্থভাব, আত্মোৎসর্গের সীমায় উপনীত হয় তবেই তাহাকে আমরা বীরপুরুষ বলিয়া থাকি। দুই প্রকার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখা যায়—এক প্রকার আত্মোৎসর্গ লোক লোচনের অগোচর, আর এক প্রকার আত্মোৎসর্গ জলন্ত-ভাবে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রণক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় সাহস ও দেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি যেমন বীরপুরুষ নামে অভিহিত হয়,

সামান্য জীবন-ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, অসাধারণ ঋজুতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, তাহাকেও আমরা বীর নামে আখ্যাত করি। সকল ভাষাতেই এই সকল শব্দের তাৎপর্য্যার্থ সুপরিচিত; এবং ইহা হইতেই এই তথ্যের সার্ব্বভৌমতা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয়। এই তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এক বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক;—ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেন আমরা ইহার মূলোচ্ছেদ না করি। স্বার্থপরতাই নিঃস্বার্থপরতার মূল—এই বলিয়া কি আমরা এই নিঃস্বার্থভাবের ব্যাখ্যা করিব? লোকের সহজ জ্ঞান একথায় কথনই সায় দিবে না।

কবিদিগের কোন বিশেষ দর্শন-তন্ত্র নাই। মানুষের মনে ভাবোৎপাদন করিবার জন্য, মানুষ এখন যেরূপ—সেই মানুষের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা কবিতা রচনা করেন। কবিগণ, সুনিপুণ স্বার্থপরতার —না, নিঃস্বার্থ সাধুভাবের গুণ কীর্ত্তন করেন? মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার সফলতার জন্য—না। সাধুতার স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বার্থত্যাগের জন্য তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে প্রশংসা চাহেন? মানব আত্মার অন্তঃস্তলে নিঃস্বার্থভাবের ও আত্মোৎসর্গের কি এক আশ্চর্য্য প্রভাব আছে—কবি তাহা জানেন। তিনি নিশ্চয় জানেন, হৃদয়ের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটি উত্তেজিত করিলেই মানব-হৃদয়ে একটা গম্ভীর প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিবে—করুণরসের সমস্ত উৎস উৎসারিত হইবে।

মানব-জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন কর, সর্ব্বত্রই দেখিবে, লোকেরা বেশী বেশী স্বাধীনতার জন্য ক্রমাগত দাবী করিতেছে। এমন কি মনুষ্য শব্দটি যত দিনকার, এই স্বাধীনতা শব্দটিও তত দিনকার পুরাতন। কি আশ্চর্য্য! লোকেরা স্বাধীনতা লাভের দাবী করি-

মন্দের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই, ইহাই যাহাদের মত তাহাদের স্থানে তুমি আপনাকে একবার স্থাপন কর, এবং এই মানব-বিচার-নির্দ্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যে মূঢ় নৃশংসতা বিদ্যমান তাহাও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। অপরাধী কি করিয়াছিল? সে যে কাজ করিয়াছিল তাহাতে আসলে ভাল মন্দ কিছুই নাই। কারণ, যদি ভাল মন্দের মধ্যে, সুখ দুঃখের পার্থক্য ছাড়া আর কোন স্বাভাবিক পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে মানুষের কোন কর্ম্মকেই কি আমরা অপরাধের কোটায় ফেলিতে পারি?—যদি ফেলি, তাহা হইলে কি তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না? কিন্তু আসলে যাহা ভালও নহে, মন্দও নহে—ব্যবস্থাপ্রণেতা কতকগুলি মনুষ্য তাহাকেই অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের এই ঘোষণা নিতান্তই একটা খামখেয়ালী ব্যাপার—সুতরাং সেই দণ্ডার্হ ব্যক্তির হৃদয়ে কোন প্রতিধ্বনি হইল না। সে ইহার ন্যায্যতা অনুভব করিতে পারিল না। কারণ সে যে কাজ করিয়াছে আসলে তাহার মধ্যে ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই। তাই যে কাজ যদৃচ্ছাক্রমে অপরাধ বলিয়া পরিঘোষিত হইয়াছে, সেই কাজ করিয়া তাহার অনুতাপও হইল না। জল্লাদ হদ্দ এইটুকু তাহার নিকট সপ্রমান করিবে যে, সে তাহার কার্য্যে সফল হয় নাই, কিন্তু সে যে অন্যায় কাজ করিয়াছে একথা জল্লাদ কখনই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। কেননা তাহার কাজের মধ্যে ন্যায় অন্যায় কিছুই নাই। জল্লাদ তাহাকে বধ করিল, কি জন্য তাহাকে বধ করিল, বধ্য ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিল না। মৃত্যুদণ্ডই হউক, আর যে কোন দণ্ডই হোক, যদি শুধু আঘাতকে দমন করাই তাহার উদ্দেশ্য না হয়—যদি তাহার উদ্দেশ্য তাহা ছাড়া আর কিছু হয়, তাহা হইলে তাহার মূলে নিয়ম

নিখিত কয়েকটি তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাওয়া যথাঃ—১ম—ভাল ও মন্দের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, একটা স্বরূপ-গত পার্থক্য বিদ্যমান, এবং এই পার্থক্য থাকাতেই, বুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব মাত্রই মঙ্গলের পথে ও ন্যায়ের পথ চলিতে বাধ্য। ২য়—এই মনুষ্য বুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, মনুষ্য এই পার্থক্য ও এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে,—এবং কৃত্রিম আইন কানুনের অপেক্ষা না করিয়া আপন ইচ্ছায় স্বাভাবিকভাবে উহাতে অনুরক্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ; তাছাড়া, যে সকল প্রলোভনের প্ররোচনায় মনুষ্য, মন্দের পথে, অন্যায়ের পথে নীত হয়, সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিবার শক্তি—এবং পবিত্র ও স্বাভাবিক ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিবার শক্তিও মনুষ্যের আছে। ৩য়—যে কোন আচরণ ন্যায়ের বিরোধী তাহা বলের দ্বারা দমন-যোগ্য, এবং প্রতিবিধানকল্পে তাহা দণ্ডনীয়, তজ্জন্য কৃত্রিম কোন আইন কানুনের অপেক্ষা রাখে না। ৪র্থ—মনুষ্য, ন্যায় অন্যায়ের মত পাপ পুণ্যেরও পার্থক্য বুঝে, এবং ইহাও বুঝে যে, কোন অন্যায় কর্ম্মের জন্য দণ্ডবিধান করাও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুগত কার্য্য।

বিচার করিবার শক্তি, দণ্ড বিধানের শক্তি—ইহাই সমাজের ভিত্তি-মূল; ইহাই প্রকৃত সমাজ। সমাজ, স্বকীয় ব্যবহারের জন্য এই সকল নিয়ম, এই সকল মূলসূত্র রচনা করে নাই। এই সকল নিয়ম সমাজ-গঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী; মন ও আত্মার প্রথম সূত্রপাত হইতেই উহারা রহিয়াছে, সমাজের সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থা উহাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন মূলতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই সামাজিক নিয়মের বৈধতা সম্পাদিত হইয়াছে। শিক্ষা এই সকল নীতিসূত্রকে পরিপুষ্ট করে,—সৃষ্টি করে না।

ব্যবস্থাকর্ত্তা যিনি আইন প্রস্তুত করেন, বিচারকর্ত্তা যিনি এই আইনের প্রয়োগ করেন,—ইঁহারা এই সকল নৈতিক মূলসূত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়েন। যে অপরাধী বিচারের জন্য বিচারালয়ে আনীত হয়, তাহার সম্মুখেও এই সকল মূলসূত্র বিদ্যমান, বিচারকর্ত্তাও এই মূলসূত্র অনুসারেই দণ্ড বিধান করেন। এই মূল সূত্রগুলি উঠাইয়া লও—সমস্ত ন্যায়-বিচার বিধ্বস্ত হইবে, এই বিচারকার্য্য কতকগুলা কৃত্রিম নিয়মে পরিণত হইবে; সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কাহারও অনুতাপ হইবে না; কেবল দণ্ডের ভয়েই লোকে এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বিরত হইবে। এই সকল নিয়ম-অনুসারে যে বিচার হইবে, তাহা বিচার নহে,—তাহা অত্যাচার। কর্ত্তব্য ও ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সমাজ বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্র হইয়া পড়িবে; ছলে বলে কৌশলে যে যত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা হইবে—এবং সমস্তের উপর আইনের একটা কপট আবরণ মাত্র থাকিবে মাত্র। অবশ্য সমাজ ও মানুষের বিচারকার্য্যে এখনও অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, কালক্রমে তাহা প্রকাশ পাইয়া সংশোধিত হইবে। কিন্তু এ কথা, সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, সমাজ ও মনুষ্যের বিচার-কার্য্য সত্যের উপর ও স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রমাণ, সর্ব্বত্রই সমাজ গঠিত হইয়াছে ও সমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে। তাছাড়া, প্যাস্‌কাল কিংবা রুসো সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যতই বিষাদময় বর্ণে অঙ্কিত করুন না, এ অবস্থা চিরস্থায়ী নহে। প্রত্যক্ষই সব নহে; প্রত্যক্ষ ব্যাপার ছাড়া আরও কিছু আছে,—একটা ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ আছে। ন্যায়ধর্ম্মের যদি একটা বাস্তবিক আদর্শ থাকে, তাহা হইলে সেই আদর্শই দুবি

সমাজ-প্রণালীকে উল্টাইয়া দিবে—মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। এই ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ কি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক? প্রত্যেক দেশের ভাষাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধিকে, সমস্ত মানব-জাতিকে আমি সাক্ষী মানিতেছি, প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও ন্যায়ের আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বলিয়া সকলেই কি স্বীকার করে না? কখন কখন বর্ত্তমান অবস্থা, ন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং ন্যায়ের আদর্শও বর্ত্তমান অবস্থাকে শাসন করে,—বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে প্রতিবাদ করে। মনুষ্যসমাজে কোন্ কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শুনা যায়? ন্যায়ের কথাই কি বেশী শুনা যায় না? এমন কোন্ ভাষা আছে যাহাতে ন্যায়শব্দটি নাই? এমন কি, কেহ কেহ ন্যায়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—এক আইন-ঘটিত কৃত্রিম ন্যায়, আর একটি স্বাভাবিক ন্যায়। ন্যায় কখনই বলের পদানত হইতে পারে না, বলই ন্যায়ের সেবায় নিযুক্ত হইবে, ইহাই সর্ব্বত্র পরিঘোষিত হইয়া থাকে। যখনই অতীতের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, কিংবা কোন দেশে প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ন্যায়ের উপর বলের জয় হইয়াছে, তখনই নিঃস্বার্থ পাঠক কিংবা দর্শকের মনে তীব্র ধিক্কার উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যে পতাকার গায়ে ন্যায় এই শব্দটি অঙ্কিত থাকে, আমাদের অনুরাগ স্বভাবতই সেই পতাকার দিকেই ধাবিত হয়; সেই অজ্ঞাত পক্ষের ন্যায্য অধিকার সমর্থন করিবার জন্যই আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হই, ন্যায়ের পক্ষকেই আমরা সমস্ত মানবমণ্ডলীর পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা মনে করি, যতোধর্ম্ম স্ততোজয়। অতএব যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই সব নহে,—ন্যায়ের ভাব, ন্যায়ের বিশ্বজনীন আদর্শ,—প্রত্যক্ষ জগতে না হউক,—চিন্তা কল্পনার জগতে জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এই

ন্যায়ের আদর্শই প্রত্যক্ষ জগৎকে সংশোধিত করে—পরিশাসিত করে।

এই ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধিকে যখন আমরা সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া কল্পনা করি, তখনই উহা সহজ জ্ঞান কিংবা সাধারণ বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সাধারণ সহজবুদ্ধিই সমস্ত দেশের ভাষাকে, স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসগুলিকে, সমাজকে ও সমাজের মুখ্য ব্যবস্থাগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে, ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ক্রমশ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিতেছে। ভাষাসমূহকে বৈয়াকরণেরা, সমাজকে ব্যবস্থাকর্ত্তারা, কিংবা সাধারণ বিশ্বাসগুলিকে দার্শনিকেরা গড়িয়া তুলে নাই। উহাদিগকে কেহই গড়িয়া তুলে নাই—অথচ এক হিসাবে সকলেই গড়িয়া তুলিয়াছে; সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর স্বাভাবিক প্রতিভাই উহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধির নিদর্শন, মানুষের তাবৎ কার্য্যেই প্রকাশ পায়। ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্য ও স্বার্থ, শ্রেয় ও প্রেয়—এই সমস্ত পার্থক্য সমস্ত মানব-ভাষার মধ্যে, সমস্ত মানব-ব্যবস্থার মধ্যেই বদ্ধমূল। ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ, পাপের দণ্ড দুঃখভোগ—ইহাও সকল ভাষাতে, মানুষের সকল ব্যবস্থাতেই মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত ধারণা, মানুষের ভাষায় ও মানুষের কাজে একটু বিশৃঙ্খলভাবে ও একটু স্থূলভাবে প্রকাশ পায়।

এইখানেই দর্শনশাস্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়। দর্শনশাস্ত্রের সম্মুখে দুইটি পথ প্রসারিত। দর্শনশাস্ত্রকে এই দুই পথের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিতে হইবে; হয়—সাধারণ ধর্ম্মবুদ্ধির ধারণাগুলিকে গ্রহণ করা, এবং মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাসগুলিকে যথাযথরূপে বিবৃত করিয়া উহাদিগকে পরিস্ফুট ও সুদৃঢ় করা; নয়,—কোন একটা মূল-

তত্ত্ব গোড়ায় মানিয়া লইয়া, তাহারই অনুরূপ একটা মতবাদ গঠন করা ;—যে সকল সাধারণ বিশ্বাস সেই মূলতত্ত্বের অনুযায়ী হইবে তাহাদিগকে স্বীকার করা এবং তাহার বিপরীতগুলিকে অস্বীকার করা—এইরূপে একটা দর্শনতন্ত্র কিংবা দর্শনের পদ্ধতিবিশেষ গড়িয়া তোলা।

কিন্তু আসলে, কোন দার্শনিক পদ্ধতিই দর্শন নহে ; যেমন রাজ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থাসমূহ, ন্যায়ের আদর্শকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, যেমন শিল্পকলাসমূহ, অসীম সৌন্দর্য্যের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, যেমন বিজ্ঞানসমূহ, বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের অনুসরণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক দার্শনিক পদ্ধতি কোন আদর্শবিশেষকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। সুতরাং দার্শনিক পদ্ধতিগুলার অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী ; এই অসম্পূর্ণতা না থাকিলে, জগতে একটি বই দুইটি দর্শনশাস্ত্র থাকিত না। তাহারাই ভাগ্যবান যাহারা দর্শনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এবং তৎপ্রযুক্ত কতকগুলি নিরীহ-ধরণের ভ্রমে পতিত হইয়াও, প্রত্যেক মানবের অন্তরে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পবিত্র রসাস্বাদনের একটা রুচি জন্মাইয়া দিতে পারে ! কিন্তু দার্শনিক পদ্ধতিগুলা প্রায়ই নিজ নিজ কালেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে,—কালকে নূতন পথে লইয়া যায় না। যে দর্শনতন্ত্র যে শতাব্দিতে উৎপন্ন হয়, সেই দর্শনতন্ত্র সেই শতাব্দির ভাব গ্রহণ করে। এই কালধর্ম্মের প্রভাবেই আমাদের দেশে স্বার্থমূলক নীতিতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই নীতিতন্ত্রের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় উপদেশ।

স্বার্থের নীতি।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, এমন-একটা নীতিতন্ত্রে অগত্যা উপনীত হইয়াছে যে নীতির মূলসূত্র স্বার্থ।

মানুষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে; মানুষ সুখের অন্বেষণ করে ও দুঃখ হইতে পলায়ন করে। ইহাই তাহার গোড়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তি কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সুখের বিষয় পরিবর্ত্তন হইতে পারে, নানাপ্রকারে সুখের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে পারে; কিন্তু কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক,—সুখ যে আকারই ধারণ করুক না কেন—মানুষ সতত সেই সুখেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

বিশেষ বিশেষ সুখজনক অনুভূতিসমূহ যখন সামান্যে পরিণত হয়, তখন উহা "উপযোগী" এই নাম ধারণ করে; যে সুখ শুধু অমুক অমুক ক্ষণে বদ্ধ নহে, পরন্তু কালের অনেকটা অংশ অধিকার করিয়া থাকে,—সে যে প্রকার সুখই হউক না কেন—তাহারই বিপুল সমষ্টিকে আনন্দ বলে।

সুখ ও আনন্দ যে ব্যক্তি অনুভব করে, সেই অনুভবকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সুখ ও আনন্দ আপেক্ষিক; ইহা আসলে ব্যক্তিগত। সুখ ও আনন্দকে ভালবাসিয়া আমরা নিজেকেই ভালবাসি।

সকল জিনিসের মধ্যেই এই সুখ ও আনন্দ অন্বেষণ করিবার উদ্দেশে আমরা যাহার দ্বারা পরিচালিত হই তাহাই স্বার্থ।

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যেরূপ আনন্দ, আমাদের সমস্ত কাজের একমাত্র প্রবর্ত্তক সেইরূপ স্বার্থ।

নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষ আর কিছুই অনুভব করে না, কিন্তু প্রকৃত স্বার্থ মানুষ কখন ঠিক বুঝে, কখন ঠিক বুঝে না। সুখী হইবার একটা বিশেষ কলাকৌশল আছে। সুখের মধ্যে কোন দুঃখ প্রচ্ছন্ন আছে কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া, জীবন-পথে কোন সুখ আসিলেই যেন আমরা তাহাকে আলিঙ্গন না করি। বর্ত্তমান সুখই সব নহে। ভবিষ্যৎ চিন্তাও আবশ্যক; যে ভোগ-সুখ পরিতাপ আনয়ন করিতে পারে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; আনন্দের জন্য—অর্থাৎ যে সুখ অধিকতর স্থায়ী ও ততটা উন্মাদক নহে সেই উচ্চতর সুখের জন্য—এই নীচ সুখকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। শারীরিক সুখই একমাত্র সুখ নহে; ইহা ছাড়া অন্য সুখও আছে—যথা, মনের সুখ, মতের সুখ। জ্ঞানী ব্যক্তি, এক-জাতীয় সুখের দ্বারা অন্য জাতীয় সুখের তীব্রতা নষ্ট করেন।

উচ্চতর সুখের নীতিই স্বার্থের নীতি, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নীতি—সুখের স্থানে আনন্দকে, মনোজ্ঞের স্থানে উপযোগীকে, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগের স্থানে, পরিণামদর্শিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নীতি—ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্দ অস্বীকার করে না, পরন্তু নিজের ধরণে উহাদিগের ব্যাখ্যা করে। বিবেকদৃষ্টিতে যাহা আমাদের প্রকৃত স্বার্থ তাহাই মঙ্গল, তাহার বিপরীতই অমঙ্গল। যে জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রবৃত্তির আবেগকে প্রতিরোধ করিতে পারে, বাস্তবিক যাহা উপযোগী তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, এবং আনন্দের ধ্রুবপথ অনুসরণ করিতে পারে, সেই উচ্চতর জ্ঞানই ধর্ম্ম। ভ্রান্তচিত্ত ও

চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া যখন বিপদসঙ্কুল ক্ষণস্থায়ী সুখের নিকট আমরা আনন্দকে বলিদান দিই তখনই তাহা অধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ধর্ম্ম অধর্ম্মের পরিণামই পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার। বিবেকের পথ দিয়া যদি আমরা সুখকে অন্বেষণ না করি, তাহা হইলে, তাহার দণ্ডস্বরূপ আমরা সুখ হইতে বঞ্চিত হই। সাধারণের মতে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বার্থনীতি সেই সকল কর্ত্তব্যের একটিকেও ধ্বংস করিতে চাহে না; প্রকৃত স্বার্থনীতি বলে যে, ঐ সমস্ত আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থেরই অনুকূল, এবং সেই জন্যই উহা আমাদের কর্ত্তব্য। লোকের উপকার করা, নিজেরই হিত-সাধন করিবার ধ্রুব উপায়; এইরূপেই আমরা লোকের সমাদর, লোকের দয়া, লোকের সহানুভূতি অর্জ্জন করি। ইহা যেমন মনোরম, তেমনি উপযোগী। নিঃস্বার্থভাবেরও একটা গূঢ় অর্থ আছে।

সাধারণত লোকে এই শব্দটির যেরূপ অর্থ করে—অর্থাৎ প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন—অবশ্য সে অর্থে নিঃস্বার্থপরতা নিতান্তই একটা অসঙ্গত অমূলক কথা; তবে কি না, ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য বর্ত্তমান স্বার্থকে—উচ্চতর সূক্ষ্মতর সুখের জন্য, স্থূলতর হীনতর সুখকে বিসর্জ্জন করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে আমরা বুঝিতেই পারি না যে আমরা সুখের অন্বেষণ করিতেছি, এবং এইরূপ বুঝিবার দোষেই আমরা নিঃস্বার্থপরতারূপ এমন একটা আকাশকুসুমকে আমাদের মনোমধ্যে সৃষ্টি করি যাহা মানব প্রকৃতির অতীত ও একেবারেই দুর্ব্বোধ্য!

আমরা উপরে যে স্বার্থনীতির ব্যাখ্যা করিলাম, ভরসা করি তাহা অতিরঞ্জিত হয় নাই। আমরা বরং আর একটু বেশী দূর অগ্রসর

হইব। আমরা স্বীকার করি যে, এই নীতি অন্য নীতিতন্ত্রের আতিশয্য-প্রসূত একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। একবার সেই অত্যন্ত কঠোর স্টোয়িক নীতির কথা কিংবা সেই তাপস-নীতির কথা ভাবিয়া দেখ—যে নীতি চৈতন্যকে নিয়মিত না করিয়া চৈতন্যকে একেবারেই ধ্বংস করিতে বলে এবং রিপুর আবেগ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য, সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই বিসর্জ্জন করিতে বলে—এক-প্রকার আত্মহত্যা করিতে বলে। এই দুই নীতির প্রতিবাদ-স্বরূপ এই স্বার্থনীতির বৈধতা কতকটা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এপিক্‌টেটাসের উচ্চতর দাসত্বের জন্য—দুঃখ দুর্দ্দশা অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিবার জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। অথবা মঠ-নিবাসী দেবপ্রকৃতি প্যাস্‌কাল ও তাঁহার ভগিনী যেরূপ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকে আহ্বান করিতেন এবং কঠোর তপশ্চারণ ও মূক আরাধনার দ্বারা মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনিতেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের প্রবৃত্তি-সকল অকারণে হয় নাই, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। বায়ুর অভাবে তরী চলিতে পারে না, উহা শীঘ্রই রসাতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এমন কোন ব্যক্তিকে কল্পনা কর যাহার আত্মপ্রীতি নাই, যাহার আত্মসংরক্ষণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই, যাহার কষ্টের ভয় নাই, বিশেষতঃ যাহার মৃত্যুভয় নাই, সুখ কিংবা আনন্দ-রসাস্বাদনের যাহার রুচি নাই, এক কথায়, ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ হইতে যে বঞ্চিত। এরূপ ব্যক্তি, তাহার চারিদিকে যে সকল অসংখ্য ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে—তাহার সহিত দীর্ঘকাল যুঝাযুঝি করিতে পারে না—তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; সে ব্যক্তি একদিনও

পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায়, কোন একটি পরিবার, কিংবা কোন একটি ক্ষুদ্র সমাজ সংগঠিত কিংবা সংরক্ষিত হইতে পারে না। যিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই মানুষকে শুধু ধর্ম্মের হাতে, দয়ার হাতে, মহত্ত্বের হাতে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি মানবজাতির বিকাশ ও স্থায়িত্বকে অপেক্ষাকৃত একটা সামান্য অথচ ধ্রুব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মনুষ্যকে আত্মপ্রীতি দিয়াছেন, আত্মরক্ষণের প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সুখ ও আনন্দ-রসাস্বাদনের রুচি দিয়াছেন, জলন্ত প্রবৃত্তিসমূহ দিয়াছেন, আশা ও ভয় দিয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন, উচ্চাভিলাষ দিয়াছেন, অবশেষে সেই ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি দিয়াছেন যাহা সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যাহা স্থায়ী, যাহা বিশ্বজনীন, যাহা, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য নিয়তই আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

অতএব, স্বার্থনীতির মধ্যে যে মূলতত্ত্বটুকু আছে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা প্রতিবাদ করি না; এই মূলতত্ত্বটি খুবই সত্য, উহার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। আমরা শুধু এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি:—স্বীকার করি, স্বার্থনীতির অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বটি আসলে সত্য, কিন্তু উহা ছাড়া আর কি কোন মূলতত্ত্ব নাই যাহা উহারই মত সত্য, উহারই মত বৈধ? সত্যবটে মানুষ প্রেমের অন্বেষণ করে, সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু মানুষের অন্তরে কি আর কোন অভাববোধ নাই—আর কোন হৃদয়ভাব নাই যাহা উহাদেরই মত প্রবল, উহাদেরই মত জলন্ত?

আমাদের দেহ ও আত্মা যেমন একত্রই অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ এই মানবজাতির মধ্যে, বিশ্ববিধাতার এই গভীর রহস্যময়

সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে, এমন কতকগুলি বিভিন্ন মূলতত্ত্ব একত্র অবস্থিত—যাহারা পরস্পরকে কখনই বহিষ্কৃত করে না।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র অবিরত প্রত্যক্ষ পরীক্ষারই দোহাই দিয়া থাকে। প্রত্যক্ষকে আমরাও সাক্ষী মানিয়া থাকি; আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইতেই গৃহীত—সেইগুলি সহজ জ্ঞানের গোড়ার ধারণা। যে সকল তথ্যের উপর স্বার্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল তথ্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু স্বার্থনীতির পদ্ধতিটা আমরা স্বীকার করি না। যথা-পরিমাণে দেখিলে, তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ঐ নীতিপদ্ধতি, ঐ তথ্যগুলির প্রভাব-পরিসর অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাই উহা মিথ্যা; উহাদেরই মত অবিসম্বাদিত আরও যে অন্যান্য তথ্য আছে তাহা ঐ নীতিতন্ত্র অস্বীকার করে বলিয়াই উহাকে আমরা মিথ্যা বলি।

প্রকৃত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা এবং তাহাদের মধ্যে যদি কোন বাস্তবিক পার্থক্য থাকে তাহা স্বীকার করা—ইহাই প্রকৃতিস্থ দর্শনশাস্ত্রের গোড়ার নিয়ম। এই দর্শন-শাস্ত্র, সর্ব্বাগ্রে সত্যের অনুসরণ করে—ঐক্যের অনুসরণ করে না। সত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাক্, স্বার্থনীতি সত্যকে অঙ্গহীন করিয়া ফেলে; উহা তথ্যসমূহের মধ্য হইতে সেই সকল তথ্যকেই নির্ব্বাচন করে যাহা স্বার্থনীতির উপযোগী, এবং যে সকল তথ্য আসলে ধর্ম্মনীতির মূল-উপাদান, ঠিক সেই সব তথ্যকেই উহা অগ্রাহ্য করে। এই একদেশদর্শী পর-মত-অসহিষ্ণু নীতি,—যাহা-কিছুর হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারে না, ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহারই অস্তিত্ব অস্বীকার করে। রচনার হিসাবে দেখিলে, এই নীতিতন্ত্রের মধ্যে

বেশ একটি বাঁধুনি আছে, কিন্তু মানবপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তির সহিত যখন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখনই ইহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

আমরা দেখাইব, ঐন্দ্রিয়িক দর্শনশাস্ত্র-প্রসূত এই স্বার্থনীতি, মানব-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রথমত আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি,—প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার শক্তিকে, কর্তৃত্ব শক্তিকে সমস্ত মানবজাতিই স্বীকার করে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই সকলে চাহে, এই স্বাধীনতা লোকসমাজেও সম্মানিত ও সংরক্ষিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে একটা জিনিস আছে ইহা প্রত্যেকেরই অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দেয়। নৈতিক অনুমোদন অননুমোদনের মধ্যে, সমাদর অবজ্ঞার মধ্যে, প্রশংসা ধিক্কারের মধ্যে, পাপ পুণ্যের মধ্যে, দণ্ড পুরস্কারের মধ্যে—সর্ব্বপ্রকার নৈতিক ব্যাপারের মধ্যে, এই স্বাধীনতার ভাব জড়িত রহিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই যে বিশ্বজনীন তথ্য যাহা মানবজাতির সমস্ত বিশ্বাসের মূলে অবস্থিত—যাহা,—কি গার্হস্থ্য কি সমাজিক—মানবের সমস্ত জীবনকে পরিশাসিত করে, এই তথ্যটিসম্বন্ধে ঐন্দ্রিয়িক দর্শন শাস্ত্র ও স্বার্থনীতি কি বলে?

যে কোন প্রকার নীতিতত্ত্ব হউক না, তাহাতে আচরণসংক্রান্ত নিয়মের কথাই থাক্ বা কেবলমাত্র সাদাসিধা উপদেশের কথাই থাক্, প্রকারান্তরে সকল নীতিতত্ত্বই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। যখন স্বার্থের নীতি, উপযোগীর নিকট মনোজ্ঞকে বলিদান করিতে উপদেশ দেয়, তখন মনে হয়, যেন একথাটাও মানিয়া লওয়া হয় যে, তাহার সেই উপদেশ অনুসরণ করায় কিংবা না করায় মানুষের স্বাধী-

মতা আছে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে কোন একটা তথ্য স্বীকার করিলেই হয় না, সেই তথ্য স্বীকার করিবার অধিকার থাকাও চাই। দেখা যায়, স্বার্থনীতির পক্ষপাতী অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে; যে নীতিতন্ত্র, সমস্ত মানব চিত্তকে—মানবের সমস্ত প্রবৃত্তি ও ধারণাকে, কেবল ইন্দ্রিয়বোধ ও ইন্দ্রিয়বোধের ব্যাপার-সকল হইতে টানিয়া বাহির করে, স্বাধীনতাকে স্বীকার করা সে নীতিতন্ত্রের অধিকারায়ত্ত নহে।

কোন একটা মনোজ্ঞ ইন্দ্রিয়বোধ যখন আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে, এবং মুগ্ধ করিয়া তাহার পর চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন আমাদের চিত্ত—একটা কষ্ট, একটা অভাব, একটা প্রয়োজন অনুভব করে, তখন চিত্ত বিচলিত হয়, ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতা প্রথমে অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্টভাবে থাকে, একটু পরেই একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে; যে বিষয়কে পাইয়া একটু পূর্ব্বে আমরা সুখানুভব করিয়াছিলাম, এবং যাহার অভাবে এখন কষ্ট পাইতেছি, আমাদের ব্যাকুলতা সেই বিষয়ের প্রতি তখন ধাবিত হয়। তীব্রতার মাত্রা কিছু কমই হোক্, বেশীই হোক্—চিত্তের এই চাঞ্চল্যই বাসনা।

এই বাসনাতে স্বাধীনতার কি কোন লক্ষণ আছে? স্বাধীনতা কাহাকে বলে? যখন আমি জানি, আমি আমার কার্য্যের কর্ত্তা; আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি, রহিত করিতে পারি, কিংবা সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকিতে পারি, তখনই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করি। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যখন সেই কার্য্য করিব বলিয়া সঙ্কল্প করি, তখন ইহাও বেশ জানি, উহার বিপরীত সঙ্কল্প করিতেও আমি সমর্থ; এবং তখনই আমরা স্বাধীনতা অনুভব করি।

যখন আমার আত্ম-চৈতন্য অব্যর্থরূপে সাক্ষ্য দেয়,—আমিই এই কাজের কর্ত্তা, তখনই সেই কাজ স্বাধীন কাজ এবং তখনই সেই কাজের জন্য আপনাকে দায়ী বলিয়া অনুভব করি। আমাতে অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, এবং এই সকল ক্রিয়া বহির্দর্শকের চক্ষে আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ বলিয়া ভুল হইতেও পারে; কিন্তু আমার নিজের কখনই ভুল হইতে পারে না;—সাক্ষী-চৈতন্যের নিকট ভুল হওয়া অসম্ভব। যে কোন কাজই হউক না, কোন্ কাজটা স্বেচ্ছাকৃত এবং কোন্ কাজটা স্বেচ্ছাকৃত নহে, আমাদের সাক্ষীচৈতন্য তাহার পার্থক্য বেশ উপলব্ধি করিতে পারে।

যে চেষ্টা স্বেচ্ছাকৃত ও স্বাধীন তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। বাসনা ইহার ঠিক বিপরীত। বাসনা যখন চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করে তখনই উহা প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হয়; আমাদের ভাষা ও আত্ম-চৈতন্য উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রবৃত্তির অধীনে মানুষ অকর্ত্তা; প্রকৃতি যতই প্রবল হয়, উহার বেগ যতই দুর্দ্দমনীয় হয়, ততই আত্মার যে নিজস্ব কার্য্যশক্তি আছে—আত্মশাসনী শক্তি আছে—সেই আদর্শ হইতে মানুষ দূরে পড়িয়া যায়।

যে ইন্দ্রিয়বোধ বাসনার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বাসনাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করে, বাসনার ন্যায় সেই ইন্দ্রিয়বোধেরও বশে, আমরা পরাধীন। যদি কোন প্রীতিজনক বস্তু আমার সম্মুখে স্থাপিত হয়, আমার কি সুখবোধ হইবে না? যদি কোন কষ্টকর জিনিষ আমার সম্মুখে আসে,—আমার কি কষ্ট হইবে না? ঐ সুখকর প্রত্যক্ষ অনুভূতি অন্তর্হিত হইলেও, স্মৃতি ও কল্পনার পথে যখন উহা আবার উদয় হয়, তখন উহা পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি আমার কষ্ট হয় না? উহার অভাব ও প্রয়োজন কি আমি অনুভব

করি না? যে বস্তুকে পাইলেই আমার ব্যাকুলতার শান্তি হয়, আমার মনের কষ্ট দূর হয়, সেই বস্তুর প্রতি আমার বাসনা কি ধাবিত হয় না?

বাসনার উদয়ে মনোমধ্যে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, একবার প্রাণিধান করিয়া দেখ:—তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার চিন্তার অপেক্ষা না রাখিয়া, তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া, সেই বাসনা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাড়িতেছে কমিতেছে। তোমার ইচ্ছায়, বাসনার উদয়ও হইতেছে না, নিবৃত্তিও হইতেছে না।

অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা বাসনার সহিত যুদ্ধ করে এবং অনেক সময় যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহার বশীভূত হয়। যে সকল বহির্বিষয় হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, সেই বহির্বিষয়কে আমরা দোষ দিই না, এবং ঐ ইন্দ্রিয়বোধ হইতে যে বাসনা উৎপন্ন হয় সে বাসনাকেও দোষ দিই না, অমরা শুধু দোষ দিই সেই ইচ্ছাকে,—যার সম্মতিতে বাসনার উদয় হইয়াছে, এবং দোষ দিই সেই সকল কার্য্যকে যাহা, বাসনা হইতে প্রসূত হইয়াছে; কেন না ঐ সকল কার্য্য আমাদের নিজ আয়ত্তের মধ্যে।

ইচ্ছা ও বাসনা এক নহে; অনেক সময় বাসনা, ইচ্ছাশক্তির বিলোপ করে, এবং মানুষের দ্বারা এমন সকল কাজ করাইয়া লয় যাহা মানুষ সে সমস্ত আপনার কাজ বলিয়া মনে করিতে পারে না, কারণ সে কাজ তাহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। এমন কি, আদালতে অনেক অপরাধের আসামী এই ওজরের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রচণ্ড বাসনা ও দুর্নিবার প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ করিয়াছে, এই কাজে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না—এই বলিয়া তাহারা নিজ দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করে।

যদি বাসনাই ইচ্ছার মূল-ভিত্তি হইত, তাহা হইলে বাসনা যতই প্রবল হইত আমরা ততই স্বাধীন হইতাম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহার বিপরীতটাই সত্য। যে পরিমাণে বাসনার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে, মানুষের আত্মপ্রভুত্ব কমিয়া যায়, এবং যে পরিমাণে, বাসনা হীনবল হয় ও প্রবৃত্তি-অনল নির্ব্বাপিত হয়, সেই পরিমাণে, মানুষ আবার আপনার উপর প্রভুত্ব লাভ করে।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, বাসনার উপর আমাদের কোন প্রভুত্বই নাই। কোন দুই বস্তু ভিন্ন হইতে পারে, তাই বলিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে, সেই হেতু যে কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, এ কথা বলা যায় না। কতকগুলি পদার্থ আমাদের হইতে দূরে রাখিয়া, কিংবা সেই সকল পদার্থ আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে সেই সুখকে আমাদের চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়া, আমরা কিয়ৎপরিমাণে, ঐ সকল পদার্থের ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াকে অপসারিত করিতে পারি, এবং ঐ সকল পদার্থ আমাদের মনে যে বাসনার উদ্রেক করে সেই বাসনাকে এড়াইতে পারি। কতকগুলি পদার্থকে আমাদের চতুষ্পার্শে স্থাপন করিয়া, আমাদের অন্তরে কতকগুলি ইন্দ্রিয়-বোধ ও কতকগুলি বাসনার উদ্রেক করিতে পারি; তাই বলিয়া উহাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত বলা যায় না; আপনার উপর আপনি পাথর নিঃক্ষেপ করিয়া যে আঘাত-বোধ হয় সেই আঘাত-বোধটা যেমন স্বেচ্ছাকৃত নহে, ইহাও তেমনি। এই সকল বাসনার নিকট নতশির হইলে, উহাদের আরও বলবৃদ্ধি হয়, এবং উহাদিগকে প্রতিরোধ করিলে, উহাদের তেজ কমিয়া যায়। উপযুক্ত নিয়ম অবলম্বন করিলে আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও কতকটা আমাদের বশে আনিতে পারা যায়, এমন কি উহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেও কতকটা

রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায়। ইহাতে করিয়া সপ্রমাণ হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে ভিন্ন; বাসনাদির উপর ঐ শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব না থাকিলেও, কখন-কখন ঐ শক্তি উহাদের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব প্রকটিত করিয়া থাকে।

ইচ্ছা ও বুদ্ধি এক না হইলেও ইচ্ছা বুদ্ধিকে পরিচালিত করে। ইচ্ছা করা ও জানা—এই দুইটি ব্যাপার স্বরূপতঃ ভিন্ন। আমরা আমাদের ইচ্ছামত বিচার করি না, পরন্তু বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী নিয়ম-অনুসারে আমরা বিচার করি। সত্যের জ্ঞান ও ইচ্ছার সঙ্কল্প এক নহে। যেমন মনে কর,—ইচ্ছা এ কথা বলে না যে, পিণ্ডের বিস্তৃতি আছে, পিণ্ড আকাশে অবস্থিত, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে ইত্যাদি। তথাপি, আমাদের বুদ্ধির উপর আমাদের ইচ্ছার অনেকটা প্রভুত্ব আছে সন্দেহ নাই। আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, স্বাধীনভাবেই কার্য্য সম্পাদন করি, কতকগুলি বিষয়ের প্রতি, আমরা অল্প কিংবা অধিকক্ষণ, অল্প পরিমাণে কিংবা অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিই; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিকে যেমন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারে, তেমনি মন্দীভূত ও নির্ব্বাপিত করিতেও পারে। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের অন্তরে এমন একটি পরাশক্তি বিদ্যমান আছে যাহা কি বুদ্ধি, কি ইন্দ্রিয় চেতনা—আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করে, উহাদের সহিত মিশ্রিত হয়, উহাদিগকে পরিশাসিত করে, উহাদিগকে স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হইতে দেয়; ইচ্ছাশক্তির সহিত বিচ্ছেদ হইলে উহাদের আসল প্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেন না, যে মনুষ্য ইচ্ছাশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে স্বীকার করে যে, সে তার

আপনার প্রভু নহে, সে যেন সে-মানুষই নহে। আসল কথা, সেই মহতী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয়, এই ইচ্ছা-শক্তি এমন সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইলেও এই শক্তিকে লোকে অনেক সময় ভুল বোঝে। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক করিয়া ফেলিয়া একটা অদ্ভুত খিচুরী করিয়া তোলে। যাঁহারা এইরূপ খিচুরী পাকাইয়াছেন, তাহার মধ্যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দির বিপরীত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক—স্পিনোজা, মালব্রাঁশ্, কঁদিয়াক্ প্রভৃতিকেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় অতিমাত্র ধর্মভাব ও ভ্রান্ত ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্য হইতে মনুষ্যের নিজস্ব কর্তৃত্ব-শক্তি উঠাইয়া লইয়া, সমস্ত কর্তৃত্বশক্তি ঈশ্বরেতেই কেন্দ্রীভূত করে; এবং অপর সম্প্রদায়, সেই শক্তি প্রকৃতির উপর আরোপ করে। এক সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ ঈশ্বরেরই একটা প্রকার-ভেদমাত্র; অপর সম্প্রদায়ের মতে, মানুষ প্রকৃতিপ্রসূত একটি ফল মাত্র। বাসনাকে যদি একবার কর্তৃভাবের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই থাকে না, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। একটি দর্শনতন্ত্র, তেমন প্রণালীবদ্ধ না হইলেও, কতকগুলি তথ্যের অনুসরণ করিয়া, সহজ জ্ঞানের দ্বারা উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার শক্তি হইতে কর্তৃত্বহীন বাসনাকে পৃথক্ করিয়া, ঐ দর্শনতন্ত্র, যাহা মানুষের বিশেষ লক্ষণ, সেই প্রকৃত কর্তৃত্বশক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তিই কর্তৃপুরুষের প্রধান ধর্ম্ম ও অব্যর্থ লক্ষণ। যে পুরুষ ইচ্ছা করিতে পারে, নিজ ইচ্ছার দ্বারা কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে, আপনাকে সেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুভব করে, এবং সেই সকল কার্য্যের দায়িত্ব উপলব্ধি

করে, সে কেমন করিয়া অন্য এক পুরুষের প্রকার-ভেদ মাত্র হইবে? ঐ শক্তি সে অন্য এক সত্তা হইতে ধার করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিবে?

একটা কর্তৃত্বহীন মনোব্যাপার হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র যদি প্রকৃত কর্তৃশক্তির ব্যাখ্যা,—স্বেচ্ছাসাপেক্ষ স্বাধীন কর্তৃশক্তির ব্যাখ্যা করিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, ইহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ঐ দর্শনতন্ত্র হইতে প্রকৃত নীতিতত্ত্ব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না; কেন না, নীতি বলিলেই তাহার মূলে স্বাধীনতা আছে এইরূপ বুঝায়। কোন ব্যক্তির উপর আচরণের নিয়ম চাপাইতে হইলে দেখা আবশ্যক, সেই নিয়ম পালন কিংবা লঙ্ঘন করিবার তাহার সামর্থ্য আছে কি না। কোন কার্য্যের ভাল-মন্দ সেই কার্য্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু যে উদ্দেশে সেই কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার উপরেই নির্ভর করে। সুবিচারপরায়ণ আদালতের নিকট, অপরাধ উদ্দেশ্যেতেই বর্ত্তে, এবং সেই উদ্দেশ্যেরই সহিত দণ্ড সংযুক্ত। অতএব যেখানে স্বাধীনতা নাই, যেখানে বাসনা ও প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই, সেখানে নীতিতত্ত্বের ছায়াও থাকিতে পারে না। কিন্তু এসব কথা পাড়িয়া, আমরা ইন্দ্রিয়মূলক নীতিকে একেবারে অপসারিত করিতে চাহি না। ঐন্দ্রিয়িক নীতির যেটি মূলসূত্র, সেই মূলসূত্রটি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে সে মূলসূত্র হইতে ভালমন্দের ধারণা কিংবা তৎসংযুক্ত অন্য কোন নৈতিক ধারণা নিঃসৃত হইতে পারে না।

ঐন্দ্রিয়িক দর্শনের মতে,—উপযোগী কিংবা আবশ্যক ছাড়া মঙ্গল আর কিছুই নহে। মূলসূত্রের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া, মনো-

জ্ঞের স্থানে শুধ্ উপযোগীকে বসাইয়া, ঐন্দ্রিয়িকদর্শন অনেকগুলি আপত্তি খণ্ডন করিবার সুবিধা পাইয়াছে; কেননা, ঐ সম্প্রদায় এই কথা সর্ব্বদাই বলে, সুবিবেচিত স্বার্থ, আর আপাত-প্রতীয়মান ইতর স্বার্থের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে; কিন্তু আমরা দেখাইব,—এই মতবাদ, অপেক্ষাকৃত একটু মার্জ্জিত আকার ধারণ করিলেও ভাল-মন্দের পার্থক্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই।

যদি উপযোগিতা, কিংবা সুবিধাই ভাল কাজের একমাত্র মানদণ্ড হয়, তাহা হইলে কোন কাজ করিবার সময় সেই কাজে আমার কি লাভ হইতে পারে, শুধু এই বিষয়টির প্রতিই আমার দৃষ্টি রাখিতে হয়।

মনে কর, আমার একজন বন্ধু, যাহাকে আমি নিরপরাধী বলিয়া জানি, সে হঠাৎ রাজার, কিংবা লোকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইল—(লোক মতের উৎপীড়ন এক এক সময় রাজার উৎপীড়ন অপেক্ষাও বেশী); এই অবস্থায় আমার বন্ধুর বন্ধুত্ব রক্ষা করা আমার পক্ষে হয়ত বিপদ-জনক, কিংবা বন্ধুকে পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে লাভজনক। এক দিকে নিশ্চিত বিপদ, আর একদিকে অবার্থ লাভ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই স্থলে, হয় আমার দুর্ভাগ্য বন্ধুটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় স্বার্থের নীতিকে—সুবিবেচিত স্বার্থের নীতিকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

কিন্তু উহারা উত্তরে এই কথা বলিতে পারে, মানব ব্যাপারের অনিশ্চিততা ভাবিয়া দেখ; ভাবিয়া দেখ তুমিও একদিন এইরূপ বিপদে পড়িতে পার; যদি তোমার বন্ধুকে তুমি এখন পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার বিপৎকালেও তোমার বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন।

আমি এই উত্তর দিই :—প্রথমতঃ ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, বর্ত্তমানই সুনিশ্চিত। যদি কোন কার্য্যে আমার এখনি নিশ্চিত লাভ হয়, তবে ভাবী বিপদের শুধু সম্ভাবনা মনে করিয়া, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ লাভকে বিসর্জ্জন করা নিতান্ত অসঙ্গত। তা'ছাড়া আমার বিবেচনায়, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাগুলিই আমার অনুকূলে।

লোকমতের কথা আমার নিকট বলিও না। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত নীতিসূত্র হয়, তবে লোকমতও আমার অনুকূলে হওয়া উচিত। যদি লোকমত আমার বিরুদ্ধে হয়, তাহাহইলে উক্ত নীতিসূত্রের সত্যতার সম্বন্ধে উহাই ত একটা আপত্তির কথা; কারণ, যে নীতিসূত্রটি সত্য, যাহা ন্যায্যরূপে মানব-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা কেমন করিয়া লোকসাধারণের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ হইবে?

অনুতাপের আপত্তিও উত্থাপন করিও না। যদি স্বার্থ-নীতি সত্য হয়, তবে সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া আমার কি কখন অনুতাপ হইতে পারে? বরং তাহাতে আমি আত্মপ্রসাদই অনুভব করিব।

এখন বাকী রহিল পারত্রিক দণ্ড-পুরস্কারের কথা। কিন্তু যে দর্শনতন্ত্রে, মানব-জ্ঞান শুধু রূপান্তরিত ইন্দ্রিয়বোধের সীমার মধ্যেই বদ্ধ, সে দর্শনতন্ত্রে পরলোকের বিশ্বাস কিরূপে স্থান পাইবে?

অতএব দেখা যাইতেছে, আমার বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার পক্ষে আমার কোন প্রয়োজনই নাই—কোন কার্য্যপ্রবর্ত্তক হেতুই নাই। অথচ, সমস্ত মানব-মণ্ডলই এই বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে চাপাইতেছে; আমি যদি ঐ বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে না পারি, আমি লোকের নিকট অবমানিত হইব।

যদি সুখই আমাদের চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শুধু কাজে ভাল-মন্দ বর্ত্তায় না, উহার ভালমন্দ পরিণামে; উহার সুখজনক, কিংবা দুঃখজনক পরিণামের উপর ভালমন্দ নির্ভর করে।

কোন এক ব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে দেখিয়া ফঁটেনেল্ বলিয়াছিলেন :—"ঐ লোকটার গণনায় ভুল হইয়া গিয়াছে।" এই যুক্তি অনুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়—ঐ ব্যক্তি ঐ কাজ করিয়াও যদি কোন প্রকারে মৃত্যুদণ্ডকে এড়াইতে পারিত, তাহা হইলে উহার গণনা ঠিকই হইয়াছে বলা যাইতে পারিত; এবং তাহা হইলে তাহার আচরণও প্রশংসনীয় হইত। তবেই দাঁড়াইতেছে, ঘটনা অনুসারেই কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ; আসলে কোন কাজ ভাল, কিংবা মন্দ নহে।

সততা যদি উপযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই না হয়, তাহা হইলে ফলাফল গণনার প্রতিভাই বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা; শুধু বিজ্ঞতা কেন—উহাই ধর্ম্ম! কিন্তু এই প্রতিভা সকলের আয়ত্তের মধ্যে নহে। প্রতিভার জন্য—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা চাই, পর্য্যবেক্ষণের এমন একটা ধ্রুব শক্তি চাই, যাহাতে করিয়া কার্য্যের সমস্ত ফলাফল এক নজরেই উপলব্ধি হইতে পারে; এমন সতেজ ও বিশাল মস্তিষ্ক থাকা চাই, যাহাতে করিয়া সমস্ত সম্ভাবনাগুলি গণনার মধ্যে আনিয়া, তাহা ঠিকমত ওজন করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন অজ্ঞ যুবক, ভাল-মন্দের পার্থক্য, সৎ-অসতের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে না। মানবব্যাপারসমূহ এরূপ তমসাচ্ছন্ন যে, খুব দূরদৃষ্টি থাকিলেও, অনপেক্ষিত অভূতপূর্ব্ব ঘটনার হাত হইতে এড়ান দুষ্কর! বস্তুতঃ, "সুবিবেচিত" স্বার্থের নীতিতত্ত্বের মধ্যে, সততার শিক্ষার জন্য, একটা বিরাট্ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবশ্যক; কিন্তু সচরাচর সৎকার্য্যের জন্য এরূপ

বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সৎকার্য্যের বীজমন্ত্র :—"উচিত কাজ ত করি, তার পর যা হ'বার তা' হবে।" কিন্তু এই বীজমন্ত্রটি, স্বার্থনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একমাত্র স্বার্থই যদি যুক্তির অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে নিঃস্বার্থপরতা একটা মিথ্যা কথা, একটা প্রলাপবাক্য, মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

তথাপি সমস্ত মানবমণ্ডলী নিঃস্বার্থপরতার কথা বলিয়া থাকে, এবং নিস্বার্থপরতার অর্থ তাহারা এরূপ বুঝে না যে,—স্থায়ী সুখের জন্যই, ধ্রুব সুখের জন্যই, কোন সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে হইবে। এ কেহ বিশ্বাস করে না যে, কোন উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রকারের সুখের আকাঙ্ক্ষাই নিঃস্বার্থপরতা। যে কোন প্রকার স্বার্থই হউক, স্বার্থ-বিবর্জ্জিত কোন মহৎ উদ্দেশ্যের নিকট স্বার্থকে বলিদান করাকেই নিঃস্বার্থপরতা বলে; সমস্ত মানবমণ্ডলী এইরূপ ভাবকেই নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া শুধু বুঝে তাহা নহে, এইরূপ নিস্বার্থপরতা মানবসমাজে বাস্তবিকই আছে বলিয়া বিশ্বাস করে; আরও বিশ্বাস করে যে, এইরূপ নিঃস্বার্থভাবের কাজ করিতে মানব-আত্মা সমর্থ। মহাত্মা Regulus আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর শত্রুদের দেশে গিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে থাকিয়া—আপনার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, বেশ মানমর্য্যাদার সহিত সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে কোন স্বার্থের ভাব দেখা যায় না; তাই লোকে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁহাকে এত ভক্তি করে।

কিন্তু কেহ কেহ বলিবেন, তা' কেন—প্রচণ্ড যশো-লিপ্সাই

রেগুলাস্‌কে ঐরূপ কাজে উত্তেজিত করিয়াছিল; অতএব ঐ পুরাতন রোমকের কাজে যাহা বীরত্ব বলিয়া আপাতত প্রতীয়মান হয়, তাহা আসলে একপ্রকার স্বার্থপরতা। যদি মনে কর, ঐরূপ ভাবের স্বার্থবুদ্ধি যার-পর নাই অসঙ্গত ও হাস্যজনক—যদি মনে কর, বীরেরা নিতান্তই স্বার্থপর এবং তাহাদের এই স্বার্থপরতা অবিবেচনামূলক, ও ফলাফল-জ্ঞানশূন্য, তাহা হইলে Regulus-এর, Assas কিংবা Saint Vincent De Paul-এর প্রস্তর-প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া উহাদিগকে বাতুলাশ্রমে পাঠানোই শ্রেয়! সেখানকার কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিলে, উহাদের উদারতা, বদান্যতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে, উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে—উহারা আবার প্রকৃতিস্থ হইবে;—উহারা সেই সব লোকের মত হইবে, যাহারা শুধু আপনার কথাই ভাবে, যাহারা স্বার্থ ছাড়া আর কোন নীতি বুঝে না!

যদি নিজের কোন স্বাধীনতা না থাকে, ভাল-মন্দের মধ্যে যদি স্বরূপত কোনো পার্থক্য না থাকে, স্বার্থই যদি আমাদের জীবনের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, তাহা হইলে আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই থাকে না।

প্রথমত: স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কর্ত্তব্যতা বলিলেই বুঝায়—এমন কোন জীব আছে যে কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ; স্বাধীন জীব ছাড়া কর্ত্তব্য-শব্দ আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। তাহার পর, কর্ত্তব্যতার প্রকৃতিই এইরূপ, যদি আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটি হয়,—আমরা আপনাকে অপরাধী বলিয়া অনুভব করি; পক্ষান্তরে, যদি আমাদের স্বার্থ ঠিক্ না বুঝি—যদি ভুল করিয়া বুঝি,—তাহার ফল শুধু এই মাত্র হয়—আমরা দুর্দশাগ্রস্ত

হই। তবে কি, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া, ও অপরাধী হওয়া একই জিনিস? এই দুইটি ধারণা মূলতঃ বিভিন্ন। তুমি আমাকে পরামর্শচ্ছলে বলিতে পার "তোমার স্বার্থ যদি তুমি ঠিক্ না বোঝো, তাহা হইলে তুমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে; কিন্তু তুমি এরূপ উপদেশ দিতে পার না—"তোমার স্বার্থ ঠিক্ না বুঝিলে তুমি অপরাধী হইবে।"

অপরিণামদর্শিতাকে কেহ কখন অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করে না। নৈতিক হিসাবে যখন উহার কেহ দোষ দেয়, তখন হৃদ এই কথা বলে, উহাতে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়।

অতএব, প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করা অনেক সময় অতীব দুরূহ; কিন্তু যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা সকল সময়েই প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। প্রবৃত্তি ও বাসনা উহার সহিত যতই যুদ্ধ করুক না কেন, মিথ্যা-যুক্তি যতই কুতর্ক আনুক না কেন, বিবেকবুদ্ধির স্বাভাবিক সংস্কার, অন্তরাত্মার গূঢ় বাণী, স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রজ্ঞার উপদেশ—ঐ সমস্ত কুতর্কজালকে বিদূরিত করিয়া, কর্ত্তব্যতাকে প্রকাশ করে।

স্বার্থের উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন,—উহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে—উহার সহিত একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে।—অসংখ্য প্রকারে সুখী হওয়া যাইতে পারে। তুমি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছ, এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে আমি ধনশালী হইব। তাহা সত্য; কিন্তু আমি ধন-ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শান্তি ভালবাসি। শুধু সুখের হিসাবে দেখিতে গেলে, আলস্য অপেক্ষা কর্ম্মচেষ্টা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা যায় না। কাহাকেও স্বার্থসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যেমন কঠিন, এমন আর কিছুই না;—পক্ষান্তরে সততা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ।

যাই বল না কেন, অবশেষে, উপযোগিতা, কার্য্যতঃ মনোজ্ঞতাতেই পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ সুখেচ্ছাতেই পরিণত হইতেছে। এখন, সুখের কথা যদি ধর,—উহা মনের ক্ষণিক ভাবের উপর, লোকবিশেষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি ভালমন্দের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ না থাকে, তবে উচ্চতর সুখ ও নিম্নতর সুখ বলিয়া সুখের মধ্যেও কোন তারতম্য থাকিতে পারে না; এমন কোন সুখের সামগ্রী নাই, যাহা আমাদিগকে অল্প-বিস্তর সুখী না করে। আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিই এইরূপ। এইজন্যই স্বার্থ-বুদ্ধি এরূপ খামখেয়ালী। যেটা যা'র ভাল লাগে, তাই তা'র স্বার্থ; কেন না, যেটা যা'র ভাল লাগে, তা'র বিবেচনায় সেইটিই তা'র স্বার্থ বলিয়া মনে হয়। একজন ইন্দ্রিয়-সুখে বেশী মুগ্ধ হয়, আর একজন মনের সুখে,—হৃদয়ের সুখে বেশী মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়-সুখের স্থানে যশঃস্পৃহা আসিয়া কাহারও চিত্ত অধিকার করে; কাহারও নিকট প্রভুত্বস্পৃহা, যশঃস্পৃহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই একএকটা বিশেষ প্রকৃতির অধীন; অতএব প্রত্যেকেই একটা বিশেষ ধরণে আপনার স্বার্থ বুঝিয়া থাকে; তা' ছাড়া, আমার আজিকার যে স্বার্থ, তাহা কালিকার স্বার্থ না হইতেও পারে।

স্বাস্থ্যের তারতম্যে, বয়সের প্রভাবে, ঘটনার পরিবর্ত্তনে, আমাদের রুচি ও মেজাজেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। আমরা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাসনা ও স্বার্থও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের অবশ্যতা সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিলে, এমন একটা কিছু বুঝায়, যাহার নড়্‌চড়্‌ হইতে

পারে না। কর্ত্তব্যের বন্ধন কোন ব্যপদেশেই শিথিল হয় না, এবং সকলের পক্ষেই সমান বলবৎ। ইহা এমন একটা জিনিস, যাহার নিকটে, আমার মনের খেয়াল, আমার কল্পনা, আমার স্বল্প-বোধশীলতা, সমস্তই অন্তর্হিত হইবার কথা ; ইহা একপ্রকার মঙ্গল-ভাব, যাহার সহিত বাধ্যতার ভাব জড়িত। আমার মেজাজ যে প্রকার হোক্ না কেন, আমার অবস্থা যাহাই হোক্ না কেন, যে কোন বাধাই থাক্ না কেন, কর্ত্তব্যের আদেশ আমি পালন করিতে বাধ্য। ইহার নিকট শৈথিল্য চলে না, আপোসে বোঝাপড়া চলে না, ওজর-আপত্তি খাটে না। তোমার প্রতিই হউক্, আমার প্রতিই হউক্ যে কোন স্থানে হউক্, যে কোন অবস্থায় হউক্, আমাদের মনের ভাব যে-রকমই হউক্,—কর্ত্তব্যের আদেশ হইবা-মাত্রই তাহা পালন করিতে হইবে। কর্ত্তব্যের আদেশ আমরা না মানিতেও পারি, কেন না আমরা স্বাধীন ; কিন্তু এই আদেশ লঙ্ঘন করিবামাত্রই আমাদের মনে হইবে, আমরা দোষ করিতেছি' আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছি, এবং তাহার দণ্ডস্বরূপ তখনই আমাদের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

স্বার্থের উপদেশ, বিষয়বুদ্ধির উপদেশ শুনিলে আমরা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, না শুনিলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইতে পারি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি সুখী হইতে বাধ্য ? যে জিনিস, দুর্লভ, যাহা আমি ইচ্ছা করিলেই পাই না, সেই সুখসৌভাগ্যের সহিত কি বাধ্যতা সংযুক্ত হইতে পারে ? যদি আমি কোন বিষয়ে বাধ্য হই, তবে যে বিষয়ে আমি বাধ্য, তাহা করিবার শক্তিও আমার থাকা চাই ; কিন্তু সুখসৌভাগ্যের উপর স্বাধীনতার বড় একটা হাত নাই ; কেননা, সুখসৌভাগ্য এমন অসংখ্য জিনিসের

উপর নির্ভর করে, যাহা আমার আয়ত্তের বাহিরে; কিন্তু ধর্ম্মোপার্জ্জন সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধর্ম্মোপার্জ্জনে আমাদের স্বাধীনতা আছে। নীতিতত্ত্বের হিসাবে—সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টও নহে, নিকৃষ্টও নহে। যদি আমার স্বার্থ আমি ঠিক বুঝিতে না পারি, তাহার দণ্ডস্বরূপ আমি দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিব, কিন্তু অনুতাপ অনুভব করিব না। যে দুঃখ-দুর্দ্দশা শুধু বৈষয়িক, যাহা কোন মানসিক পাপের ফল নহে, তাহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু তাহা আমার হীনতা ঘটাইতে পারে না।

আমরা পুরাতন ষ্টোয়িক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছি না। আমরা দুঃখের প্রতি এই কথা বলি না:—"দুঃখ! তুমি অমঙ্গল নও"। আমরা বরং বলি, যত দূর পার, দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে চেষ্টা কর, আপনার স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, দুঃখ বর্জ্জন কর, সুখ অন্বেষণ কর। আমরা দূরদৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতার খুবই পক্ষপাতী। আমরা শুধু এইটি প্রতিপন্ন করিতে চাই যে,—সুখ এক জিনিস, ধর্ম্ম আর এক জিনিস; সুখের স্পৃহা মানুষের স্বাভাবিক হইলেও কর্ত্তব্যের বাধ্যতা শুধু ধর্ম্মেরই সহিত জড়িত; সুতরাং আমাদের স্বার্থের পাশাপাশি একটা ধর্ম্মনীতির নিয়ম রহিয়াছে। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দেয়, সমস্ত মানবমণ্ডলী ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই ধর্ম্মনীতির অনুশাসন অকাট্য, উহা লঙ্ঘন করিলে আমার অধর্ম্ম হয়, আমার লজ্জা বোধ হয়।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ন্যায় অধিকার-বুদ্ধি সম্বন্ধেও, স্বার্থনীতি কোন সন্তোষ-জনক হিসাব দিতে পারে না। কেন না, কর্ত্তব্য ও অধিকার—পরস্পরের সহিত অনুস্যূত।

শক্তি ও অধিকারকে একত্র মিশাইয়া ফেলিলে চলিবে না। কোন সত্তা ঝটিকার ন্যায়, বজ্রের ন্যায়, কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় শক্তিমান্ হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহার স্বাধীনতা না থাকে, তবে সে একটা ভীষণ জিনিস মাত্র, ব্যক্তি নহে:—উহা অল্লাধিক পরিমাণে আমাদের ভয় ও আশার উদ্রেক করিতে পারে; কিন্তু সে আমাদের ভক্তির অধিকারী নহে; তাহার প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও অধিকার বুদ্ধি—ইহারা দুই ভাই। স্বাধীনতাই উহাদের সাধারণ জননী। একই দিনে উহাদের জন্ম, একসঙ্গে উহাদের বৃদ্ধি, এক সঙ্গে উহাদের মরণ। এমন কি, এরূপও বলা যাইতে পারে, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য ও আমার নিজের অধিকার একই জিনিস,—কেবল উহাদের মুখ, দুই বিভিন্ন দিকে। আমি যদি তোমার নিকট হইতে ভক্তিলাভের অধিকারী হই—প্রকারান্তরে কি এই কথাই বলা হইতেছে না যে, আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা তোমারকর্ত্তব্য, কেননা, আমি এক জন স্বাধীন ব্যক্তি? কিন্তু তুমিও একজন স্বাধীন ব্যক্তি; অতএব আমার অধিকারের ও তোমার কর্ত্তব্যের ভিত্তি একই ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে।

একমাত্র স্বাধীনতার সম্বন্ধেই সকল মনুষ্য সমান, আর সকল বিষয়েই মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। যেমন বৃক্ষের দুইটি পত্র সমান নহে, সেইরূপ কি শরীর, কি ইন্দ্রিয়াদি, কি মন, কি হৃদয়,—এই সকল বিষয়ে কোন দুইটি মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সমান নহে। কিন্তু এক ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার সহিত অন্য ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার যে কোন পার্থক্য আছে—এ কথা মনে ধারণা করাও যায় না। হয় আমি স্বাধীন, নয় আমি স্বাধীন নই। যদি আমি

স্বাধীন হই, আমি তোমারই মতন সমান স্বাধীন, এবং তুমিও আমারই মতন সমান স্বাধীন। উহার কিছুমাত্র কম বেশী নহে।

এই স্বাধীনতার অধিকার সূত্রেই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত সমান নীতিমান্। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাভূমি যে ইচ্ছা, তাহা সকল মানুষের মধ্যেই সমান। এই ইচ্ছার সাধনপক্ষে—কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক—এরূপ বিভিন্ন উপায় থাকিতে পারে, এরূপ বিভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে—যাহা অসমান; কিন্তু যে সকল শক্তির সাহায্য লইয়া ইচ্ছা কাজ করে, সে সকল শক্তি স্বয়ং ইচ্ছা নহে; কেন না, সে সকল শক্তি ইচ্ছার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে। একমাত্র ইচ্ছার শক্তিই স্বাধীন শক্তি, এবং স্বরূপতঃ স্বাধীনতাই ইচ্ছার ধর্ম্ম। ইচ্ছা যদি কোন নিয়ম মানে, ত সে নিয়ম—প্রবৃত্তি-মূলক কিংবা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-মূলক নিয়ম নহে:—সে নিয়ম মানসিক নিয়ম,—যেমন মনে কর, ন্যায় ধর্ম্মের নিয়ম; আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা, এই নিয়মটিকে মানে, এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানে যে, এই নিয়মটি পালন, কিংবা লঙ্ঘন করা তা'র সাধ্যায়ত্ত। ইহাই স্বাধীনতার আদর্শ এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত সাম্যেরও আদর্শ; অন্য আদর্শ একটা অলীক কথা মাত্র। এ কথা সত্য নহে যে, সমান ধনবান্, সমান বলবান্ ও সমান সুন্দর হইবার অধিকার—এক কথায়, সমানরূপে সুখভোগ করিবার অধিকার, সুখী হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কেন না, সুখ সৌভাগ্য, কিংবা ধন ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিবার উপযোগিতা সম্বন্ধে, বিভিন্ন লোকের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রকৃতির মধ্যে বহুল তারতম্য লক্ষিত হয়। ঈশ্বর, সকল বিষয়েই অসমান শক্তি-বিশিষ্ট করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এস্থলে, সমতা প্রকৃতির বিরুদ্ধ,—জগতের চিরন্তন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ; যেরূপ সৌসামঞ্জস্য ও একতা—সেইরূপ বৈষম্য ও বিচিত্রতাও সৃষ্টির

নিয়ম। এইরূপ আত্যন্তিক সমতার কল্পনা করা নিতান্তই বাতুলতা। যাহাদের হৃদয় ও মন প্রকৃতিস্থ নহে, যাহারা আত্মম্ভরী, যাহারা অত্যাকাঙ্ক্ষী,—মিথ্যা সাম্য, তাহাদেরই আরাধ্য পুত্তলী। প্রকৃত সাম্য, ঈশ্বরকৃত সমস্ত বাহ্য অসমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে না,—সে সকল সমতা অপনীত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। গর্ব্ব ও ঈর্ষ্যার প্রচণ্ড দুশ্চেষ্টার সহিত সংগ্রাম করা—উদার স্বাধীনতার আবশ্যক হয় না। কেন না, প্রকৃত স্বাধীনতা প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষী নহে, এবং সুখ-সৌভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে কাল্পনিক সমতা লাভেরও প্রত্যাশী নহে। তা'ছাড়া, এইরূপ সমতা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, প্রকৃত স্বাধীনতার চক্ষে উহার মূল্য যৎ-সামান্য; প্রকৃত স্বাধীনতা এমন কিছু চাহে—যাহা সুখ অপেক্ষা, সৌভাগ্য অপেক্ষা, পদমর্যাদা অপেক্ষা বড়—তাহা সম্মাননা-বুদ্ধি; যাহা কিছু লইয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বের পবিত্র অধিকারের প্রতিই স্বাধীনতা সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহে; কেন না, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে সাম্য,—ইহা ভিন্ন আর সে কিছুই চাহে না, কিছুরই দাবী করে না। সম্মাননা ও ভক্তিকে যেন আমরা একসামিল করিয়া না ফেলি। প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের চরণেই আমরা ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করি। আমি কেবল মনুষ্যত্বকেই সম্মান করি; অর্থাৎ স্বাধীন-প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রকেই সম্মান করি; কেন না, মানুষের মধ্যে যাহা কিছু স্বাধীন নহে, তাহার সহিত মনুষ্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা মনুষ্যত্বের বিপরীত ধর্ম্ম। অতএব যাহা কিছু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিধান করে, ঠিক্ সেই বিষয়েই মানুষ মানুষের সমান। প্রকৃত সাম্য, এমন জিনিসের প্রতি সম্মান করিতে বলে, যাহা আমাদের প্রত্যেকের

মধ্যেই বিদ্যমান ; কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি কুৎসিত কি সুন্দর, কি ধনী কি দরিদ্র, কি প্রতিভাশালী ব্যক্তি, কি সাধারণ মনুষ্য, কি স্ত্রী, কি পুরুষ—যে-কেহ আপনাকে জিনিস বলিয়া জানে না—পরন্তু ব্যক্তি বলিয়া জানে,—প্রকৃত সাম্য তাহাকেই সম্মান করিতে আদেশ করে। সাধারণ স্বাধীনতার প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন—ইহা, কি কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি অধিকার-বুদ্ধি উভয়েরই নিয়ম ; ইহা প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম ও সকলেরই নিরাপদ আশ্রয় স্থান ; মনুষ্যগণের মধ্যে ইহাই আত্ম-মর্য্যাদা, ও ধরা-মাঝে ইহাই শান্তিরূপে বিরাজমান ; এই বিষয়ে একটা আশ্চর্য্য ঐকামত দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহান্ ও পবিত্র স্বাধীনতার উদ্দেশেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হৃদয়, সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয়, মনুষ্যের প্রকৃত হিতকামী ব্যক্তিদিগের হৃদয়, এক সময়ে বিস্পন্দিত হইয়াছিল। প্লেটোর উচ্চ কল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্‌টেস্‌ক্যুর সারবান্ চিন্তা সমূহ পর্য্যন্ত, গ্রীসের ক্ষুদ্রতম নগরের উদার ব্যবস্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া, ফরাসী বিপ্লবের অবিনশ্বর "মনুষ্যের অধিকার" ঘোষণা পর্য্যন্ত—যুগযুগান্তরকালের মধ্য দিয়া,—প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র এই আদর্শকেই চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে।

ইন্দ্রিয়বোধের দর্শনশাস্ত্র যে মূলতত্ত্ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পরিণাম যেমন অনিষ্টজনক, স্বাধীনতার মূলতত্ত্বের পরিণাম তেমনই হিতকর। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক-সামিল করিয়া ফেলিয়া, উক্ত দর্শনতত্ত্ব প্রকারান্তরে—ঠিক্ যেটি স্বাধীনতার বিপরীত সেই উদ্দাম প্রবৃত্তির সমর্থন করিয়াছে ; ঐ দর্শনশাস্ত্র, সমস্ত বাসনা ও সমস্ত প্রবৃত্তির বন্ধন-শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছে ; কল্পনা হইতে, হৃদয় হইতে, রাশরজ্জু উঠাইয়া লইয়াছে ; ইহারই শিক্ষাপ্রভাবে, মানুষ

প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞার দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে, জনসমাজকে অরাজকতার দিকে, কিংবা অত্যাচার-উৎপীড়নের দিকে ক্রমাগত ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, বাসনা জন্মাইবার পর, স্বার্থ-বুদ্ধি আমাদিগকে কোথায় লইয়া যায়? অবশ্য, সম্পূর্ণরূপে সুখী হই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। তাহার পর, স্বার্থবুদ্ধি আসিয়া বলে, যে কোন উপায়েই হউক, সুখী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি আমি মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ হইয়া থাকি, তাহা হইলে উহার দ্বারা আমার যে সুবিধা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। যদি অদৃষ্টক্রমে আমি নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমার তেমন সুখসম্পদ না থাকে, যদি আমার কোন বিষয়ে তেমন কোন স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকে, অথচ যদি আমার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা অসীম হয়—(কেন না, বাসনার অন্ত নাই) তখন আমি আপনাকে দুর্ভাগ্যবান্ মনে করিয়া আমার সংসারিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি, তখন আমার মনে নানা প্রকার কল্পনার স্বপ্ন জাগিয়া উঠে; আমি চাই, সমস্ত সংসার ওলট্‌পালট্ হইয়া যায়; বৃথা গর্ব্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে; অবশ্য আমি প্রচণ্ড রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব চাহি না; কেন না, তাহা আমার স্বার্থের অনুকূল নহে। মনে কর, অশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমি সুখসৌভাগ্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলাম। পূর্ব্বে স্বার্থবুদ্ধি যেমন আমাকে নানাবিধ চেষ্টা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এক্ষণে আবার যাহাতে আমি নিরাপদে থাকিতে পারি, আমার স্বার্থবুদ্ধি তাহাই চাহিতে লাগিল। এক্ষণে নিরাপদ হইবার আকাঙ্ক্ষা,—

আমাকে অরাজকতার পক্ষ হইতে সুশাসনের পক্ষে আনয়ন করিল; অবশ্য, আমি সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের পক্ষ যে অবলম্বন করি,—সে শুধু আমার স্বার্থের অনুকূল বলিয়াই; এই স্বার্থ বুদ্ধির কথাতেই—আমার সাধ্য হইলে—আমি অত্যাচারী প্রভু হইতেও পারি, কোন অত্যাচারী প্রভুর স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিত দাস হইতেও পারি। অরাজকতা ও অত্যাচার, স্বাধীনতা-পথের এই যে দুই মহাবিঘ্ন, উহার প্রতিরোধের এক মাত্র দুর্গ—স্বত্বাধিকারের বিশ্বজনীন ভাব;—উহা ভাল মন্দের প্রভেদের উপর, ন্যায় ও উপযোগিতার প্রভেদের উপর, হিতকারিতা ও মনোহারিতার প্রভেদের উপর, ধর্ম্ম ও স্বার্থের প্রভেদের উপর, ইচ্ছা ও বাসনার প্রভেদের উপর, এবং ইন্দ্রিয়-বোধ ও আত্ম-চৈতন্যের প্রভেদের উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

স্বার্থনীতিবাদের আর একটি পরিণাম এইস্থানে নির্দ্দেশ করিব।

কোন স্বাধীন জীব,—যে, ন্যায়ের নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জানে,—সেই নিয়ম সে পালন করিতেও পারে, লঙ্ঘন করিতেও পারে—এইরূপ জানিয়া-বুঝিয়াও সে যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে ইহাও জানে যে, ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জন্য সে দণ্ডনীয়। দণ্ডের ধারণা একটা কৃত্রিম ধারণা নহে, ব্যবস্থাপকদিগের গভীর ফলাফল-গণনা হইতে উহা গৃহীত নহে; বরং ব্যবস্থাপকেরা দণ্ডের স্বাভাবিক ধারণার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সঙ্গেই এই ধারণার ঘনিষ্ঠ যোগ; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের অসদ্ভাব, সেখানে দণ্ডসম্বন্ধীয় ধারণারও অসদ্ভাব। যে ব্যক্তি সুখের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, শুধু স্বার্থের প্ররোচনায় অনর্থকরী কোন বাসনার বশবর্ত্তী

হয়, অথচ যদি সেই সঙ্গে অন্ততঃ ন্যায়ের বাহ্য নিয়ম সে রক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে, তাহার ঐরূপ কাজকে কি প্রশংসা করা যাইতে পারে?—কখনই না। ঐ কাজকে তাহার অন্তরাত্মা কখনই ভাল বলিবে না; সেই কাজের জন্য সে কাহারও ধন্যবাদের পাত্র হইবে না, পুরস্কারের পাত্রও হইবে না;—কেন না, ঐ কাজ করিবার সময় সে শুধু আপনার কথাই ভাবিয়াছিল। তা'ছাড়া, আত্মসেবা করিতে গিয়া সে যদি পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সে যদি আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে না করে, তাহা হইলে সে যে দণ্ডার্হ, একথা সে নিজেও বলিতে পারে না, অন্য কেহও বলিতে পারে না। কোন স্বাধীন জীব,—যে আপনার ইচ্ছা-অনুসারে কাজ করে, সে একটা নিয়মের অধীন। সে নিয়ম সে পালন করিতেও পারে, নাও পারে। এইরূপ জীবই শুধু আপনার কাজের জন্য দায়ী; কিন্তু এই স্বাধীনতা ও ন্যায়-বোধের অসদ্ভাবে, তাহার দায়িত্ব কোথায়? যেমন কোন পাথর, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকেই নীত হয়, যেমন চুম্বক-শলাকা উত্তরাভিমুখেই মুখ ফিরাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবৃত্তির বশবর্তী ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক, স্বার্থের নিয়মে, শুধু আত্মসুখের দিকেই ধাবিত হয়। স্বার্থের অনুসরণে, মানুষ যখন বিপথগামী হয়, তখন উপায় কি? তখন অবশ্য তাহাকে ভাল পথে ফিরাইয়া আনা আবশ্যক। কিন্তু তখন আর কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়া হয় কেন?—না, সে ভুল করিয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি সুপরামর্শেরই পাত্র—দণ্ডের পাত্র নহে। স্বার্থতন্ত্রানুসারে, দণ্ড-পুরস্কার ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ব্যক্তিগত হিসাবে সমাজের আত্মরক্ষণই দণ্ডের উদ্দেশ্য; একটা হিতকর ভীতি উৎপাদন

করিবার জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যটি ভাল—যদি উহাতে কেবল এই কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হয় যে, এই দণ্ড আসলে ন্যায্য, এই দণ্ড অপরাধেরই ন্যায্য ফল, কোন একটা অপকর্ম্ম করাতেই এই দণ্ড বৈধরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কথাটি উঠাইয়া লইলে, অন্যান্য উদ্দেশ্যের প্রামাণ্য বিনষ্ট হয়; তখন উহা নীতিবিরহিত হইয়া কেবল পাশব বলেতেই পর্য্যবসিত হয়। তখন আর অপরাধীকে অপরাধী-মনুষ্যের ন্যায় দণ্ড দেওয়া হয় না; যে সকল পশু আমাদের কোন কাজে না আসিয়া আমাদের অনিষ্ট করে, তখন সেই সকল পশুর ন্যায় তাহাকে আঘাত, কিংবা হত্যা করা হয়। তখন সেই অপরাধী, ন্যায়-দণ্ডের নিকট আপনা হইতেই নতশির হয় না—নতশির হয়, কেবল লোহ বেড়ীর ভারে, কিংবা খড়্গের আঘাতে। সেরূপ দণ্ডের কোন বৈধ সার্থকতা নাই, সে দণ্ড অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নহে;—ইহা সেরূপ দণ্ড নহে, যাহাকে অপরাধী দণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারে,—বুঝিতে পারে যে, এই দণ্ড নিয়মলঙ্ঘনেরই উচিত ফল। তাহার নিকট এই দণ্ড, অনিবার্য্য প্রচণ্ড দুর্ঘটনার মত;—এই দণ্ড বজ্রের মত তাহার মাথার উপর আসিয়া পড়ে, তাহার শক্তি অপেক্ষা এই শক্তি অধিক প্রবল বলিয়াই সে তাহার আঘাতে ধরাশায়ী হয়। রাজদণ্ডের প্রকাশ্য আড়ম্বর অবশ্য লোকের কল্পনার উপর কাজ করে; কিন্তু উহা লোকের জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে না, কিংবা লোকের বিবেক-বুদ্ধি হইতে সায় পায় না। ঐরূপ দণ্ড উহাদিগকে ভীত করিয়া তোলে,—কিন্তু প্রশান্ত করিতে পারে না। স্বার্থনীতির পুরস্কারও কেবল একটা আকর্ষণ—কেবল একটা প্রলোভন মাত্র। এই পুরস্কারের মধ্যে কোন ধর্ম্মনীতির ভাব নাই—আপনার সুবিধা হইবে বলিয়াই লোকে এইরূপ পুরস্কারের

প্রার্থী হয়। এইরূপে, ধর্ম্মের ফল সুখ, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুঃখ — এই যে দণ্ড-পুরস্কারের পারমার্থিক ও লৌকিক ভিত্তি, এই মহতী ভিত্তিটি বিনষ্ট হয়।

অতএব, আমরা নির্ভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি :— স্বার্থবাদ, প্রত্যক্ষ-তথ্য-সমূহের বিরোধী, বিশ্বমানবের যাহা ধ্রুব-বিশ্বাস—সেই সকল ধ্রুব-বিশ্বাসের বিরোধী। ইহলোক অপেক্ষা পরলোকে ন্যায়ের নিয়ম অধিকতর বাস্তবতায় পরিণত হইবে— এই যে পারলৌকিক আশা, ইহার সহিতও স্বার্থবাদের মিল হয় না।

বিশ্বজগতের ও বিশ্বমানবের একজন স্রষ্টা অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর আছেন,—ঐন্দ্রিয়িক দর্শন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। আমাদের ধ্রুব-বিশ্বাস, ঐন্দ্রিয়িক দর্শন ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; কেন না, ইন্দ্রিয়-বোধ, মানব-মনের যে সকল বৃত্তির ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ, সেই সব বৃত্তি হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—কারণের সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূলতত্ত্ব,— যাহার অবিদ্যমানে, কোন কিছুরই কারণ অনুসন্ধানে আমরা প্রয়োজন অনুভব করি না, কিংবা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হই না। আমরা এক্ষণে শুধু এই কথা প্রতিপাদন করিতে চাই যে, মানুষের যদি বাস্তবিকই কোন নৈতিক গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই সকল গুণ ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করায় মানুষের কোন অধিকার থাকে না; কেন না, মানুষ, সেই সকল গুণের কোন চিহ্ন জগতের মধ্যে দেখিতে পায় না—আপনার মধ্যেও দেখিতে পায় না। স্বার্থ-নীতির ঈশ্বর, ঐ স্বার্থনীতিপরায়ণ মানুষের অনুরূপই হইবে।

কেমন করিয়া তুমি ঈশ্বরকে ন্যায়বান্‌ ও প্রেমময় বলিবে—(এই প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম বলিয়াই বুঝিতে হইবে) যখন স্বার্থনীতি, এইরূপ ন্যায় ও প্রেমের কোন ধারণাই করিতে পারে না। যে ঈশ্বর আপনাকেই ভাল বাসেন, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসেন না—স্বার্থনীতি শুধু এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে পারে। আমরা যদি ঈশ্বরকে দয়া ও ন্যায়ের মূলাধার বলিয়া না ভাবি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতেও পারি না, ভক্তি করিতেও পারি না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা আমাদের মনে যে ভয়ের উদ্রেক করে, আমরা শুধু সেই ভয়ের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই;—এ পূজা প্রীতি, কিংবা ভক্তির পূজা নহে—ইহা ভয়মূলক পূজা।

এইরূপ, ঈশ্বরের উপর আমরা কি কোন পবিত্র আশা স্থাপন করিতে পারি? আমরা যদি কেবল হীন সুখেরই অন্বেষণ করি, কেবল স্বার্থসাধনেই ব্যাপৃত থাকি, আমরা যদি ন্যায়কে সমর্থন করিবার জন্য কখন কষ্টস্বীকার করিয়া না থাকি, আমাদের আত্মার মহত্ত্বরক্ষা ও পরিপুষ্টি করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিয়া না থাকি, তাহা হইলে জগৎ-পিতার দয়ামিশ্র ন্যায়ের ভাব আমরা কি করিয়া মনে ধারণা করিব? যে নিয়মটি হইতে, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরা, আত্মার অমরত্বের বিশ্বাসে উপনীত হয়েন—সে নিয়মটিও অপরিহার্য্য পাপপুণ্যের নিয়ম। এই ন্যায়ের নিয়মটি এ লোকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হয় না বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের দোহাই দিই; আমরা মনে করি, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে ন্যায়ের নিয়ম স্থাপন করিয়া, আমাদের সম্বন্ধে এই নিয়মটি কি তিনি নিজেই লঙ্ঘন করিবেন? আমরা দেখাইয়াছি, স্বার্থনীতি—কি ইহলোকসম্বন্ধে, কি পরলোকসম্বন্ধে—

এই পাপ-পুণ্যের নিয়মটিকে ধ্বংস করিয়াছে। এই পৃথিবীর পর-পারে স্বার্থনীতির দৃষ্টি মোটেই চলে না। অসম্পূর্ণ স্বার্থনীতি,—অসম্পূর্ণ মানব-বিচারের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টের যদৃচ্ছ অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণন্যায় পূর্ণমঙ্গল বিচারকের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করে না। স্বার্থনীতির মতে,—অন্তঃকরণের স্বাভাবিক সংস্কার যাহাই হউক না কেন, অন্তরাত্মার মধ্যে ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস যাহাই অনুভূত হউক না কেন, এমন কি, প্রজ্ঞার মূল-নিয়ম যাহাই হউক না কেন, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের যাহা কিছু ঘটে, তাহাই মানুষের সব—তাহাতেই মানুষের সমস্ত কাজের পরিসমাপ্তি হয়।

যে সকল ভয় ও আশা, প্রকৃত স্বার্থ হইতে মানুষকে বিমুখ করে, সেই সকল ভয় ও আশা হইতে মানুষকে বিমুক্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া Helvetius-এর শিষ্যগণ হয় ত গৌরব অনুভব করিবেন। মানবজাতি অবশ্য তাঁহাদের এই কাজের মূল্য ও মর্য্যাদার যাথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের সমস্ত অদৃষ্টকে এই পৃথিবীর মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এমন কি সৌভাগ্য তাঁহারা আমাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সকলেরই ঈর্ষার যোগ্য?—আমাদের সুখের জন্য তাঁহারা কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন? তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি হইতে কিরূপ রাষ্ট্র-নীতি প্রসূত হইয়াছে?

ইহার যা' উত্তর, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ। আমরা দেখাইয়াছি,—ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র, প্রকৃত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকার করে না। এই দর্শনতন্ত্রের নিকট ইচ্ছাশক্তি আসলে কি?—না, মনের বাসনা চরিতার্থ করিবার শক্তি। এই

হিসাবে, মানুষ স্বাধীন নহে, এবং অধিকার বলেরই নামান্তর মাত্র।

আমরা বলি;—স্বার্থনীতির মতে, বাসনা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কিছুই নাই। অভাব-বোধ হইতেই বাসনার উৎপত্তি;—মানুষ এই অভাব-বোধের কর্ত্তা নহে—ভোক্তা। ইচ্ছাকে বাসনায় পরিণত করাও যা' স্বাধীনতার বিনাশ সাধন করাও তা'; তা' অপেক্ষা আরও বেশী—ইহাতে করিয়া বাসনাকে এমন একটা আসনে বসানো হয়, যে আসনটি বাসনার নিজস্ব নহে; উহাতে করিয়া একটা মিথ্যা স্বাধীনতার সৃষ্টি করা হয় ও সেই স্বাধীনতা, কেবল বদমাইসি ও দৈন্যাবস্থার একটা অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিলে, কত কত বাসনা মনে উদয় হয়, যাহা পূর্ণ করা অসম্ভব। বাসনা স্বভাবতই অসীম, অথচ আমাদের শক্তি নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে আমরা যদি একা থাকিতাম, তা' হইলেও আমাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিতে কত কষ্ট পাইতে হইত। এখন ত অন্যের সহিত আমাদের ভীষণ সংঘর্ষ;—অসংখ্য লোকের অসংখ্য বাসনা, এবং তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, বিচিত্র ও অসমান। যখনই আমাদের ব্যক্তিগত বল—ব্যক্তিগত অধিকার হইয়া দাঁড়ায়, তখনই অধিকারসাম্য অসম্ভব আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়; সকলেরই অধিকার অসমান,—সকলের শক্তিসামর্থ্য অসমান, এবং এই অসমতা কস্মিন্ কালেও ঘুচিবার নহে; সুতরাং স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়; যদি মিথ্যা স্বাধীনতার ন্যায় একটা মিথ্যা সাম্যের সৃষ্টি করা হয়, সে শুধু একটা মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ মাত্র।

স্বার্থনীতি, এই সকল মানসিক উপকরণকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলে। আমি স্পর্দ্ধার সহিত জিজ্ঞাসা করি, স্বার্থ

নীতি-সম্প্রদায় ও ইন্দ্রিয়বাদসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা এই সকল উপকরণ হইতে এক দিনের জন্যও কি মানবজাতির সুখ ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিতে পারেন ?

যেহেতু বলই অধিকার—অতএব, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহই স্বাভাবিক অবস্থা। একই জিনিস সকলেই চাহে; সুতরাং তাহারা সকলেই পরস্পরের শত্রু; যাহারা দুর্ব্বল,—শারীরিক বিষয়ে দুর্ব্বল, মানসিক বিষয়ে দুর্ব্বল—এই যুদ্ধে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ! যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান—তাহারাই পূর্ণ অধিকারের অধিকারী। যেহেতু বলই অধিকার,—প্রকৃতি সবল করিয়া সৃষ্টি করে নাই বলিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রকৃতির নিকটেই নালিস করিতে পারে; কিন্তু যে বলবান্ ব্যক্তি বল-প্রয়োগ করিয়া তাহাকে উৎপীড়ন করে, তাহার নিকটে সে কখনই নালিস করিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তি তখন ফিকির-ফন্দির সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; তখনই ছলের সহিত বলের যুঝাযুঝি আরম্ভ হয়।

যদি মানুষের মধ্যে,—প্রয়োজন, বাসনা, প্রবৃত্তি, স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে রক্তস্রাবী যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী; কোন প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। যুদ্ধবিগ্রহকে কিছুকালের জন্য চাপা দিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আইন-কানুন যতই চাপিবার চেষ্টা করুক না কেন, আইন-কানুনের অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া উহা এক-একবার বাহির হইবেই হইবে। যাহারা আসলে স্বাধীন নহে, তাহাদের জন্য স্বাধীনতার কল্পনা করা,—যাহারা আসলে বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সমতার কল্পনা করা,—যাহাদের মধ্যে অধিকারবুদ্ধি নাই, তাহাদের নিকটে অধিকারের সম্মাননা প্রত্যাশা করা, এবং অবিনশ্বর দুষ্প্রবৃত্তির উপর—অন্তরের রিপুসমূহের উপর—

ন্যায়কে স্থাপন করা কি বিষম মূঢ়তা! এই বিষম চক্র হইতে বাহির হওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার!

এই সাংঘাতিক চক্র হইতে বাহির হইতে হইলে এমন কতকগুলি মূল সূত্রের আশ্রয় লইতে হয়, যাহা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-বাদ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র যাহার কোন ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না, অথচ যাহা মানুষের অন্তরেই নিহিত আছে। য়ুরোপে এই সকল নীতি-সূত্র, খৃষ্টধর্ম হইতে ক্রমশঃ গৃহীত হইয়া য়ুরোপের আধুনিক সমাজকে পরিচালিত করিতেছে। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের যে প্রখ্যাত "অধিকার-ঘোষণা"-পত্র মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার প্রতিপাদিত করিয়া, চিরতরে অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে ভাঙিয়া দিয়া, তাহার স্থানে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে এই সকল মূল-সূত্রের কথাই লিখিত হইয়াছিল; এখনও এই সকল মূলসূত্র, আমাদের শাসনপদ্ধতির মধ্যে, আমাদের বিধিব্যবস্থার মধ্যে, আমাদের বিবিধ স্থায়ী অনুষ্ঠানের মধ্যে, আমাদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে, এমন কি, যে বায়ু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, সেই বায়ুর মধ্যে অবস্থিত। এই সকল মূলসূত্রই আমাদের সমাজের ভিত্তিভূমি এবং যে দর্শনতন্ত্র আমাদের এই অভিনব সমাজের জন্য আবশ্যক সেই দর্শনতন্ত্রেরও ভিত্তিভূমি।

আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—এই সকল সাধু-প্রকৃতির লোকেরা, কি করিয়া ঐ ঐন্দ্রিয়িক দর্শনের দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন,—যে দর্শন তন্ত্র তাঁহাদের হৃদ্গত ভাবের বিরোধী? আমি কেবল তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, ঐ যুগ উল্‌টা-স্রোতের যুগ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সংকীর্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা ও তাহার নিত্য সহচর ভণ্ডামির

অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই অন্ধ অতিভক্তিই স্বেচ্ছাচারিতাকে ডাকিয়া আনিল, এবং এই স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা সমস্তই আক্রান্ত হইল। রাজকুল ও অভিজাতবর্গের মধ্যে, পাদ্রিদের মধ্যে, লোক-সাধারণের মধ্যে উহা ক্রমশঃ সংক্রামিত হইল। ভাল ভাল লোক, এমনকি, দুই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিও ঐ আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল; আমাদের উন্নত উদার জাতীয় দর্শনের স্থান, একটা হীনতর দর্শন আসিয়া অধিকার করিল,—লকের শিষ্য কঁদিয়াক্, দেকার্ত্তের স্থান অধিকার করিল। সুখের নীতি, স্বার্থের নীতি ঐ যুগে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বিশ্বাস করিও না যে, সেই সময়কার সকল লোকই সুনীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল। রইয়ে-কলার বলেন,—কোন মত যতই খারাপ হোক্ না কেন, সেই মতাবলম্বী লোকেরা তত খারাপ নহে। ষ্টোয়িক-মতবাদ যতটা কঠোর, ষ্টোয়িক-মতাবলম্বী লোকেরা ততটা কঠোর নহে; এপিকিউরীয় মতবাদ যতটা চিত্ত-দৌর্ব্বল্যজনক, সেই মতাবলম্বী লোকেরা ততটা দুর্ব্বলচিত্ত নহে। দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত মানুষ, ধর্ম্মের উপদেশ যেমন সম্পূর্ণরূপে কাজে প্রয়োগ করিতে পারে না, সেইরূপ কোন দূষিত মত মানুষকে অপথে লইয়া গেলেও,—ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার অন্তরাত্মা সেই মতকে মনে মনে ধিক্কার করে। এই কারণে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, সুনীতিধ্বংসী ঐন্দ্রিয়িক দর্শনতন্ত্র ও স্বার্থনীতির প্রাদুর্ভাব হইলেও, খুব উদার নিঃস্বার্থ ভাবেরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কখন-কখন দেখা যায়।

আমার এই উপদেশটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবে; তোমাদের মনে যে সব তত্ত্ব আমি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিতে চাই, তাহার সহিত স্বার্থনীতির ঐক্য হয় না বলিয়াই এত কথা আমার বলিতে হইল। এই স্বার্থনীতি যে একটা মিথ্যা

উদার ভাবের ভাণ করে, সেই ভাণটা আমার ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। আমার মতে, এই নীতি দাসদিগের নীতি; এ নীতি এই স্বাধীনতা-যুগের নীতি নহে। স্বার্থনীতি-বাদকে খণ্ডন করিলাম; এক্ষণে, আর যে সকল নীতিবাদ,—সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত, সেই সকল নীতিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই সকল নীতিবাদ খণ্ডন করিয়া, এমন একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব, যাহার দ্বারা বিশ্বমানবের সহজ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

তৃতীয় উপদেশ।

অন্যান্য অসম্পূর্ণ নীতিবাদ।

উদার-চেতা মনুষ্যমাত্রই স্বার্থনীতিকে পরিহার করিয়া, ভাবের নীতিকে আশ্রয় করে। নিম্নে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি—যাহার উপর ভাবের নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে করিয়া ঐ নীতি প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

যখন আমরা কোন ভাল কাজ করি, তখন কি আমরা ঐ কাজের পুরস্কার স্বরূপ অন্তরে একপ্রকার সুখ অনুভব করি না? এই সুখ অবশ্য ইন্দ্রিয়-সুখ নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে সকল বিষয়ের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই সকল ইন্দ্রিয়-প্রতি-বিম্বিত বিষয়ের মধ্যে ইহার কোন মূলসূত্র কিংবা ইহার কোন মানদণ্ড নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ হইলে যে সুখানুভব হয়, সে সুখের সহিত ইহার ঐক্য নাই। আমি কোন কাজে সফল হইয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, এবং আমি বরাবর সৎপথে চলিয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাব হয়—এই দুই ভাব এক প্রকার নহে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যে সাক্ষ্য দেয়, সেই সাক্ষ্যের সহিত যে সুখ জড়িত তাহা বিশুদ্ধ; আর যত প্রকার সুখ সমস্তই অতীব মিশ্র। এই সুখই স্থায়ী, আর সমস্ত সুখ শীঘ্রই চলিয়া যায়। দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও মানুষ আপনার অন্তরে একটা স্থায়ী সুখের উৎস দেখিতে পায়। কারণ, ভাল কাজ করিবার সামর্থ্য মানুষের সকল সময়েই থাকে; পক্ষান্তরে এরূপ অসংখ্য

অবস্থা আছে যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই, সেই সকল অবস্থা হইতে আমরা যে সুখ পাই তাহা অতি বিরল ও অনিশ্চিত।

যেমন ধর্ম্মের কতকগুলি সুখ আছে, সেইরূপ পাপেরও কতকগুলি দুঃখ আছে। কোন অপকর্ম্ম করিয়া আমাদের ক্ষণিক সুখ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে আমরা যে কষ্ট পাই উহা সেই সুখের প্রায়শ্চিত্ত-পণস্বরূপ। এইরূপ সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। দুঃখ আসিয়া এইরূপ কর্ম্মের কলুষিত সুখ ও অবৈধ সফলতাকে বিষময় করিয়া তোলে; এই দুঃখ মানুষের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, জর্জ্জরিত করে, দংশন করে। ইহাই অনুতাপের যন্ত্রণা।

আরও কতকগুলি তথ্য, উহারই মত সুনিশ্চিতঃ—আমি একটি লোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখে দুঃখদুর্দ্দশার চিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রকটিত। উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা আমার গাত্র স্পর্শ করিতে পারে—আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে; তথাপি কোন চিন্তা না করিয়াই, কোন ফলাফল গণনা না করিয়াই, উহার কষ্ট দেখিবা মাত্র আমার কষ্ট হইল। ইহাই অনুকম্পা বা সহানুভূতির ভাব।

মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আমাদের মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, মানুষের প্রফুল্ল-মুখ দেখিয়া আমাদের মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অন্যের আনন্দে আমাদের অন্তরে তাহার প্রতিধ্বনি হয়, এবং অন্যের দুঃখকষ্ট,—এমন কি, শারীরিক বেদনাও আমাদের শরীরে সংক্রামিত হয়। মাদাম সেভিঙে তাহার পীড়িত কন্যাকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা একটুও অত্যুক্তি নহে:—"তোমার বুকের ব্যাথায় আমিও বুকের ব্যাথায় কষ্ট পাইতেছি।"

আমাদের হৃদয়কে, আমরা অন্যের সহিত একসূত্রে বাঁধিতে চাহি! এই কারণেই বড়-বড় সভায়, হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে বিদ্যুৎ ছুটিতে

থাকে; পাশাপাশি লোকের মধ্যে ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে। যেমন গুণমুগ্ধতা ও জ্বলন্ত উৎসাহ সংক্রামক, সেইরূপ আমোদ-কৌতুক ও বিদ্রূপ-পরিহাসও সংক্রামক। কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেও আমাদের মনে এইরূপ ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতার মনে যে ভাব অনুভূত হয় তাহারই অনুরূপ ভাব আমরাও অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যদি আমরা কোন অসৎ কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই অপকর্ম্মকারীর মনে যে ভাব উত্তেজিত হয়, আমাদের মন সেই ভাবের অংশভাগী হইতে কখনই চাহে না; আমরা তাহার প্রতি বিমুখ হই; ইহা সহানুভূতি ও অনুরাগের বিপরীত ভাব—ইহা বিরুদ্ধানুভূতি; ইহাকে বলে বিরাগ।

আর কতকগুলি তথ্য পূর্ব্বোক্ত তথ্যের আনুষঙ্গিক হইলেও, তাহার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতার সহিত আমার যে শুধু সহানুভূতি করি তাহা নহে, আমরা তাঁহার শুভ কামনা করি, আমরা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার হিতসাধন করি, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাহাকে ভালও বাসি। যদি কোন মহৎ কার্য্য, এই অনুরাগের বিষয় হয়, কিংবা কোন বীরপুরুষ এই অনুরাগের পাত্র হন, তবে এই অনুরাগ কখন কখন মত্ততার সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে। ইহাকেই পূজাবুদ্ধি বলে। ইহাই সেই পূজাঞ্জলি, যাহা বিশ্বমানব মহাপুরুষদের চরণে অর্পণ করে।

পক্ষান্তরে, যদি আমরা কোন মন্দকার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তবে সেই মন্দকার্য্যের অনুষ্ঠাতার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে; এবং আরও অধিক—আমরা তাহার অনিষ্ট কামনা করি; আমরা ইচ্ছা করি,

সে তাহার অপকর্ম্মের জন্য কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য মহাপরাধীরা আমাদের নিকট এত ঘৃণিত। এই ভাবটি শুধু বিরাগ নহে; ইহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাবও আছে। এই সকল মহাপরাধীরা আমাদের পথের কণ্টক বলিয়া আমরা তাহাদের অনিষ্ট ইচ্ছা করি। কোন ব্যক্তি সৎ না অসৎ—এ বিষয় সম্বন্ধে বিদ্বেষবুদ্ধি কিছুই জানিতে চাহে না, শুধু ইহাই জানিতে চাহে, সে ব্যক্তি আমাদের পথের অন্তরায় কি না, সে আমাদিগকে অতিক্রম করে কি না, সে আমাদের অনিষ্ট করে কি না। কিন্তু আমরা যে ভাবটির কথা বলিতেছি তাহা এক-প্রকার বিদ্বেষ যাহার মধ্যে একটু উদারতা আছে; যাহা স্বার্থ হইতে জন্মে না, যাহা শুধু বাধিত ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অন্যের প্রতি আমাদের যেরূপ বিরাগ জন্মে, আমরা নিজে যদি কোন মন্দ কাজ করি, আমাদের নিজের উপরেও সেইরূপ বিরাগ জন্মিয়া থাকে।

খুব সূক্ষ্মরূপে বলিতে গেলে, সহানুভূতি যেমন হিতৈষণা নহে, নৈতিক আত্মতুষ্টিও সেইরূপ সহানুভূতি নহে। কিন্তু সহানুভূতি, আত্মতুষ্টি ও হিতৈষণা—এই তিনটি ব্যাপার, মঙ্গলভাবেরই সাধারণ লক্ষণ। এই তিনটি ব্যাপার হইতে তিনটি বিভিন্ন অথচ অনুরূপ নীতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, তাহাই সৎকার্য্য যাহা করিলে আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ হয়, এবং তাহাই অসৎ কার্য্য যাহা করিলে অনুতাপ উপস্থিত হয়। কোন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেরূপ মনোভাব হয়, সেই অনুসারে সেই কার্য্যের ভাল মন্দ প্রথমেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পরে, ঐ ভাবটি আমরা অন্যের প্রতিও আরোপ করি। কোন কার্য্য করিয়া আমাদের মনে কিরূপ ভাব হয়, তাহা

আমরা নিজের ভাব হইতেই বিচার করিয়া থাকি।

আবার কতকগুলি দার্শনিক, সহানুভূতি ও হিতৈষণার একই কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ইঁহাদের মতে, মানুষের প্রতি আমরা যে স্নেহ ও দয়াদির ভাব অন্তরে অনুভব করি, সেই সকল ভাবের মধ্যেই মঙ্গলের নিদর্শন ও আদর্শ অবস্থিত। যখন কেহ এমন কোন কাজ করে, যাহা দেখিয়া তাহার শুভ কামনা করিতে,—তাহাকে সুখী করিতে স্বভাবতই আমাদের প্রবৃত্তি হয়, তখন তাহার সেই কাজকে আমরা ভাল বলিয়া থাকি। ঐ প্রকারের কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া, যখন আমাদের ঐরূপ মনের ভাব স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন আমরা ঐ ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া বিচার করি। কাহারও কাজ দেখিয়া যখন অন্য প্রকার ধারণা, অন্য প্রকার মনোভাব আমাদের মনে উত্তেজিত হয়, তখন আমরা তাহাকে অসৎ কিংবা অসাধু বলিয়া মনে করি।

কাহারও কাহারও মতে, স্বভাবতই যে কাজ আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে, সেই কাজই ভাল। যখন দেখি, দেশের জন্য কোন ব্যক্তি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তখন তাহার সেই বীরত্ব আমাদের মনেও কিয়ৎপরিমাণে বীরত্বের উদ্রেক করে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তিমূলক কোন কাজ,—নিতান্ত কোন স্বার্থের সংস্রব না থাকিলে—আমাদের অন্তরে এরূপ সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে না। অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব লোকেরও অন্তরে ভালর প্রতি অনুরাগ ও মন্দের প্রতি বিরাগ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে।

এই সকল বিভিন্ন নীতিবাদকে, একটি নীতিবাদে পরিণত করা যাইতে পারে ;—তাহা ভাবের নীতিবাদ।

এই নীতিবাদের সহিত অহং-নিষ্ঠ নীতিবাদের যে প্রভেদ আছে

তাহা সহজেই প্রদর্শিত হইতে পারে। অহং-নিষ্ঠা আপনাকে ভাল বাসা বই আর কিছুই নহে। কিসে আপনার সুখ হয়, আপনার ভাল হয়, অহংপরতা শুধু তাহারই অন্বেষণ করে।

হিতৈষণা যেমন স্বার্থের বিরোধী এমন আর কিছুই নহে। এস্থলে আমরা শুধু যে অন্যের শুভ ইচ্ছা করি তাহা নহে—আমরা অন্যের জন্য আপনাকে বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হই না; যে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সাধু ব্যক্তির জন্য সেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিতেও আমরা উদ্যত হই। এই আত্মবিসর্জ্জনে যদি কিছু সুখ অনুভূত হয়, তবে সে সুখ ঐ ভাবটিরই ইচ্ছা-নিরপেক্ষ আনুসঙ্গিক ব্যাপার,—উহা তাহার লক্ষ্য নহে।

সে সুখ আমরা বিনা-চেষ্টায় ও বিনা অন্বেষণেই প্রাপ্ত হই। এই প্রকার সুখের আস্বাদনে আমাদের অধিকার আছে, কেননা স্বয়ং প্রকৃতিদেবী হিতৈষণার সহিত ঐ সুখকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

হিতৈষণার ন্যায় সহানুভূতিরও অন্যের সহিত যোগ। উহাতে অহং-এর কোন সংস্রব নাই। আমাদের অন্তঃকরণ এমন ভাবে গঠিত যে আমরা এক জন শত্রুর দুঃখেও দুঃখ অনুভব করিতে পারি। কোন ব্যক্তি একটা মহৎ কাজ করিলে, তাহা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলেও সেই কাজের প্রতি এবং সেই কার্য্যকারী ব্যক্তির প্রতি আমাদের কতকটা সহানুভূতি হইয়া থাকে।

অন্যের যে দুঃখে আমাদের সহানুভূতি হয় সে দুঃখ আমাদেরও কখন না কখন ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কা হইতেই সহানুভূতির উৎপত্তি—কেহ কেহ সহানুভূতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক সময়, যে দুঃখের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, সে দুঃখ আমাদিগের হইতে এতদূরে অবস্থিত এবং সে দুঃখ আমাদের উপর

পতিত হইবার সম্ভাবনা এত কম যে, তাহা হইতে আমাদের ভয়ের উদ্রেক হওয়া নিতান্তই অসঙ্গত। এ কথা সত্য, দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কারণ, যে দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই, তাহা আমরা অনুভব করিব কি করিয়া? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সহানুভূতির মুখ্য নিয়ম নহে। উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আমাদের নিজের দুঃখ স্মরণ করিয়া কিংবা নিজ দুঃখের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তবে আমরা অন্যের দুঃখে সহানুভূতি করি।

কোন প্রকার স্বার্থের ভাব দিয়া সহানুভূতির ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথমত, বিরাগের ন্যায়, সহানুভূতিও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। তাহার পর, একথাও কেহ মনে করিতে পারে না, কোন ব্যক্তির হিতৈষণা আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা তাহার দুঃখে সহানুভূতি করি। কারণ, অনেক সময়েই, যাহাদের জন্য আমরা সহানুভূতি করি, তাহারা আমাদের সহানুভূতি জানিতেও পারে না। যাহাদিগকে আমরা কখন দেখি নাই, যাহাদিগকে দেখিবার সম্ভাবনা পর্যন্ত নাই, যাহারা জীবিত নাই—এইরূপ লোকের জন্যও যখন আমরা সহানুভূতি করি, তখন কি তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা কোন উপকার প্রত্যাশা করি?

অহংপরতা সকলপ্রকার সুখকেই প্রশ্রয় দেয়; কোন সুখকেই বহিষ্কৃত করে না; তবে কিনা, এমন কতকগুলি ভাবের সুখ আছে যাহা ইতর সুখ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী,ও ততটা মিশ্র বা অবিশুদ্ধ নহে; আমাদের মার্জ্জিত আত্মানুরাগ তাহাকে সেবনীয় বলিয়া মনে করে। ভাবের নীতিবাদ যদি শুধু হীন সুখের জন্যই ভাবের পক্ষপাতী হয় তবে অহংনিষ্ঠামূলক নীতিবাদের সহিত ভাবের নীতিবাদের কোন পার্থক্য থাকে না—ভাবের নীতিবাদের মধ্যে কোন প্রকার

নিঃস্বার্থভাব থাকে না। তাহা হইলে, "আমিই" আমাদের সকল কার্য্যের কেন্দ্র ও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে! কিন্তু আসলে তাহা নহে। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য কোন কাজ করিলে যে সুখ অনুভূত হয়, ঠিক সেই আত্মবিস্মৃতিটুকু হইতেই সেই সুখের যাহা কিছু মনোহারিত্ব। প্রকৃতিদেবী সহানুভূতি ও হিতৈষণার সহিত যদি কোন প্রকৃত সুখ সংযোজিত করিয়া থাকেন, তবে সে এইজন্য যে ঐ দুই বৃত্তির বিশুদ্ধতা ও নিঃস্বার্থপরতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—উহাদের আসল ভাবটি অবিকৃত থাকে। তোমার সহানুভূতি ও হিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ কোন সুখের প্রত্যাশা না করিয়া, শুধু সেই সহানুভূতি ও দয়ার পাত্রের কথাই তোমার ভাবা উচিত; নচেৎ, সেই সুখের মূলোচ্ছেদ হইবে,—যে সুখের অন্বেষণ করিতেছ সেই সুখই অন্তর্হিত হইবে। যে সুখ নিঃস্বার্থভাবের সহিত চিরসংযুক্ত—স্বার্থপরতা, যে-কোন আকারেই আসুক না, সে সুখকে কখনই ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না।

অহংনিষ্ঠ নীতিবাদ কিংবা অহমিকার নীতিবাদটা নিতান্তই অলীক —উহা একটা মিথ্যা কথা। উহা নীতির অনুমোদিত পবিত্র নামগুলি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নীতিকেই অপসারিত করিয়াছে; বিশ্বমানবের ভাষা প্রয়োগ করিয়া বিশ্বমানবকে প্রতারিত করিয়াছে; এই ধারকরা ভাষার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, সমগ্র মানবজাতির যাহা রত্নভাণ্ডার—সেইসব স্বাভাবিক সংস্কার ও স্বাভাবিক ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে স্বকীয় মত প্রচার করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, ভাব স্বয়ং মঙ্গল না হইলেও উহা মঙ্গলের বিশ্বস্ত সহচর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহকারী। উহা মঙ্গলের বিদ্যমানতার নিদর্শন এবং উহারদ্বারা সহজেই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, এবং মিথ্যা

তর্ক ও জল্পনা হইতে মনকে রক্ষা করে। অতএব মনোমধ্যে কতকগুলি মহৎভাব উত্তেজিত ও সংরক্ষিত করা মনের পক্ষে যেরূপ স্বাস্থ্যকর এমন আর কিছুই নহে; এইসকল মহৎভাব ব্যক্তিগত স্বার্থের দাসত্ব হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করে। সাধু ব্যক্তিগনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, তাঁহাদের মত' কাজ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে। আমাদের অন্তরে হিতৈষণা ও সহানুভূতির সাধনা করিলে, বদান্যতা ও প্রেমের উৎস আপনা হইতেই শতধারে উৎসারিত হয় এবং উদারতা ও আত্মোৎসর্গের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

তাই, ভাবের নীতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। ইহা প্রকৃত নীতি; কেবল, ইহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে, উহার এমন একটি মূলতত্ত্ব চাই, যাহার দ্বারা উহার প্রামাণিকতা স্থাপিত হইতে পারে।

ভাল কাজ করিলে, অন্তরে একটা সন্তোষ অনুভব করা যায়, এবং মন্দ কাজ করিলে অনুতাপ উপস্থিত হয়। ভাল মন্দ যে কাজই করি, প্রাগুক্ত দুইটি ভাব তাহাদের গুণ নহে; কারণ, ঐ দুইটি ভাব, কাজ করিবার পরে অনুভূত হয়। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমরা অন্তরে সন্তোষ অনুভব করিতে পারি? সেইরূপ, মন্দ কাজ করিয়াছি বলিয়া না বুঝিলে কি আমাদের অনুতাপ হয়?—কখনই নহে। কোন কাজ করিবার সঙ্গেসঙ্গেই স্বাভাবিক সংস্কার-অনুসারে আমাদের মনের মধ্যে একটা বিচারক্রিয়াও হইয়া থাকে; এই বিচার-ক্রিয়ার পরে আমাদের হৃদয়ের কাজ আরম্ভ হয়। উত্তরবর্ত্তী হৃদয়ের ভাবটি গোড়ার বিচার-ক্রিয়া নহে; মঙ্গলের ধারণা হৃদয়-ভাবের উপর স্থাপিত নহে—পরন্তু হৃদয়ের ভাব হইতে মঙ্গল অনুমিত হইয়া থাকে। যে কাজ মঙ্গলের জ্ঞান

ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা মঙ্গল ভাব হইতে উৎপন্ন—এইরূপ বলিলে 'চক্র-ন্যায়ের' ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

কোন কাজ ভাল বলিয়াই কি আমরা সেই কাজের সহিত সহানুভূতি করি না? কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি ন্যায়-বুদ্ধির অনুগত বলিয়াই কি আমরা সেই প্রবৃত্তির অনুমোদন করি না? তাছাড়া, সহানুভূতি যদি মঙ্গলের প্রকৃত মানদণ্ড হয়, তবে যাহা কিছুর জন্য আমরা সহানুভূতি করি তাহাই কি ভাল নহে? কিন্তু শুধু নৈতিক বিষয়েরই সহিত আমাদের সহানুভূতির সম্বন্ধ নহে। আমরা এরূপ আনন্দের সহিতও সহানুভূতি করি, যাহার সহিত ধর্ম্ম অধর্ম্মের কোন যোগ নাই। এমন কি, আমরা শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণারও সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকি। নৈতিক সহানুভূতি, সাধারণ সহানুভূতিরই একটা বিশেষ অবস্থা। কোন্ সহানুভূতি নৈতিক তাহা জ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়; সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের সহিত সহানুভূতির মিল হয় না। কখন কখন, যে সকল ভাবকে আমরা ভাল বলি না তাহাদিগের সহিতও আমরা সহানুভূতি করি।

হিতৈষণা সকল সময়ে, একমাত্র মঙ্গলভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। তাহাড়া, যখন কোন সাধুব্যক্তির প্রতি আমরা এই বৃত্তির প্রয়োগ করি, তখনও তাহা বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা করে এইরূপ বুঝায়; কারণ, কোন ব্যক্তি সাধু কি না, তাহা বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই আমরা নির্দ্ধারিত করি। কোন কার্য্যকারী ব্যক্তির শুভ কামনা করি বলিয়াই যে তাহার সেই কাজকেও আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি—এরূপ নহে; পরন্তু সেই কাজটা ভাল বলিয়াই সেই কাজের কর্ত্তাকে আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। আর এক কথা, হিতৈষণার গোড়ায় একটা বিচারক্রিয়া আছে, যাহা সহানুভূতির

মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বিচার ক্রিয়াটা এইরূপ ;—ভাল কাজের কর্ত্তা সুখী হইবার যোগ্য ; এবং মন্দ কাজের কর্ত্তা সেই কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কষ্ট ভোগ করিবে—ইহাই সমুচিত। এই জন্যই আমরা শুভ-কারীর সুখ কামনা করি এবং অশুভকারীর সংশোধন কল্পে দণ্ডভোগ প্রার্থনীয় মনে করি। হিতৈষণা এই বিচারক্রিয়ারই একটা শাব্দিক রূপ মাত্র।

অতএব, এই সকল ভাবস্ফূর্তির গোড়ায় একটা বিচার-ক্রিয়া হইয়া থাকে এইরূপ বুঝায়। এই বিষয়ে চক্র-ন্যায়ের ভ্রম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই ভাবগুলি নৈতিক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি,—উহাই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধীয় ধারণা ; কিন্তু আসলে আমাদের মঙ্গলের ধারণা হইতেই ভাবগুলি ঐ সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর একটা কথা ;—হৃদয়ের ভাবগুলা অনুভব-শক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে, এবং উহারা অনুভবশক্তির আপেক্ষিক ও পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিও কতকটা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাব উপ-ভোগের শক্তি সকল লোকের সমান নহে ; কাহারও বা স্থূল প্রকৃতি, কাহারও বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি। তোমার কামনাগুলা যদি উগ্র ও প্রচণ্ড হয়, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের উপর তোমার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুখই সহজে জয়ী হইবে। তোমার প্রকৃতি যদি কোমল হয়, তাহা হইলে সেরূপ কখনই হইবে না। বায়ুর অবস্থা, স্বাস্থ্য, রুগ্নতা,—আমাদের নৈতিক বোধশক্তিকে হয় নিস্তেজ নয় সতেজ করিয়া তোলে। বিজন বাসে যখন মানুষ আপনাকে লইয়াই থাকে, তখন অনুতাপের বল পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হয় ;—মৃত্যুর সন্নিধানে দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু জনতা, সংসারের কোলাহল, বিষয়াকর্ষণ,

অভ্যাস, উহাকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলেও কতকটা নিস্তেজ করিয়া রাখে। সময় বিশেষে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ে উৎসাহ সকলদিন সমান থাকে না। সাহসেরও ক্ষণিক বিরাম আছে। "অমুক দিন সে সাহস দেখাইয়াছিল"—একথা ত সর্ব্বদাই শুনা যায়। আমাদের অন্তরতম হৃদয়ের ভাবও অনেক সময়ে আমাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে। আমাদের যে ভাব পরম বিশুদ্ধ, অতীব উচ্চ আদর্শের—তাহাও কতকটা আমাদের দৈহিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কবির ভাবস্ফূর্ত্তিতে, প্রেমিকের অনুরাগে, ধর্ম্মবীরের জলন্ত উৎসাহেতেও মধ্যে মধ্যে অবসাদ উপস্থিত হয়;—এই সমস্ত অনেক সময়ে নিতান্ত হেয় ভৌতিক কারণের উপর নির্ভর করে। যখন ভাবের স্রোতে এরূপ জোয়ার ভাটা নিত্য উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবকে আদর্শ করিয়া সকল মানুষের জন্য কি একই বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে?

সহানুভূতি ও হিতৈষণাও এই ঐন্দ্রিয়িক অনুভবশীলতার হাত এড়াইতে পারে না। অন্যের দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি সকলের সমান নহে। যাহারা অতিশয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে—অন্যের দুঃখ কষ্ট তাহারাই বেশী বুঝিতে পারে; সুতরাং অন্যের দুঃখকষ্টে তাহাদেরই বেশী অনুকম্পা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাদের কল্পনাশক্তি বেশী, তাহারা অন্যের অনুভূত মনোভাব আপনার মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া, অন্যের দুঃখ বেশী অনুভব করিতে পারে। কেহ বা দৈহিক সুখদুঃখের জন্য, কেহবা মানসিক সুখ-দুঃখের জন্য সহানুভূতি করিতে পারে। এই প্রকার সহানুভূতির মধ্যেও আবার অনেক প্রকারভেদ আছে। শুধু প্রকার ভেদ নহে—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধি ব্যথিত হইলে আমা-

দের অন্তরে যে ধিক্কার উপস্থিত হয়, গুণীর গুণপনার উপরে অত্যধিক সহানুভূতি থাকিলে, সেই ধিক্কারের ভাব অনেকটা কমিয়া আসে। এই জন্যই ভলটেয়ার রুসো ও মিরাবোর দোষ আমরা দেখিয়াও দেখি না, তাঁহাদের শতাব্দীর কলুষরাশিকে আমরা ক্ষমার চক্ষে দর্শন করি। কোন দণ্ডার্হ ব্যক্তির মহাপরাধে আমাদের অন্তরে যতটা ঘৃণা উৎপন্ন হওয়া উচিত, তাহার কষ্টে সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ায়, সে ঘৃণা কতকটা মন্দীভূত হইয়া আসে। যাহাকে মঙ্গলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ডরূপে খাড়া করা হয়, সেই সহানুভূতির ত এইরূপ চঞ্চল ও টলমান্ অবস্থা। সহানুভূতির ন্যায় হিতৈষণাতেও এইরূপ তারতম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নেহ ও প্রেমের ভাব কাহারও কম, কাহারও বেশী। তাহার পর, সহানুভূতির ন্যায়, হিতৈষণাতেও নানা প্রবৃত্তি মিশ্রিত হইয়া তাহাকে বাধা দেয়। বন্ধুতার স্থলে, আমরা ন্যায়কে অতিক্রম করিয়াও, একটু বেশী দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।

ভাবের খামখেয়ালী উচ্ছ্বাসের প্রতি বেশী কর্ণপাত না করাই কি সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না? বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও পরিশাসিত হইলে, এই হৃদয়ের ভাবই বুদ্ধির বেশ একটি সহায় হইতে পারে; কিন্তু আপনার হাতে উহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, উহা অচিরাৎ উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালী আবেগে পরিণত হয়। ইহাতে করিয়া মন, কার্য্য করিবার একটা উত্তেজনা ও শক্তি লাভ করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ও অব্যবস্থিত হইয়া উঠে; গোড়ায় উদার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, অবশেষে অহংপরতার কাছাকাছি অথবা একেবারেই অহংপরতায় আসিয়া উপনীত হয়; মঙ্গলের ধ্রুব আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া, অনুভবশীলতার অদৃঢ় ভূমিতে কখনই স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না; ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আবেগের

আবর্ত্তে আসিয়া পড়ে; উদারতা হইতে অহংপরতায় আসিয়া উপনীত হয়; আজ হয়ত আত্মহারা ঔদার্য্যের শিখরে আরোহণ করিবে; কাল আবার স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের হীনতার মধ্যে নিপতিত হইবে।

এইরূপে ভাবের নীতি, স্বার্থের নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও অসম্পূর্ণ:—১ম উহা মঙ্গলের ধারণাকে এমন একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করায়, যে ভিত্তিটি স্বয়ং এই ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ২য় উহা এমন নিয়মের নির্দ্দেশ করে যাহা অধ্রুব—যাহা বিশ্বজনের অবশ্য-পালনীয় নহে।

পূর্ব্বোক্ত নীতিবাদের ন্যায় আমরা আর একটি নীতিবাদের উল্লেখ করিব যাহা মিথ্যা নহে কিন্তু অসম্পূর্ণ। প্রয়োজনবাদ ও সুখ-বাদের পক্ষপাতিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে একটু ব্যাপক করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সুখই মঙ্গল,—মঙ্গল, সুখ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না; তাঁহারা বলেন, আত্ম-সুখবাদীরা ব্যক্তিগত সুখকে সুখ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন; আসলে সাধা-রণের সুখকেই সুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

একথা আমরা স্বীকার করি যে, এই নূতন সিদ্ধান্তটি, ব্যক্তিগত স্বার্থবাদের বিরোধী; কেন না, এই নীতিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তি শুধু যে একটা ক্ষণিকভাবের ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে তাহা নহে, পরন্তু অবস্থা বিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

তথাপি, এই সিদ্ধান্তটি, প্রকৃত নীতি হইতে—সমগ্র নীতি হইতে দূরে অবস্থিত।

স্বীকার করি, সার্ব্বজনিক-স্বার্থবাদ, নিঃস্বার্থপরতায় লইয়া যায়;—অবশ্য ইহা অনেকটা ভাল; কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা মঙ্গলের একটা উপাধি-

মাত্র (Condition) স্বয়ং মঙ্গল নহে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেও কোন একটা ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে। কোন এক কার্য্যে, কার্য্যকারী ব্যক্তির কোন লাভ নাই বলিয়াই যে সেই কার্য্য অন্যায় হইবে না, একথা বলা যায় না। সর্ব্বাগ্রে সাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোন কাজ করিলে, যাহাকে বলে অহংপরতা—সেই অহংপরতা-পাপে কোন কোন ব্যক্তি লিপ্ত না হইলেও, অন্যান্য বহুবিধ পাপে লিপ্ত হইতে পারে। ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক যে, সাধারণের স্বার্থ সকল সময়েই ন্যায়-ধর্ম্মের অনুমোদিত; আসলে সাধারণের স্বার্থ ও ন্যায়-ধর্ম্ম—এই দুইটি জিনিষ এক নহে। যদিও অনেক সময়ে এই দুইটি এক সঙ্গে যায়, তবু কখন-কখন উহারা পৃথকভাবেও কাজ করে। অ্যাথেন্‌সের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য থেমিস্‌টক্লিস্ অ্যাথেন্‌স-বন্দরের মৈত্রীবদ্ধ প্রদেশ-সমূহের নৌ-বহর অগ্নিসাৎ করিবার প্রস্তাব করেন;—কিন্তু অ্যারিস্‌টাইডিস্ বলেন, প্রস্তাবটি সুবিধাজনক বটে, কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ; এই কথায়, অ্যাথেনীয়েরা এই অন্যায় সুবিধাটি পরিত্যাগ করে। তবেই দেখ, এ বিষয়ে থেমিস্‌টক্লিসের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না; দেশের স্বার্থের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। যদি তিনি বলপূর্ব্বক এই সমস্ত কাজ এথেনীয়দিগের দ্বারা করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন এবং সেই জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে, যে কাজ আসলে অন্যায় তাহার জন্য অতীব শ্লাঘ্য আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখান হইত।

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, এই দৃষ্টান্তে যদি স্বার্থ ও ন্যায়ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, তাহার কারণ, এইস্থলে স্বার্থ যথেষ্ট রূপে সাধারণের স্বার্থ হয় নাই বলিয়া; এইরূপ স্থলে,—"পরিবারের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন করিবে, নগরের জন্য

পরিবারকে বিসর্জ্জন করিবে, দেশের জন্য নগরকে বিসর্জ্জন করিবে, বিশ্বমানবের জন্য দেশকে বিসর্জ্জন করিবে—এই প্রসিদ্ধ বাক্যটির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

তুমি যদি অতদূর পর্য্যন্তও যাও, তবু দেখিবে ন্যায়ধর্ম্মের ধারণায় উপনীত হইতে পার নাই। বিশ্বমানবের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ, ন্যায়ধর্ম্মের সহিত যে মিল হইতে পারে না এরূপ নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে উহাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া, ঐ দুই জিনিষ এক নহে; তাই এরূপ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, বিশ্বমানবের স্বার্থ ন্যায়ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত। যদি শুধু একটিমাত্রও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয় যে, স্থল-বিশেষে জনসাধারণের স্বার্থের সহিত প্রকৃত মঙ্গলের ঐক্য হয় নাই, তাহা হইলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সাধারণের স্বার্থ ও প্রকৃত মঙ্গল এক জিনিস নহে।

তুমি উপদেশ দিতেছ যে, সাধারণ স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু কাহার দোহাই দিয়া তুমি এইরূপ উপদেশ দেও? শুধু কি স্বার্থের দোহাই দিয়া? যদি স্বার্থ বলিয়াই স্বার্থের কথা শুনিতে আমি বাধ্য হই, তবে আমার নিজের স্বার্থের কথা আমি কেন না শুনিব? অন্যের স্বার্থের জন্য আমার নিজের স্বার্থকে কেন বিসর্জ্জন করিব তাহার ত কোন সুসঙ্গত হেতু দেখিতে পাই না।

তুমি বলিতেছ, সুখই মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য। ইহা হইতে ন্যায্যরূপে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আমার সুখই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য।

যদি তুমি আমাকে আমার সুখ বিসর্জ্জন করিতে উপদেশ দেও,

তাহা হইলে সুখ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া তোমার এই উপদেশ দিতে হইবে।

অধিকাংশলোকের স্বার্থই পরম স্বার্থ,—এই প্রসিদ্ধ মূলসূত্র অনুসারে চলিলে, কি বিপদেই পড়িতে হয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। প্রথমত ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আমার প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করাই কঠিন; তারপর দেখ, ন্যায়ধর্ম্মের অভ্রান্ত আদেশের স্থানে, ব্যক্তিগত স্বার্থের অনিশ্চিত গণনাকে দাঁড় করাইয়া তুমি এই কঠিনতার কিছুমাত্র লাঘব করিলে না। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি আমার নিজের স্বার্থ নির্ণয় করিতে হয়—শুধু নিজের স্বার্থ নয়, পরিবারের স্বার্থ,—শুধু পরিবারের স্বার্থ নয়, দেশের স্বার্থ, শুধু দেশের স্বার্থ নয়—বিশ্বমানবের স্বার্থ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কি! আমার দূরদৃষ্টিকে সমস্ত জগতের উপর প্রসারিত করিতে হইবে? এইরূপ কঠিন পণে আমাকে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইবে? তাহা হইলে এমন একটা জ্ঞান তুমি আমার উপর আরোপ করিতেছ যাহা শুধু ঈশ্বরেতেই সম্ভবে। প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয়ের উদ্দেশে ঠিক্ পথে আপনাকে পরিচালন করিতে হইলে, দর্শনের ইতিহাস কিংবা কুট নীতি-শাস্ত্রও যথেষ্ট নহে। মনে রাখিও, মানব-জীবনের কোন গণিত-সিদ্ধ বিজ্ঞান নাই। তোমার গণনা যতই গভীর হউক না, তোমার ভাগ্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হউক না, দৈব-ঘটনা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা আসিয়া, তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে,—তোমার দুঃখ যতই নৈরাশ্যজনক হউক না, তাহা হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে, সুখ ও দুঃখকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবে—তোমার দূরদৃষ্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

এইরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপর তুমি ধর্ম্মনিতীকে স্থাপন করিতে চাহ? দেখ, এই প্রহেলিকাবৎ সাধারণ-স্বার্থকে সমর্থন করিবার জন্য আমরা কতই কুতর্ক অবলম্বন করিয়া থাকি! আমার কোন বন্ধুর দৈন্যদশা উপস্থিত হইলে, আমি সহজেই সাধরণ স্বার্থঘটিত এমন একটা দূর-সম্পর্কের হেতু বাহির করিতে পারি যাহার দোহাই দিয়া আমি আমার বন্ধুর সাহায্যে হয়-ত বিরত হইব। এই ব্যক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আমার নিকটে অর্থ যাচ্ঞা করিতেছে; কিন্তু ঐ অর্থ যদি আমি বিশ্বমানবের কাজে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমার ঐ অর্থব্যয় কি আরও সার্থক হইবে না? কল্য ঐ অর্থ কি আমার দেশের জন্য আবশ্যক হইবে না? অতএব উহা আপাতত ব্যয় না করাই ভাল। তাছাড়া এই স্থলে সাধারণের স্বার্থ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইলেও ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে;—এইরূপ নানা প্রকার মিথ্যা জল্পনা আসিয়া আমার মনকে অধিকার করিবে। কোন ভাল কাজ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে যদি ইহাই দেখিতে হয়, উহা অধিকতম লোকের পরম স্বার্থ কি না, তাহা হইলে এরূপ কাজ দুঃসাহসী ও উন্মাদগ্রস্ত লোক ভিন্ন আর কেহ করিতে সাহস পাইবে না। স্বীকার করি, সাধারণ-স্বার্থের ধারণা হইতে উদার আত্মোৎসর্গ প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক মহাপরাধও প্রশ্রয় পাইতে পারে। ঐ সাধারণ-স্বার্থের দোহাই দিয়া, সর্ব্বপ্রকার উন্মত্ত ব্যক্তিরা—ধর্ম্মোন্মত্ত, স্বাধীনতা-উন্মত্ত, দর্শনশাস্ত্র-উন্মত্ত ব্যক্তিরা—বিশ্বমানবের পরম স্বার্থের উদ্দেশে, অনেক জঘন্য কাজ কি করে নাই? অবশ্য অনেক সময়, সেই সকল কাজের সহিত উচ্চতর নিঃস্বার্থভাবও মিশ্রিত ছিল।

এই নীতিবাদের আর একটি ভুল—স্বয়ং মঙ্গল এবং মঙ্গলের

একটি প্রয়োগ-স্থল—এই উভয়কে উহা এক করিয়া ফেলে। যদি অধিকতম লোকের পরম স্বার্থই মঙ্গল হয়, তাহা হইলে, ইহার পরিণাম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে;—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, শুধু একটা সার্ব্বজনিক ও সামাজিক ধর্ম্মনীতিই আছে, নৈজিক কিংবা ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতির কোন অস্তিত্ব নাই; শুধু এক শ্রেণীরই কর্ত্তব্য আছে,—অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য; নিজের প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আমরা ঠিক্ সেই সকল কর্ত্তব্যকে ছাঁটিয়া ফেলিতেছি যাহার বিদ্যমানে অন্য সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সেই ব্যক্তিরই সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ যাহাকে আমরা "আমি" বলি। এক হিসাবে আমিই আমার সমাজ, সেই সমাজে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। প্লেটো একটা কথা বেশ বলিয়াছেন:—আমি আমার অন্তরে একটা সমগ্র নগরকে বহন করিতেছি,—ভাব, ধারণা, বাসনা প্রবৃত্তি, আবেগ, চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা উহা অধ্যুসিত; এই সকলের জন্য বিধিব্যবস্থা স্থাপন করা নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু প্রাগুক্ত নীতিবাদ অনুসারে, এই নিতান্ত-আবশ্যক আত্মশাসন-ব্যবস্থাকেই রহিত করা হইতেছে; অর্থাৎ নৈজিক ধর্ম্মনীতিকে—আত্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যকে বিসর্জ্জন করা হইতেছে।

আর একটি নীতিবাদের কথা বলিব যাহার বাহিরটা দেখিতে বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দূষিত নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই চারিত্র-নীতির ভিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ও লঙ্ঘনের সহিতই ঈশ্বর দণ্ড-পুরস্কার জুড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই দণ্ড-পুরস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াই মনুষ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এই বিষয়টি একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।

এ কথা সত্য,—বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বরই নীতির চরম ও পরম মূলতত্ত্ব;—এমন কি ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই মঙ্গল; কেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সনাতন ন্যায়ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি যাহা তাঁহার মধ্যে নিত্যকাল অবস্থিত। অবশ্য ঈশ্বরের এই ইচ্ছা—তিনি যে ন্যায়ের নিয়ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমরা কাজ করি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না,—তাঁহার খামখেয়ালি ইচ্ছা-অনুসারে তিনি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। পরন্তু,—ন্যায়ের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেই রহিয়াছে; কেন না, সেই নিয়মের মূল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে, তাঁহার অন্তরতম স্বরূপের মধ্যেই চিরবিদ্যমান।

যে নীতিবাদ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর স্থাপিত, সেই নীতিবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা অসঙ্গত, যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই হউক না কেন,—ইচ্ছার দ্বারা যেমন সত্য সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ ইচ্ছার দ্বারা মঙ্গলকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, এই দুই ইচ্ছার মধ্যে অসীম ও সসীমের প্রভেদ ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই। এখন দেখ, আমার ইচ্ছার দ্বারা কোন সত্যকে আমি লেশমাত্রও স্থাপন করিতে

পারি না। আমার ইচ্ছা সসীম বলিয়াই কি পারিনা? না, তাহা নহে; অসীমশক্তিসমন্বিত হইলেও ইচ্ছা এই বিষয়ে সমান অশক্ত। আমার ইচ্ছার প্রকৃতিই এই,—কোন কাজ করিবার সময় এই জ্ঞানটি থাকে,—আমি ইচ্ছা করিলে ইহার উল্টাটাও করিতে পারি; আর ইহা ইচ্ছার একটা আগন্তুক লক্ষণ নহে, ইহাই ইচ্ছার মুখ্য লক্ষণ; অতএব, এরূপ যদি মনে করা যায়, সত্য কিংবা সত্যের যে অংশকে ন্যায় বলে, তাহা—কি ঐশ্বরিক, কি মানবিক—কোন ইচ্ছার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, অন্য কার্য্যের দ্বারা অন্য আর কিছু স্থাপিত হইতেও পারিত; অন্যায়কে ন্যায় করা যাইতে পারিত, ন্যায়কে অন্যায় করা যাইতে পারিত; কিন্তু এরূপ অধ্রুবতা ন্যায় ও সত্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বাস্তবপক্ষে, দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ন্যায় নৈতিক তত্ত্বগুলিও স্বতঃসিদ্ধ ধ্রুবসত্য। কারণ ব্যতীত কার্য্যের সদ্ভাব, বস্তু বিনা গুণের সদ্ভাব ঈশ্বরও ঘটাইতে পারেন না; সত্য পালন করা, সত্যকে ভালবাসা, প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা মন্দ—ইহাও ঈশ্বর স্থাপন করিতে পারেন না। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলির ন্যায় নৈতিক সূত্রগুলিও অপরিবর্ত্তনীয়। মন্‌টেস্‌কিউ সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলিয়াছেন, নৈতিক নিয়মের সম্বন্ধে সে কথা বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা সেই সব অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ যাহা বস্তুসমূহের নিজস্ব প্রকৃতি কিংবা স্বরূপ হইতে উৎপন্ন।

ধরিয়া লও,—মঙ্গল ও ন্যায় ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আছে তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে; কিন্তু কোন ইচ্ছার

দ্বারাই অবশ্যকর্ত্তব্যতা স্থাপিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা—একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা;—আর আমি একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব। একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের সহিত একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবের এই যে সম্বন্ধ—ইহার মধ্যে কোন নৈতিক ভাব থাকিতে পারে না। বলের দ্বারা বাধ্য হইয়া কোন বলবান্ ব্যক্তির আজ্ঞা আমরা পালন করি, কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য :বোধে তাহা পালন করি না। ঈশ্বরের অন্যান্য উপাধি হইতে যদি মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিব, ঐশ্বরিক ইচ্ছা-প্রেরিত দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মধ্যে ন্যায়ের কণামাত্রও কিরণ নাই; সুতরাং তাহা হইতে অবশ্য কর্ত্তব্যতার কণা মাত্র ছায়াও আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে না।

কেহ কেহ এই কথা বলিয়া উঠিবেন :—এই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও ন্যায়—ইহা ঈশ্বরের খাম্‌খেয়ালী ইচ্ছা হইতে নহে পরন্তু ঈশ্বরের ন্যায়-ইচ্ছা হইতেই স্থাপিত হইয়াছে। বেশ কথা। তাহা হইলে ত সবই উল্টাইয়া যায়। তবেই দাঁড়াইতেছে—নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে এই অবশ্যকর্ত্তব্যতার উৎপত্তি নহে, পরন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা নিয়মিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে ন্যায়ধর্ম্ম অবস্থিত, সেই জ্ঞানই, সেই ন্যায়ধর্ম্মই এই অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আমাদের মনে আনিয়া দেয়। অতএব, ন্যায়-অন্যায়ের যে প্রভেদ, তাহা তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য নহে।

আর একটি নীতিবাদের কথা বলিব যাহার বাহিরটা দেখিতে বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দূষিত নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই চারিত্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ও

লঙ্ঘনের সহিতই ঈশ্বর দণ্ড পুরস্কার জুড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াই মনুষ্য স্বকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এই বিষয়টি একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।

এ কথা সত্য,—বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বরই নীতির চরম ও পরম মূলতত্ত্ব;—এমন কি ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই মঙ্গল; কেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সনাতন ন্যায়ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি যাহা তাঁহার মধ্যে নিত্য অবস্থিত। অবশ্য ঈশ্বরের এই ইচ্ছা—তিনি যে ন্যায়ের নিয়ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমরা কাজ করি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না,—তাঁহার খামখেয়ালি ইচ্ছা অনুসারে তিনি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। সে কথা দূরে থাকুক,—ন্যায়ের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে এই জন্যই রহিয়াছে, যেহেতু সেই নিয়মের মূল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে, তাঁহার অন্তরতম স্বরূপের মধ্যেই চিরবিদ্যমান।

ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর যে নীতিবাদ স্থাপিত, সেই নীতিবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা অসঙ্গত, যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই হউক না কেন,—ইচ্ছার দ্বারা যেমন সত্য সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ ইচ্ছার দ্বারা মঙ্গলকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, এই দুই ইচ্ছার মধ্যে অসীম ও সসীমের প্রভেদ ভিন্ন

এবং তাহা হইলে ধর্ম্মনীতির মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাবও কিছুই থাকে না। আবার যদি ন্যায়কেই ঈশ্বরেচ্ছার প্রমাণ বলিয়া ধর, —যে ন্যায়, তোমার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই প্রামাণিকতা লাভ করে,—তাহা হইলে তুমি চক্র-ন্যায়ের ভ্রমে পতিত হইবে।

আর একটা চক্র-ন্যায়ের ভ্রম আরও স্পষ্টরূপে এই স্থলে লক্ষিত হয়। প্রথমে, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম্ম উৎপন্ন—এই সিদ্ধান্ত বৈধরূপে স্থাপন করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া তোমাকে মানিয়া লইতে হয় যে, এই ইচ্ছা ন্যায়মূলক, কিন্তু আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, শুধু এই ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম্ম কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যদি পূর্ব্বহইতেই তোমার মনে ন্যায় সম্বন্ধে কোনপ্রকার ধারণা না থাকে, ঈশ্বরের কোন্ ইচ্ছা ন্যায়মূলক তাহা তুমি বুঝিতেই পারিবে না।

এক পক্ষে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা না জানিয়াও ন্যায় সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা থাকিতে পারে, ও আছে; পক্ষান্তরে, ন্যায় সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকিলে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার ন্যায্যতা তুমি বুঝিতে পারিবে না।

এখন দেখ, আমরা যে নীতিবাদ সম্বন্ধে বিচার করিতেছি তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি এই;—শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অমুক কাজ ন্যায্য ও অমুক কাজ অন্যায্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শুধু একটা খামখেয়ালি আদেশের দ্বারাই যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইতেছে তাহা নহে,—আবার এই ইচ্ছা, ঐ আদেশের সঙ্গে আশা ও ভয়ের ভাব জুড়িয়া দিয়াছে।

পারলৌকিক দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের আশা কোন্ মানব-বৃত্তির

উপর কার্য্য করে? যে বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমারা ইহলোকেই দুঃখকে ভয় করি, ও সুখের অন্বেষণ করি, সেই একই বৃত্তির উপর কাজ করে,—সেই বৃত্তিটি কি?—না, কল্পনার দ্বারা উত্তেজিত আমাদের ঐন্দ্রিয়িক অনুভবশক্তি অর্থাৎ আমাদের সেই বৃত্তি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনশীল, এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহার তারতম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পারলৌকিক সুখ ও দুঃখ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা জলন্ত অথচ চলন্ত দুইটি ভাবকে আমাদের অন্তরে, উত্তেজিত করে—সে দুইটি ভাব কি?—না, আশা ও ভয়। বয়স, স্বাস্থ্য, একখণ্ড চলন্ত মেঘ, সূর্য্যের একটি রশ্মি, এক পেয়ালা কাফি, এবং এইরূপ অসংখ্য পদার্থ—সমস্তই আমাদের আশা ও ভয়ের উদ্রেক করে। আমি এমন কতকগুলি লোককে জানি—এমন কি, এরূপ কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিতকেও জানি, কোন কোন দিনে যাহাদের আশার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর ইহারই উপর কিনা নীতির ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে! ফলত ঐ নীতিবাদ, মানব-আচরণে শুধু একটা স্বার্থের উদ্দেশ্য খাড়া করিতে চাহে—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া আমি যে কাজ করি, সেই গণনা ঠিক্ হইতেও পারে; তাহার দ্বারা আমি খুব সুখেরও আশা করিতে পারি; কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কোন ন্যায়ের ভাব দেখিতে পাই না যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কোন কার্য্য করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারে; অথবা এই গণনা করিতে পারা, কি না পারার মধ্যে, কোন পাপ পুণ্যও দেখিতে পাই না, (যদিও প্যাস্কাল তাহা দেখিতে পান); ফল কথা, আমাদের অনুভবশক্তি ও কল্পনাশক্তির তারতম্য অনুসারে, আমাদের প্রত্যেকের মনে আশা ও

ভয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। শেষ কথা, পারলৌকিক সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কারের আকারেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সব কর্ম্মই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য যাহা আসলে ভাল কিংবা আসলে মন্দ। যদি ভাল মন্দ বলিয়া আসলে কোন জিনিস না থাকে, ভাল মন্দের যদি অবশ্যপ্রতিপাল্য কোন নিয়ম না থাকে, তবে তাহাতে না-আছে পাপ, না-আছে পুণ্য; তাহা হইলে সে পুরস্কার পুরস্কারই নহে; সে দণ্ড দণ্ডই নহে। কেন না, ভালমন্দের ধারণা হইতে তাহা মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় না। যে স্থলে এই ভালমন্দের ধারণা নাই, সে স্থলে দণ্ড পুরস্কারের পরিবর্ত্তে শুধু সুখের আকর্ষণ ও যন্ত্রণার ভয় ধর্ম্মের অনুশাসন-বিধির সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র; সে বিধির মধ্যে কোন ধর্ম্মনৈতিক ভাব নাই; তখন আবার আমরা সেই পার্থিব কায়িক দণ্ডবিধির ব্যবস্থায় ফিরিয়া আসি যাহা লোক-কল্পনাকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্যই উদ্‌ভাবিত হইয়াছে এবং যাহা ব্যবস্থাকর্ত্তাদের প্রচারিত আইনের উপরেই নির্ভর করে; এইরূপে, এই পার্থিব দণ্ড পুরস্কারকে, বিধি ব্যবস্থাকে, আমরা পরলোকেও লইয়া যাই। আমরা পরে দেখিব—আত্মার অমরত্ব, উহা অপেক্ষা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এই মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ নীতিবাদগুলিকে অপসারিত করিয়া এমন একটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইব, যাহা আমাদের মতে, সম্পূর্ণ সত্য; কেন না ঐ সিদ্ধান্ত, নিশ্চিত তথ্য ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না, কোন তথ্যকেই উপেক্ষা করে না, এবং সেই সব তথ্যের যথাযথ লক্ষণ ও মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উপদেশ।

ধর্ম্মনীতির প্রকৃত মূলতত্ত্ব।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী, দার্শনিক পদ্ধতি সমূহের শুধু ভ্রম দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, পরন্তু সেই ভ্রমসমূহের মধ্যে যে সত্য মিশ্রিত আছে তাহা তিনি দেখিতে পান, এবং সেই সত্যগুলিকে সেই সব ভ্রম হইতে বিনির্ম্মুক্ত করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহের বিক্ষিপ্ত সত্যগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি সমগ্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সেই সত্যকে, প্রত্যেক পদ্ধতিই একটা বিশেষ দিক দিয়া দর্শন করে। আমরা যে সকল নৈতিক পদ্ধতি খণ্ডন করিলাম, তাহা পরস্পর বিরোধী হইলেও, তাহাদের মধ্যে সমগ্র ধর্ম্মনীতির মূল-উপাদানগুলি নিহিত আছে। সমগ্র নৈতিক ব্যাপারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শুধু ঐসকল উপাদানকে একত্র করা আবশ্যক। ফলত সমস্ত দর্শনের ইতিহাস—মানসিক ব্যাপারসমূহের বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন পদ্ধতিবিশেষের মতে অন্ধ না হইয়া, সমগ্র মানব-আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের মনে যে সকল ধারণা ও ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই আমরা যথাযথরূপে একত্র সংগ্রহ করিব।

কতকগুলি কার্য্য আমাদের প্রীতিকর এবং কতকগুলি কার্য্য অপ্রীতিকর; কতকগুলি উপকারী, ও কতকগুলি হানিজনক;—এক কথায়, সেই সকল কার্য্যের সহিত আমাদের স্বার্থের যোগ। যে সকল কার্য্য আমাদের হিতজনক সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আনন্দিত হই, এবং যাহাতে আমাদের হানি হয়—সেইরূপ কার্য্য

আমরা পরিবর্জ্জন করি। যে সকল কার্য্যে আমাদের স্বার্থ সাধিত হয় আমরা নিয়ত সেই সকল কার্য্যেরই অনুসরণ করি।

এই ব্যাপারটি সর্ব্ববাদিসম্মত;—আরও একটি ব্যাপার আছে যাহা উহারই মত অবিসম্বাদিত।

এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহার সহিত আমার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহাতে আমাদের কি স্বার্থ আছে তাহা আমরা বিচার করিতে সমর্থ নহি, অথচ আমরা সেই সকল কার্য্যকে ভাল কিংবা মন্দ বলিয়া থাকি।

মনে কর, তোমার সমক্ষে একজন সশস্ত্র বলবান্ ব্যক্তি, একজন দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি মারপীট করিল, এবং তাহার গাঁঠের কড়ি হরণ করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিল। এই কার্য্যে তোমার নিজের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগিল না, অথচ তোমার মন ঘৃণা ও রোষে পূর্ণ হইল; সেই হত্যা-কারীকে ধৃত করিয়া পুলিসে সোপর্দ করিবার জন্য, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে। যাহাতে সে কোন না কোনরূপে দণ্ডিত হয় তাহার জন্য তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইল, এবং তুমি মনে করিলে—এই-রূপ দণ্ডবিধান করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য; যতক্ষণ না তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইল ততক্ষণ তোমার রোষ প্রশমিত হইল না। আবার আমি, বলি, এস্থলে তোমার নিজের কোন প্রত্যাশাও ছিল না, ভয়ও ছিল না। তুমি যদি কোন দুর্গম দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, তাহার উচ্চ চূড়া হইতে এই হত্যাকাণ্ড দেখিতে, তাহা হইলেও তোমার মনে এইরূপ ভাবই উৎপন্ন হইত।

একটা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহারই একটা মোটামুটি ছবি উপরে প্রদর্শিত হইল। এই ছবির

মধ্যে যে সকল বিভিন্ন রেখার সমাবেশ আছে, তৎসম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ ও একটু বিচার করিয়া দেখিলেই একটা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া কোন্ ভাবটি তোমার মনে প্রথম উদয় হইল?—অবশ্য, ঘৃণামিশ্রিত রোষের ভাব, একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক তোমার মনে সঞ্চারিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, এমন একটা ধিক্কারের ভাব স্বতই আমাদের মনে জন্মিতে পারে— যাহার সহিত স্বার্থের কোন সংস্রব নাই; মনের এইরূপ একটা শক্তি আছে—মনের এরূপ কতকগুলি ভাব আছে, যাহার লক্ষ্য আমি নিজে নহি। আমাদের মনে এমন একটা বিদ্বেষের ভাব, এমন একটা বৈমুখ্যের ভাব, এমন একটা আতঙ্কের ভাব আছে, যাহা আমাদের নিজের অনিষ্টাশঙ্কা হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত এমন সকল কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয় যাহা আমাদের হইতে বহুদূরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং যাহার আঘাত আমাদিগকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে না;—সেই সকল কার্য্যকে যে আমরা ঘৃণা করি, তাহার একমাত্র হেতু, আমরা সেই সমস্ত কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি।

হাঁ, আমরা সেই সকল কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই সব কার্য্য আমাদের মনে যে সকল ভাব উৎপাদন করে, তাহার মধ্যে একটা বিচারক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে। যে সময়ে কোন কার্য্য দেখিয়া তোমার মনে ঘৃণা ও রোষের উদয় হয়, তখন যদি কেহ বলে, তোমার এই নিঃস্বার্থ রোষ তোমার একটা বিশেষ দৈহিক গঠনের ফল, এবং ঐ কার্য্য আসলে ভালও নহে মন্দও নহে—তখন এই ব্যাখ্যার প্রতি তুমি নিশ্চয়ই বিমুখ হও, তুমি তাহাতে কখনই সায় দিতে

পার না; তুমি তখনই বলিয়া উঠ, ঐ কার্য্যটি স্বতই মন্দ; তুমি তখন শুধু তোমার মনের ভাবমাত্র প্রকাশ কর না, তোমার বিচারে যাহা মনে হয় তাহাই তুমি ব্যক্ত করিয়া থাক। তাহার পর দিন তোমার মনের উত্তেজনা উপশমিত হইলেও ঐ কার্য্য তোমার বিচারে মন্দ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। ঐ কাজটা যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই মন্দ, তাহা ছয় মাস কাল পরেও তোমার মনে হয়; তাহার কারণ,—তোমার বিবেচনায়, কাজটা স্বতই মন্দ। শুধু তাহা নহে, তোমার বিবেচনায় ঐরূপ কাজ না করাই উচিত।

কাজটা আসলে মন্দ এবং উহা না করাই উচিত—এই যে যুগল বিচারক্রিয়া—ইহাই তোমার ঘৃণা ও রোষের মূলে অবস্থিত। যদি কাজটা আসলে খারাপ না হয়, তাহা হইলে, তুমি ঐ কার্য্যের দরুণ যে ধিক্কার ও রোষ অনুভব কর তাহা তোমার শুধু একটা দৈহিক চেষ্টামাত্র এইরূপ মনে করা যাইতে পারে;—উহা এমন একটা ব্যাপার যাহাতে কোন নৈতিক ভাবের সংস্রব নাই; একটা প্রাকৃতিক ভীষণ কাণ্ড ঘটিলে তোমার মনে যেরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ইহা কতকটা সেইরূপ ধরণের :ভাব। কিন্তু ন্যায্যভাবে তুমি ঐ কার্য্যকারীর কার্য্যকে ভালমন্দ-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিতে পার না। ঐ কার্য্যকারীর প্রতি যে ব্যক্তি ঘৃণা ও রোষ অনুভব করে, তাহার মনে এই যুগল বিশ্বাস দুটিও থাকে যে,—ঐ কার্য্য আসলে খারাপ, এবং ঐ কার্য্য করা উচিত নহে।

কার্য্যটা আসলে খারাপ এবং উহা করা উচিত নহে—এই কথাটি বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝায় যে, ঐ কার্য্যকারী ব্যক্তি জানে যে, সে খারাপ কাজ করিতেছে,—সে ধর্ম্ম-নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে; তাহা না হইলে, তাহার এই কাজটা পশুবৎ

অন্ধশক্তির কাজ হইত, নীতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির কাজ হইত না; তাহা হইলে, মাথায় পাথর পড়িলে, যেমন পাথরের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, সেই কার্য্যকারীর প্রতিও সেইরূপ আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হইত না।

তাছাড়া, যে ব্যক্তি এই ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র তাহার প্রকৃতিগত একটি বিশেষ লক্ষণ আছে; অর্থাৎ সে স্বাধীন পুরুষ; সে যে কাজ করিয়াছে সে তাহা করিতেও পারিত, না করিতেও পারিত। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—কোন কার্য্যের জন্য দায়ী হইতে হইলে, সেই কার্য্যকর্ত্তার স্বাধীনতা থাকা চাই।

তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়া বিচারার্থ রাজপুরুষদিগের নিকট সমর্পিত হয়, উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত হয়; এবং সে দণ্ডিত হইলেই তুমি সন্তুষ্ট হও। এ কি তোমার কল্পনার ও হৃদয়ের একটা খামখেয়ালী চেষ্টা মাত্র?—না, তাহা নহে। তুমি শান্তই থাক, কিংবা ঘৃণা ও রোষে উত্তেজিতই হও, সেই হত্যাকাণ্ডের সময়েই হউক কিংবা বহুকাল পরেই হউক, প্রতিশোধ লইবার কোন ব্যক্তিগত ভাব তোমার মনে থাকিতে পারে না, কেন না তোমার উহাতে লেশমাত্র স্বার্থ নাই,—তথাপি তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী দণ্ডিত হয়। দণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুত যদি সেই অপরাধী ব্যক্তি তাহার সেই পাপ-কার্য্যের দরুণ কোন প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে; তুমি তখন আবার এই কথা নিশ্চয় বল যে, সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক্, তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কষ্ট পাওয়াই উচিত; তুমি তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, তুমি তখন কোন এক উচ্চতর ন্যায়বিচারের দোহাই দেও। এই যে তোমার বিচারক্রিয়া, তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে পাপ-পুণ্য-ঘটিত

বিচার বলিয়া থাকেন। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ ও অধর্ম্মের দণ্ড দুঃখ—এইরূপ একটি দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চতর নিয়ম আছে বলিয়া মানুষ বিশ্বাস করে। এই নিয়মের ধারণাটি মানুষের মন হইতে উঠাইয়া লইলে, পাপপুণ্য বিচারের কোন ভিত্তি থাকে না; এই বিচারক্রিয়া অপসারিত করিলে, সৌভাগ্যবান অপরাধীর প্রতি ঘৃণা ও রোষের ভাব একেবারেই দুর্ব্বোধ্য—এমন কি অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন, কাহাকে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখিলে, সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করা যে আবশ্যক—এ কথা তোমার মনেও আসে না।

অতএব, নৈতিক ব্যাপারের সমুদায় অংশগুলি এইরূপভাবে অবস্থিত:—তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যগুলিই সুনিশ্চিত; উহার একটি তথ্যকে যদি টলাইয়া দেও,—সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। অতি সামান্য পর্য্যবেক্ষণেই ঐ সকল তথ্য সপ্রমাণ হয় এবং উহাদের বন্ধনসূত্র সহজেই আবিষ্কৃত হইতে পারে, তজ্জন্য সূক্ষ্মতম যুক্তির প্রয়োজন হয় না। হয়, হৃদয়ের ভাবগুলিকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে হয়, নয় স্বীকার করিতে হয়,—ভাবগুলির মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে; আবার ঐ বিচার-ক্রিয়ার মধ্যে ভালমন্দের পার্থক্য জ্ঞান নিহিত আছে; এ পার্থক্য জ্ঞান হইতেই একটা অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং এই অবশ্য-কর্ত্তব্যতা এরূপ কার্য্যকর্ত্তার প্রতিই প্রযুক্ত হয় যে বুদ্ধিমান ও স্বাধীন; পরিশেষে পাপপুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে—যাহা ভালমন্দের পার্থক্যেরই অনুরূপ—সেই পার্থক্যের মধ্যে এই মূলতত্ত্বটিকেও স্বীকার করিতে হয় যে, ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা কি করিয়াছি? কোন ভৌতিকতত্ত্ববেত্তা কিংবা কোন রাসায়নিক পণ্ডিত যেরূপ কোন সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আবার তাহাকে তাহার মূল উপাদানে ফিরাইয়া আনেন, আমরা কতকটা সেইরূপ করিয়াছি। এই মাত্র প্রভেদ, আমরা যে ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহা আমাদের বাহিরে নহে—তাহা আমাদের অন্তরে অবস্থিত। তাছাড়া, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটা উভয়ক্ষেত্রে একই প্রকার। উহার মধ্যে কোন ঘর-গড়া মত কিংবা মানিয়া-লওয়া সিদ্ধান্ত নাই; উহাতে কেবল প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথাই আছে।

এই পরীক্ষাকে আরও দৃঢ়নিশ্চয় করিবার জন্য, আর একটু প্রকার-ভেদ করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অন্যের কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ যখন আমরা দর্শন করি তখন আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা পরীক্ষা না করিয়া,—আমরা নিজে যখন কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ করি তখন আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহাই আমাদের অন্তরাত্মাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্। এইরূপ স্থলে নৈতিক ব্যাপারের বিচিত্র উপাদানগুলি আরও স্পষ্টরূপে আমাদের চোখে পড়িবে এবং উহাদের পারম্পর্য্যও আমাদের নিকট সমধিক প্রকাশ পাইবে।

মনে কর, আমার কোন বন্ধু, মৃত্যুকালে কিছু টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা অমুক ব্যক্তিকে যেন দেওয়া হয়; টাকাটা যাঁহার নামে দিয়া গেলেন, তিনিও জানেন না যে ঐ টাকা তাঁহার প্রাপ্য। তাহার পর, যিনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত কথাটিও চলিয়া গেল।

যাঁহার জন্য এই টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না; এখন আমি যদি এই টাকা আত্মসাৎ করি, কেহই আমাকে সন্দেহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য? দুষ্কর্ম্ম করিবার এমন সুযোগ মনে কল্পনা করাও কঠিন। শুধু যদি আমার স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ঐ গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিতে আমি একটুও ইতস্তত করি না, এবং তাহা হইলে স্বার্থবাদিদিগের মতে আমি একজন বাতুল বলিয়া পরিগণিত হইব। আবার যদি ইতস্তত করি, নিজের প্রকৃতির নিকট আমি বিদ্রোহী হইব। আমি ইহার জন্য দণ্ডিত হইব না নিশ্চয় জানিয়াও তবু যে আমার মনে একটু ইতস্তত ভাব হইতেছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, স্বার্থবুদ্ধি হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে নিহিত আছে।

কিন্তু স্বভাবত আমার মনে কোন দ্বিধা হয় না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে তাহা আমার নহে, তাহা অন্যের। স্বার্থকে অপসারিত করিলে, ঐ গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিবার কথা আমার মনেও আসিবে না; কেবল স্বার্থবুদ্ধিই আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে, স্বার্থবুদ্ধিই আমাকে পাপের পথে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি তাহাকে ঠেকাইতে পারিতেছি না। উহা হইতেই, স্বার্থবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া যায়; এই সংগ্রামটা কি কষ্টপ্রদ; এই সংগ্রামে আমাদের কত সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে—কত প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সংগ্রাম হইতেই বেশ বুঝা যায়, স্বার্থ হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত আছে, এবং সেই প্রবৃত্তিটি স্বার্থেরই ন্যায় বলবতী।

মনে কর, অবশেষে কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরাভূত হইল, স্বার্থই জয়ী হইল। আমি সেই গচ্ছিত টাকা ভাঙ্গিয়া আমার নিজের অভাব, আমার পরিবারবর্গের অভাব পূর্ণ করিলাম। আমি ধনশালী ও বাহ্যতঃ সুখী হইলাম। কিন্তু আমি মনে মনে অনুতাপের তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। অনুতাপ বলিয়া যে একটা জিনিস আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার প্রতিরূপ শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। এমন লোক নাই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুতাপ অনুভব করে নাই। যতক্ষণ না অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় ততক্ষণ হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। আমার সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও আমার দুষ্কৃতির স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করে; লোকের স্তুতিবাদ, এই দুর্নিবার সাক্ষীর মুখ বন্ধ করিতে পারে না। যদি এই অনুতাপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অপরাধীর আর কোন উপায় থাকে না—সে একেবারে অধঃপাতে যায়, তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ হৃদয়ে অনুতাপের অনুভূতি থাকে, ততক্ষণ জানা যায়, হৃদয়ের স্বর্গীয় অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

অনুতাপ একটা বিশেষ প্রকারের কষ্ট। অমুক অমুক বিষয় আমার ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিংবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিংবা আমার স্বার্থহানি হইয়াছে, কিংবা আমার হৃদয় আশা ও আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছে—এই সকল কারণে আমি অনুতাপের কষ্ট ভোগ করি না; এই অনুতাপের কষ্ট বাহির হইতে আইসে না, তথাপি ইহার মত দারুণ কষ্ট আর নাই। আমি শুধু এই জন্যই কষ্ট পাই যে, আমি জানিয়া বুঝিয়া একটা খারাপ কাজ করিয়াছি, সে কাজ আমি না করিলেও

করিতে পারিতাম, এবং তাহার দণ্ডস্বরূপ আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি, এবং ইহাও জানি, আমি এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই অনুতাপের মধ্যে ভাল-মন্দের জ্ঞান, একটা অবশ্যপ্রতিপাল্য ধর্ম্মের নিয়ম, স্বাধীনতা, ও পাপপুণ্যের ধারণা নিহিত আছে। কার্য্যকালে এই সকল ভাবের মধ্যে যে সংগ্রাম :চলিতেছিল, অনুতাপকালে সেই সকল ভাব আবার আবির্ভূত হয়। সেই গচ্ছিত টাকা হরণ করিবার জন্য স্বার্থ আসিয়া আমাকে কত পরামর্শ দিল ; কিন্তু কে যেন আমাকে বলিয়া দিল, গচ্ছিত ধন অপহরণ করা একটা অন্যায় কাজ; আমি যে এই কাজকে অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি তাহা শুধু আজিকে নহে, চিরকালই এইরূপ মনে করি ; শুধু যে এই অবস্থায় কিংবা ঐ অবস্থায় অন্যায় বলিয়া মনে করি তাহা নহে, সকল অবস্থাতেই অন্যায় বলিয়া মনে করি। যাহাকে এই গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহার ঐ ধনে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—আমাকে এ কথা বলা বৃথা। আমার বিবেচনায় গচ্ছিতধন ফিরাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও ঐকান্তিক কর্ত্তব্য। আমি ইচ্ছা করিলে উহা .ফিরাইয়া দিতে পারি কিংবা নাও পারি—এই জ্ঞানটি থাকাতেই, আমি উহা ফিরাইয়া না দিলে, আপনাকে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচনা করি, আমার নিজের উপর একটা ধিক্কার উপস্থিত হয়, আমার হৃদয়ে অনুতাপের যন্ত্রণা হয়। এই অনুতাপের মধ্যেই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটা আবদ্ধ, এবং এই অনুতাপের দ্বারাই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারের সম্যক ব্যাখ্যা হইতে পারে।

পরীক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে, ইহার উল্টা প্রকরণটা কি,

তাহাও একবার দেখা যাক্; আবার উল্টা দিকটা মনে করা যাক্;—স্বার্থের প্রয়োচনা সত্ত্বেও, দুঃখ দৈন্যের সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও,—সত্য রক্ষার জন্য, ঐ গচ্ছিত ধন আমি যথাপাত্রে প্রত্যর্পণ করিলাম; তখন অনুতাপের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার ভাব আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইল। আমি জানি, আমি ভাল কাজ করিয়াছি; আমি জানি, আমি কোন কৃত্রিম মিথ্যা নিয়মের অনুসরণ করি নাই, কাল্পনিক নিয়মের অনুসরণ করি নাই, পরন্তু এমন একটা নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি যাহা সত্য, যাহা সার্ব্বভৌম, যাহা সমস্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন জীব মাত্রই অনুসরণ করিতে বাধ্য। আমি জানি, আমি আমার স্বাধীনতার সুব্যবহার করিয়াছি। এই স্বাধীনতার কার্য্য হইতে, আমার মনে একটা অপূর্ব্ব ভাব, একটা জয়োল্লাসের ভাব আবির্ভূত হয়। অনুতাপের পরিবর্ত্তে আমি একটা অনুপম আনন্দ অনুভব করি, এই আনন্দ আমার কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; আমার যদি আর কিছুই না থাকে, শুধু এই আনন্দ আমাকে সান্ত্বনা দিবে, আমাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবে। এই সুখের ভাবটি অনুতাপের মতই মর্ম্মস্পর্শী ও সুগভীর। সমস্ত উচ্চবৃত্তির সহিত বিদ্রোহ করিবার ফলে. মানবহৃদয়ে যেমন অনুতাপ প্রসূত হয়, সেইরূপ সমস্ত উচ্চবৃত্তির চরিতার্থতায় এইরূপ আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হয়।

নৈতিক ভাবটি—সমস্ত নৈতিক বিচারক্রিয়া ও সমস্ত নৈতিক জীবনের প্রতিধ্বনি মাত্র। উহা প্রথমেই চখে পড়ে বলিয়া, খুব তলাইয়া না দেখিলে, উহাই সমগ্র নীতির ভিত্তি বলিয়া সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিচারক্রিয়া ব্যতীত এই নৈতিক ভাব উৎপন্ন হয় না। ভাবটি

নীতির মূলতত্ত্ব নহে, পরন্তু উহা মানসিক বিচারের পরিণাম; বিচারক্রিয়া নীতি নহে, পরন্তু বিচারক্রিয়া নৈতিক ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা এইরূপ বুঝায়।

মানব-নীতিতন্ত্রের সমস্ত উপাদানগুলিই এখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; এখন এই প্রত্যেক উপাদানকে আমরা পৃথক্‌রূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

যে জটিল ব্যাপারটি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, তাহার মধ্যে নৈতিক ভাবটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর; কিন্তু এই নৈতিক ভাবের মূলে বিচারক্রিয়া অবস্থিত।

বিচার করিয়াই আমরা ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করি এবং বিচারক্রিয়াই সমস্ত ভালমন্দের মূলতত্ত্ব; কিন্তু সত্য ও সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার-সিদ্ধান্তের ন্যায়, মঙ্গল সম্বন্ধীয় বিচার-সিদ্ধান্তও মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার ক্রিয়ার মত' এই বিচার ক্রিয়াটিও সহজ, আদিম, মৌলিক, ও অবিশ্লেষ্য।

উহাদেরই মত,' এই বিচারসিদ্ধান্তটিও আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে। কতকগুলি ক্রিয়া বিদ্যমানে, ঐ সম্বন্ধে আমরা একটা বিচারসিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারি না; সেই সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে ইহাও জানি, সেই বিচার সিদ্ধান্তটাই ভাল মন্দের স্বরূপ নহে, পরন্তু ঐ বিচার-সিদ্ধান্ত কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহাই বলিয়া দেয় মাত্র। এই বিচার সিদ্ধান্তের দ্বারাই নৈতিক ভেদাভেদের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্ব যেমন দর্শকের নেত্র হইতে স্বতন্ত্র, যেমন সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যগুলি সত্যের প্রকাশক জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ মঙ্গলের বিচারসিদ্ধান্তও মঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র।

মানব-কার্য্যের ভাল-মন্দ বাস্তব-লক্ষণযুক্ত,—যদিও ঐ সকল লক্ষণ চক্ষের দ্বারাও দর্শন করা যায় না, হস্তের দ্বারাও স্পর্শ করা যায় না। কোন কার্য্যের ভৌতিক গুণের সহিত তাহার নৈতিক গুণকে একীভূত করা যায় না বলিয়া সেই নৈতিক গুণ যে কম নিশ্চিত তাহা নহে। এইজন্যই, যে সকল কার্য্য ভৌতিক হিসাবে সমান, তাহা নৈতিক হিসাবে খুবই ভিন্ন। হত্যা সকল সময়েই হত্যা; অনেক সময়, উহা মহাপরাধ হইলেও বৈধকার্য্যরূপে পরিগণিত হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—যখন হত্যার সহিত প্রতিশোধ লইবার ভাব না থাকে, স্বার্থের সংস্রব না থাকে, যখন শুধু আত্মরক্ষণের জন্যই হত্যাকার্য্য সাধিত হয়, তখন সে হত্যা বৈধ হত্যা। রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয় না, নির্দ্দোষীর রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয়। নির্দ্দোষিতা ও অপরাধ, ভাল ও মন্দ,—চির-নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ বাহ্য অবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করে না। বাহ্য রূপ বিভিন্ন হইলেও, বাহ্য অবস্থা কখন সমান কখনও অসমান হইলেও, উহার মধ্য হইতে নির্দ্দোষিতা ও অপরাধকে, ভাল ও মন্দকে, আমাদের জ্ঞান ঠিক চিনিয়া লইতে পারে।

আমাদের মনে হয়, ভাল মন্দ যেন সব সময়েই বিশেষ বিশেষ কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত; কিন্তু সেই সব কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বের দরুণ সেই সব কার্য্য আসলে ভাল কিংবা মন্দ নহে। তাই, আমরা যখন বলি, সক্রেটিসের প্রতি মৃত্যুদণ্ডবিধান অতীব অন্যায় এবং লেওনিডাসের আত্মবলিদান অতীব প্রশংসনীয়, তখন আমরা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যায় মৃত্যুদণ্ডকেই দূষণীয় মনে করি, এবং একজন বীরের আত্মোৎসর্গকেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি;—সেই বীরের নাম লেওনিড়াসই হউক কিংবা Assasই হউক, সেই

জ্ঞানীর নাম সক্রেটিসই হউক কিংবা Barlly হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

আমাদের ভাল-মন্দসংক্রান্ত বিচার-ক্রিয়া প্রথমে বিশেষ বিশেষ কার্য্যেই প্রযুক্ত হয় এবং সেই বিচারক্রিয়া হইতেই কতকগুলি সাধারণ মূলতত্ত্ব প্রসূত হয়,—যাহা পরে, সদৃশ কার্য্য সকল বিচার করিবার সময়ে বিচারের নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। যেমন অমুকটির অমুক কারণ ইহা বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার পরে আমরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, সেইরূপ আমরা বিশেষ বিশেষ কার্য্যসম্বন্ধে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত করি, তাহাই আমাদের নৈতিক বিষয়সংক্রান্ত বিচারের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। তাই প্রথমে আমরা লেওনিডাসের মৃত্যুর প্রশংসা করি, পরে তাহা হইতেই এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া ভাল। লেওনিডাসের সম্বন্ধে যখন এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম তখনও এই সিদ্ধান্তটি আমাদের জানা ছিল, তাহা না হইলে এই বিশেষ স্থলে উহার প্রয়োগ অবৈধ হইত, এমন কি, উহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইত না; ফলত ঐ বিশেষ প্রয়োগের সহিত ঐ সাধারণ সিদ্ধান্তটিও জড়িত ছিল। পরে যখন এই সাধারণ সিদ্ধান্তটি বিশেষ হইতে আপনাকে বিনির্মুক্ত করিল, সার্ব্বভৌম ও অবিমিশ্র আকারে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইল, তখন ঐ সিদ্ধান্তকে আমরা সদৃশ স্থলে প্রয়োগ করিতে লাগিলাম।

অন্য বিজ্ঞানের ন্যায়, নীতিশাস্ত্রেরও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র আছে; সকল ভাষাতেই এই সকল মূলসূত্র নৈতিক সত্যরূপে অভিহিত হইয়া থাকে।

শপথ ভঙ্গ করা উচিত নহে ইহাও একটি সত্য। বস্তুতঃ শপথ

রক্ষা করা সত্যের মধ্যেই ধর্ত্তব্য এবং এই উদ্দেশেই বিচারালয়ে শপথ করান হইয়া থাকে। নৈতিক সত্যগুলি, সত্যের হিসাবে গাণিতিক সত্য হইতে কম নিশ্চিত নহে। গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণাটা যদি গোড়ায় ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি,—যেমন ত্রিকোণের ধারণার সহিত এই একটি তত্ত্ব সংযুক্ত থাকে যে, উহার তিন কোণ উহার দুই ঋজু কোণের সমান, সেইরূপ গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণার সহিত এই ধারণাটি সংযুক্ত থাকে যে, বিশ্বাসভঙ্গ না করিয়া ঐ গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। তুমি ইচ্ছা করিলে, এই গচ্ছিত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে পার; কিন্তু এই বিশ্বাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, তুমি সত্যকে উল্টাইতে পারিবে এরূপ মনে করিও না; কিংবা ইহাও মনে করিও না যে, গচ্ছিত বস্তু কখনও তোমার নিজস্ব হইতে পারে। এই দুই ধারণা পরস্পরকে খণ্ডন করে। গচ্ছিত দ্রব্য নিজস্ব-রূপে ব্যবহার করিলে, উহা স্বামিত্বের সাদৃশ্য ধারণ করে মাত্র, কিন্তু আসলে উহাতে স্বামিত্ব বর্ত্তায় না; প্রবৃত্তির আবেগ যতই প্রবল হউক না, স্বার্থের মিথ্যা জল্পনা উহার সমর্থনে যতই চেষ্টা করুক না, উহাদের মধ্যে যে স্বরূপগত ভেদ আছে তাহা কখনই উল্টাইতে পারিবে না। এই জন্যই নৈতিক সত্য এরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অন্য সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্যও—যাহা আছে তাহাই আছে; কাহারও খেয়ালে উহা একটুও এদিক ওদিক হয় না।

অন্য সত্যের সহিত নৈতিক সত্যের বিশেষত্ব এইটুকু:—নৈতিক সত্য যখনই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তখনই আচরণের নিয়মরূপে উহা আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়। যদি এ কথা সত্য হয় যে, যথার্থ অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা

হইয়াছে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে। বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতার সহিত এস্থলে কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা সংযোজিত হইয়াছে। কার্য্যের যে এই অবশ্যম্ভাবিতা—ইহাই কর্ত্তব্যতা। যে নৈতিক সত্যসমূহ, জ্ঞানের চক্ষে অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ইচ্ছার নিকট কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ইচ্ছা তাহা করিতে বাধ্য। যে নৈতিক সত্য কর্ত্তব্যের মূলীভূত, সেই নৈতিক কর্ত্তব্যও, স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ অনন্যাপেক্ষ। যেমন অবশ্যম্ভাবী সত্যগুলি, ন্যূনাধিকরূপে অবশ্যম্ভাবী নহে, সেইরূপ নৈতিক কর্ত্তব্যও ন্যূনাধিক পরিমাণে কর্ত্তব্য নহে। বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে গুরু লঘুতার ধাপ আছে সত্য, কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তব্যতার মধ্যে ওরূপ কোন ধাপ নাই। কোন স্থলেই "প্রায় কর্ত্তব্য" এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না; হয় কর্ত্তব্য নয় কর্ত্তব্য নহে—ইহার মাঝামাঝি কিছু নাই।

যদি কর্ত্তব্যতা স্বতঃসিদ্ধ হয়—তাহা হইলে উহা অপরিবর্ত্তনীয় ও সার্ব্বভৌম। কারণ, যদি আজিকার কর্ত্তব্য কল্যকার কর্ত্তব্য হইতে না পারে, তাহা হইলে কর্ত্তব্যতার মধ্যেই একটা প্রভেদ আসিয়া পড়ে,—তাহা হইলে কর্ত্তব্যকে আপেক্ষিক ও আগন্তুক বলিতে হয়।

কর্ত্তব্যের এই স্বতঃসিদ্ধতা, অপরিবর্ত্তনীয়তা, সার্ব্বভৌমতা এত নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট যে, স্বার্থবাদীরা উহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, আধুনিক তত্ত্ববিদ্যা-জগতের একজন গভীরদর্শী নীতি-বেত্তা, কর্ত্তব্যের উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাঁহার বিবেচনায় ঐ গুলিই সমগ্র নীতির মূলতত্ত্ব। যে স্বার্থ কর্ত্তব্যকে ধ্বংস করে এবং যে ভাব-রস কর্ত্তব্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, ঐ উভয় হইতেই Kant কর্ত্তব্যকে পৃথক্ করিয়া কর্ত্তব্যের প্রকৃত লক্ষণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। Helvetius-এর যুগে

তিনি কর্ত্তব্যের পবিত্র নিয়ম পর্য্যন্ত উত্থান করিয়া কর্ত্তব্যের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তিনি যথেষ্ট উচ্চে ওঠেন নাই ;—তিনি কর্ত্তব্যের মূলতত্ত্বে উপনীত হন নাই।

Kant-এর মতে, যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য তাহাই ভাল, তাহাই মঙ্গল। কিন্তু যুক্তির নিয়মানুসারে,—কোন কার্য্য স্বতঃ ভাল না হইলে, সেই কার্য্য সাধন করিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতা কোথা হইতে আসিবে? কোন গচ্ছিত বস্তু নিজস্ব—এই কথা আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলিয়াই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপরাধের কার্য্য হয় নাই কি? যদি কোন কার্য্য উচিত এবং কোন কার্য্য অনুচিত হয়, তাহা হইলে এই দুই কাজের মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ অবশ্যই আছে। ভালোর উপর অবশ্যকর্ত্তব্যতাকে স্থাপন না করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপর ভালোকে স্থাপন করাও যা—কারণকে কার্য্য-রূপে গ্রহণ করাও তা'।

যদি কোন সজ্জনকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নিজের দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও সে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিল না কেন? সে উত্তর করিবে :—আত্মসাৎ না করাই তাহার কর্ত্তব্য। তাহার পরেও যদি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কিজন্য ইহা তাহার কর্ত্তব্য, সে এই প্রশ্নের উত্তরে এই কথা আমাকে বেশ বলিতে পারে :—কারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত কাজ, ভাল কাজ। ঐখানে আসিয়াই সমস্ত উত্তর থামিয়া যায়। ঐখানে সমস্ত প্রশ্নও থামিয়া যায়। এ কথা যখনই স্বীকার করা হয়,—যাহা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহা ন্যায়বুদ্ধি হইতে প্রসূত, তখনই মন পরিতুষ্ট হয়। কারণ উহা এমন একটা মূলতত্ত্বে আসিয়া পৌঁছায় যাহার ওদিকে আর কিছুই

অন্বেষণ করিবার নাই ;—কারণ, ন্যায় আপনই আপনার মূলতত্ত্ব। ন্যায়ের সহযোগেই নৈতিক সত্যগুলির সত্যতা নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভাল ও মন্দ প্রকাশ পায় সেই ভাল ও মন্দের মূলগত প্রভেদটি কি ?—না, ন্যায়। এই ন্যায়ই ধর্ম্মনীতির সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব।

ন্যায়—কোন কারণের কার্য্য নহে, কেন না, উহা অপেক্ষা উচ্চতর মূলতত্ত্বে আরোহণ করা অসম্ভব। খুব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, কর্ত্তব্য মূলতত্ত্ব নহে, কারণ কর্ত্তব্যের উপরেও আর একটি মূলতত্ত্ব আছে যাহা কর্ত্তব্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার উপর কর্ত্তব্যের প্রামাণিকতা নির্ভর করে—সে কি ?—না, ন্যায়।

যেমন মূল সত্য, আমাদের নিকট অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হইলেও—ক্যাণ্টের ভাবা-অনুসারে—উহা কম অপেক্ষিক ও কম বিষয়ীগত নহে, (Subjective) সেইরূপ নৈতিক সত্যও আমাদের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা কম বিষয়ীগত নহে ; কিন্তু যদি ক্যাণ্টের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতাতে আসিয়াই থামা যায়, তাহাহইলে অজ্ঞাতসারে সত্য ও মঙ্গলকে—একেবারে ধ্বংস করা না হউক,—দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়।

মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী প্রভেদ আছে সেই প্রভেদের মধ্যেই অবশ্যকর্ত্তব্যতার পত্তনভূমি ; আবার অবশ্য-কর্ত্তব্যতাই, যুক্তি-অনুসারে স্বাধীনতার পত্তনভূমি। যদি মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্য সেই কর্ত্তব্য সাধন করিবার শক্তিও তাহার থাকা চাই ;—ধর্ম্মনিয়ম পালন করিবার জন্য, বাসনা ও প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্যও থাকা চাই, মানুষের স্বাধীনতা থাকা চাই। বস্তুতও মানুষ স্বাধীন—তাহা না হইলে, মানব-

প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়। অবশ্যকর্ত্তব্যতার নিশ্চিততার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধীনতার নিশ্চিততাও আপনিই আসিয়া পড়ে।

অবশ্য, ইহা স্বাধীনতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ; কিন্তু Kant যে মনে করেন, ইহাই স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ প্রমাণ—এইটিই Kant-এর ভুল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি সাক্ষীচৈতন্যের প্রমাণ না মানিয়া, কেবল যুক্তির প্রমানই গ্রহণ করিয়াছেন। যুক্তির প্রমাণ কি আত্মচৈতন্যের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়া আবশ্যক নহে? আমার স্বাধীনতা আমার কি একটা নিজস্ব জিনিস নহে? পরীক্ষাবাদের সম্বন্ধে (Empirism) তাঁহার বিষম ভয় না থাকিলে, সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্য তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা হইলে যুক্তির উপরেও অসীম বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় না। আমরা যেরূপভাবে পৃথিবীর গতিকে বিশ্বাস করি, সেরূপভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে ক্রমাগত স্বাধীনতার ভাব অনুভব করি বলিয়াই আমরা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি।

কোন একটা কাজ উপস্থিত হইলে, সে কাজটা করিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিতেও পারি, নাও করিতে পারি—ইহা সত্য কি না?—এই প্রশ্নটির মধ্যেই সমস্ত স্বাধীনতার সমস্যা বিদ্যমান।

কাজ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি—এই দুইয়ের পার্থক্য প্রথমে নির্দ্ধারণ করা যাউক। অবশ্য, আমাদের অধিকাংশ মনোবৃত্তিই আমাদের ইচ্ছার সেবায় নিযুক্ত ও ইচ্ছার শাসনাধীনে অধিষ্ঠিত; কিন্তু এই ইচ্ছার আধিপত্য প্রকৃত হইলেও নিতান্ত সীমাবদ্ধ; আমি আমার বাহুকে নাড়াইতে ইচ্ছা করি,—অনেক সময়েই

নাড়াইতে সমর্থ হই। কিন্তু আমার পেশীসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে আমি অনেক সময় আমার বাহুকে নাড়াইতে সমর্থ হই না, ইত্যাদি; কার্য্যের সম্পাদন সব সময়ে আমার উপর নির্ভর করে না; কিন্তু সব সময়েই আমার উপর নির্ভর করে কি?—না আমার কার্য্য করিবার সংকল্প। বাহিরের চেষ্টা নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু আমার সংকল্প কখনই নিবারিত হইতে পারে না; নিজ ইচ্ছার রাজ্যে ইচ্ছাই সর্ব্বময় অধিপতি।

ইচ্ছার এই সর্ব্বময় আধিপত্য আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি। ইচ্ছাশক্তি কি প্রকারে প্রযুক্ত হইবে, প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই আমার অন্তরে তাহা অনুভব করি। যখন আমরা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি, সেই সময়ে আমরা ইহাও অনুভব করি যে উহার উল্টাটা করিতেও আমরা সমর্থ; আমি অনুভব করি, আমি আমার সঙ্কল্পের প্রভু—ঐ সঙ্কল্প আমি রহিত করিতেও পারি, বরাবর সমানভাবে রক্ষা করিতেও পারি, আবার পুনর্গ্রহণ করিতেও পারি। আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজটা আপাতত রহিত হইলেও, ইচ্ছা করিলে উহা যে আমি আবার করিতে পারি—এই অনুভবটি রহিত হয় না। ইচ্ছাশক্তির সহিত এই অনুভবটি সর্ব্বদাই অবস্থিত; এই অনুভবটি ইচ্ছার সমস্ত বহিরভিব্যক্তির উপরে অধিষ্ঠিত। অতএব স্বাধীনতাই ইচ্ছাশক্তির মুখ্য উপাধি, এবং এই উপাধিটি ইচ্ছার সহিত চিরবিদ্যমান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি বাসনাও নহে, প্রবৃত্তিও নহে, বরং ঠিক্ তাহার বিপরীত। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতা—বাসনা ও প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। বাসনা ও প্রবৃত্তিতেই মানুষের দাসত্ব, ইচ্ছাতেই মানুষের স্বাধীনতা। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার

প্রভেদ যদি সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে মনস্তত্ত্ববিদ্যাতে এই প্রভেদটি স্থাপন করা কর্ত্তব্য—এই দুইকে এক করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। যখন প্রবৃত্তিসমূহ নিজ খেয়ালের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে;—ইহাকেই উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। যখন অন্য প্রবৃত্তিসমূহ একটা কোন বিশেষ উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে তখনই তাহা অত্যাচার ও উৎপীড়নে পরিণত হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই স্বাধীনতা। কিন্তু এই সংগ্রামের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই; এই উদ্দেশ্যটি কি? না—বিবেকের আদেশ পালনরূপ কর্ত্তব্য-সাধন। আমাদের বিবেক এবং বিবেক যে ন্যায়ধর্ম্মকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে, সেই ন্যায়ধর্ম্মই আমাদের প্রকৃত নিয়ন্তা ও প্রভু। বিবেকের অনুসরণ করাই ইচ্ছার নিজস্ব নিয়ম, এবং সে ইচ্ছা ইচ্ছাই নহে যে এই নিয়মের অধীন না হয়। যতক্ষণ না বিবেক,—বাসনা প্রবৃত্তি ও স্বার্থের বেগকে ন্যায়ের দ্বারা প্রতিরোধ করে, ততক্ষণ আমাতে আর আমি থাকি না। বিবেক ও ন্যায়ধর্ম্মই প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে; কিন্তু মুক্ত করিয়া আবার আর একটা কিছুর দাসত্ব আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় না। কারণ—ন্যায়-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করা হয় না—প্রত্যুত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হয়, স্বাধীনতার বৈধ ব্যবহার করা হয়।

স্বাধীনতাকে এবং বিবেক ও ন্যায়ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার ঐক্য সাধনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মানুষ, বিবেকের আলোকে আলোকিত স্বাধীন জীব বলিয়াই মানুষকে পুরুষ বলা যায়।

স্বাধীনতা থাকা কিংবা না থাকা, ইহাতেই একটা জিনিসের সহিত পুরুষের প্রভেদ। জিনিস কি? না যাহা স্বাধীন নহে—

সুতরাং যাহা আপনার নিজস্ব নহে, যাহাতে আপনাত্ব কিছুই নাই ; শুধু গণনার হিসাবে তাহার একটা পৃথক্ সত্তা আছে মাত্র—সে পৃথক্ সত্তা, পুরুষের ন্যায় প্রকৃত পৃথক্‌সত্তা নহে, উহা পৃথক্ সত্তার একটা অসম্পূর্ণ নকল মাত্র।

নিজের উপর, জিনিসের কোন অধিকার নাই ; যে কেহ প্রথমে আসিয়া জিনিস্‌কে গ্রহণ করে এবং আপনার বলিয়া চিহ্নিত করে—জিনিস্ তাহারই। কোন জিনিসই নিজের নড়াচড়ার জন্য দায়ী নহে, কেন না সে, ইচ্ছা করিয়া নড়াচড়া করে না, এমন কি, সে নড়াচড়া করিতেছে কি না তাহা জানেও না। দায়িত্ব কেবল পুরুষেরই আছে ; কেন না, পুরুষ বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীন ; এবং এই বুদ্ধি ও স্বাধীনতার জন্যই পুরুষ দায়ী।

জিনিসের কোন আত্মমর্যাদার ভাব নাই ; পুরুষেরই আত্মমর্যাদা আছে। জিনিসের নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই—পুরুষ জিনিসের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করে তাহাই জিনিসের মূল্য। পুরুষ জিনিসকে ব্যবহার করাতেই জিনিসের যাহা কিছু মূল্য—জিনিস পুরুষের সাধনোপায় মাত্র।

অবশ্যকর্ত্তব্যতার সহিত স্বাধীনতার অস্তিত্বটি ভিতরে ভিতরে জড়িত ; অর্থাৎ ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য এইরূপ বলিলে—ইহা করিবার স্বাধীনতা আমার আছে—এইরূপ বুঝাইয়া যায়। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে কর্ত্তব্যও নাই এবং যেখানে কর্ত্তব্য নাই সেখানে অধিকারও নাই।

আমার মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন যিনি সম্মানের যোগ্য ; এই জন্য, তাঁহাকে সম্মান করা আমার যেরূপ কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাঁহার প্রতি অন্যকেও সম্মান প্রদর্শন করাইবার অধিকার আমার আছে।

যে পরিমাণে আমার অধিকার—ঠিক্ সেই পরিমাণে আমার কর্ত্তব্য। একটি অপরটির সাক্ষাৎ হেতু। আমার অন্তরস্থ পুরুষ যাহা কিছু করেন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা—অর্থাৎ আমার বুদ্ধি ও আমার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি আমার পবিত্র কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে, অন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার আমার কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু যেহেতু আমার অন্তরস্থ পুরুষটি শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র, সেই হেতু তিনি আমার নিজের সম্বন্ধে আমার উপর একটি কর্ত্তব্য স্থাপন করেন, এবং অন্যের সম্বন্ধে আমাকে একটি অধিকার প্রদান করেন।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পাপ, প্রভৃতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া যেমন আপনার অবনতি আমি নিজে সাধন করিতে পারি না, সেইরূপ অন্য-কেও তাহা করিতে দিতে পারি না।

পুরুষ—এক মাত্র পুরুষই অলঙ্ঘনীয়।

এই পুরুষ শুধু যে আত্মচৈতন্যের অন্তরতম মন্দিরেই অলঙ্ঘনীয় তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার সমস্ত বৈধ অভিব্যক্তির মধ্যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মধ্যে, কার্য্যের সমস্ত পরিণামের মধ্যে, এমন কি যাহার দ্বারা পুরুষ আপনার কার্য্যসাধন করিয়া লন সেই উপায় সমূহের মধ্যেও তিনি অলঙ্ঘনীয়।

সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তার পত্তনভূমি ঐখানেই। এই পুরুষই সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। পুরুষ হইতেই অন্য সমস্ত সম্পত্তির উৎপত্তি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। সম্পত্তির নিজের কোন্ স্বত্বাধিকার নাই; সম্পত্তির যিনি অধিকারী তিনিই তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ স্বামিত্ব, নিজ অধিকার, সেই সম্পত্তির উপর মুদ্রিত করিয়া দেন।

পুরুষ যখন আপনার উপর কর্তৃত্ব হারায় তখন তাহার অবনতি না হইয়া যায় না। নিজের উপর পুরুষের যে অধিকার সে অধিকারের হস্তান্তর হইতে পারে না। আপনার উপর পুরুষের যা-ইচ্ছা-তাই করিবার অধিকার নাই; পুরুষ আপনার প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করিতে পারে না, সে আপনাকে বিক্রয় করিতে পারে না, হত্যা করিতে পারে না, এবং যে দুই উপাদানে সে গঠিত—সেই স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেককে সে কোন প্রকারেই রহিত করিতে পারে না।

শিশুদিগেরও কতকগুলি অধিকার কি জন্য থাকে?—এই জন্য যে, তাহারা পরে স্বাধীন পুরুষ হইয়া উঠিবে। যে পুনর্ব্বার শৈশব-দশা প্রাপ্ত হয় সেই অতিবৃদ্ধেরই বা কতকগুলি অধিকার কেন থাকে?—যে নিতান্ত নির্ব্বোধ তাহারই বা কতকগুলি বিশেষ অধিকার কেন থাকে? যেখানে জ্ঞানের উন্মেষ ও যেখানে জ্ঞানের অবশেষ-চিহ্ন দেখা যায় সেস্থলেও লোকে স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বদ্ধ-পাগল, কিংবা যে বৃদ্ধ 'ভিমরতি' গ্রস্ত হইয়াছে তাহার কোন অধিকার থাকে না কেন? তাহার কারণ, তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে। দাসত্বপ্রথা এত ঘৃণিত হইল কেন? কারণ, ইহাতে করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত করা হয়। এই জন্য কতকগুলি বাড়াবাড়ি আত্মোৎসর্গের কাজও দোষের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। সেরূপ ধরণের আত্মোৎসর্গ করাও দোষ, কাহাকে করিতে বলাও দোষ। মানব-অধিকারের যেটি সারাংশ তাহাকে বিসর্জ্জন করিয়া আত্মোৎসর্গ করা,—স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করিয়া আত্মোৎসর্গ করা, পুরুষের আত্মমর্য্যাদাকে বিসর্জ্জন করিয়া আত্মোৎসর্গ করা,—এই সকল আত্মোৎসর্গের কাজ

বৈধ নহে। স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা কতকগুলি নৈতিক ধারণার উল্লেখ করিলাম—এই সকল নৈতিক ধারণার মধ্যেই স্বাধীনতা অধিষ্ঠিত ও স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অতঃপর আমরা পাপ পুণ্যের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাই নৈতিক ব্যাপারের শেষ উপাদান।

পাপ পুণ্যের বিচার ও দণ্ড পুরস্কারের বিচার—এই দুইটি এক-সূত্রে আবদ্ধ। বস্তুত, ভাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি এ কথা না জানিয়া যে ব্যক্তি কোন কাজ করে, তাহার সে কাজে পাপও নাই পুণ্যও নাই। যখন কোন জড় পদার্থের দ্বারা, অজ্ঞাতসারে কোন হিতজনক কিংবা অহিতজনক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তখন যেমন তাহার সেই কার্য্যে পাপও নাই পুণ্যও নাই—ইহাও সেই প্রকার। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কোন দণ্ড নাই কেন? তাহার কারণ, ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই তাহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই জন্যই অপরাধেব মোকদ্দমায়, অপরাধীর পূর্ব্ব-সংকল্পকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়। একটা বিশেষ বয়স পর্য্যন্ত বালক-অপরাধীকে লঘু দণ্ড দেওয়া হয় কেন? তাহার কারণ, ভাল মন্দের জ্ঞান ও স্বাধীনতার জ্ঞান না থাকায়, তাহার কাজকে সুকৃতিও বলা যায় না, দুষ্কৃতিও বলা যায় না; শুধু সুকৃতি ও দুষ্কৃতিই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য। যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক কোন কাজ করে, অথচ যদি তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না করে, তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ-অনুসারে তাহাকে ক্ষতিপূরণের দণ্ড দেওয়া হয় মাত্র; যাহাকে প্রকৃত দণ্ড বলে, সেরূপ দণ্ডে সে দণ্ডিত হয় না।

অবস্থাবিশেষে কোন কাজ পাপ ও কোন কাজ পুণ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কার্য্যের সেই বিশেষ অবস্থা ঘটিলে তবেই সেই

কাজে পাপ কিংবা পুণ্য প্রকাশ পায়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড পুরস্কারও আসিয়া পড়ে।

পুণ্য কাজ করিলে, পুরস্কৃত হইবার আমাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে; এবং পাপ কার্য্য করিলে, আমাদিগকে দণ্ড দিবার অধিকার অন্যেরও আছে;—এমনও বলা যাইতে পারে,—আমাদের নিজেরও আছে। কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়,—কিন্তু ইহা আসলে ঠিক্। অনেক সময় দেখা যায়, অপরাধীরা নিজেই অপরাধের জন্য উচিত দণ্ড প্রার্থনা করে। পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল কষ্ট—এ কথা যেমন সত্য, পাপের সহিত কষ্টের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—এ কথাটাও তেমনি সত্য।

পাপ পুণ্য, যেন বৈধ ঋণস্বরূপ দণ্ড পুরস্কারের দাবী করে। কিন্তু পুণ্যের সহিত পুরস্কারকে এবং পাপের সহিত দণ্ডকে একীভূত করিলে চলিবে না। তাহা হইলে, কার্য্য ও কারণকে, ক্রিয়া ও পরিণামকে এক করিয়া ফেলা হয়। এমন কি, যখন দণ্ড পুরস্কারের অস্তিত্ব থাকে না, তখনও পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব থাকে।

দণ্ড পুরস্কার পাপ পুণ্যের ফল—কিন্তু স্বয়ং পাপ পুণ্য নহে। দণ্ড পুরস্কারকে রহিত করিলেও, পাপ পুণ্যকে রহিত করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি পাপ পুণ্যকে উঠাইয়া দেও, তাহা হইলে প্রকৃত দণ্ডও থাকে না, প্রকৃত পুরস্কারও থাকে না। ধন ঐশ্বর্য্য কিংবা অযোগ্য সম্মান—এ সমস্ত শুধু ভৌতিক সুবিধা মাত্র; পুরস্কার জিনিসটা আসলে নৈতিক; পুরস্কারের মূল্য—পুরস্কারের আকারের উপর নির্ভর করে না। প্রাচীন রোমকেরা যে ওক্-গাছের পাতার মুকুটে বীরপুরুষদিগকে ভূষিত করিত, তাহা ইন্দ্রপুরীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও তাহারা মূল্যবান জ্ঞান করিত; কেননা উহা সমস্ত

রোমক জাতির প্রদত্ত পুরস্কার-স্বরূপ সম্মান-চিহ্ন। পুরস্কার কি?—না, প্রতিদান। সৎকার্য্যের যে পুরস্কার তাহা সৎকার্য্যের ঋণস্বরূপ; সৎকার্য্য না করিয়া যে পুরস্কার লাভ করা যায়, তাহা হয় ভিক্ষা নয় চৌর্য্য। দণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অপরাধের সহিত কষ্টের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। শুধু কষ্টটাই সত্য নহে, এই সম্বন্ধটাও সত্য।

দুইটি কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আবশ্যক, কেন না সে দুইটি কথাই সত্য। প্রথম কথাঃ—যাহা মঙ্গল তাহা স্বতই মঙ্গল, এবং তাহার ফল যাহাই হউকনা, তাহা সংসাধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য; দ্বিতীয় কথাঃ—মঙ্গলের পরিণাম মঙ্গলই হইয়া থাকে। মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন যে সুখ তাহার কোন নৈতিক ভাব নাই, কিন্তু মঙ্গলের ফলস্বরূপ যে সুখ তাহাই নৈতিক জগতের অন্তর্ভূত।

সুখহীন ধর্ম্ম, দুঃখহীন পাপ—একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ, এবং ইহা একটা ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা। যদি ধর্ম্ম বলিতে ত্যাগ বুঝায়—অর্থাৎ কষ্ট স্বীকার বুঝায়—তাহা হইলে সেই ত্যাগের কষ্ট সাহসপূর্ব্বক সহ্য করিলে, পরিণামে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সেই সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা গোড়ায় বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল;—ইহাই সনাতন ন্যায়বিচার। এ ং সুখের প্রলোভনে কোন পাপকর্ম্ম করিলে পরিণামে দুঃখ পাইতে হইবে—ইহাও সনাতন ন্যায়বিচার।

এখন দেখা যাউক—ভাল ও মন্দ কার্য্যের সহিত যে সুখ দুঃখের নিয়ম সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা কিরূপে সংসিদ্ধ হয়। এই পৃথিবীতেই অধিকাংশ স্থলে সেই নিয়মটি কার্য্যে পরিণত হয়। এই পৃথিবীতেই নিয়ম-শৃঙ্খলার আধিপত্য দেখা যায়। ইহলোকে কখন কখন এই নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইলেও, পাপ পুণ্যের সহিত দণ্ড পুরস্কারের

সম্বন্ধ না থাকিলেও, ইহা নিশ্চিত—অখণ্ড মঙ্গলের নিয়ম, পাপ পুণ্যের নিয়ম, কর্ত্তব্যের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। একথা আমাদের জ্ঞান কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস—যিনি আমাদের অন্তরে নৈতিক শৃঙ্খলার জ্ঞান ও ভাব নিহিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ইহাকে কখনই ব্যর্থ হইতে দিবেন না,—শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, ধর্ম্মের সহিত সুখের সমন্বয় তিনি অবশ্যই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন,—কি উপায়ে করিবেন সে তিনিই জানেন। সেই দূর-ভবিষ্যতের রহস্য উদ্ঘাটনের এখনও আমাদের সময় হয় নাই। এখন আমরা কেবল নৈতিক সত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইব—এখন আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

নৈতিক ব্যাপারের আর একটি উপাদান হৃদয়ের ভাব।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিবৃত করিয়া আমরা এই জটিল নৈতিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ শেষ করিব। এই হৃদয়ের ভাব, সমস্ত নৈতিক ব্যাপারের অনুসঙ্গী, এমন কি, প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, হৃদয়ের ভাব সেই যোগের অনুভূতি মানব-আত্মায় আনিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের নিয়মকে এই হৃদয়ের ভাবই সাক্ষাৎভাবে ও অলক্ষভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করে। এই হৃদয়ের ভাবই সমাজ-প্রতিষ্ঠিত দণ্ড-পুরস্কারের প্রমাণস্বরূপ। ইহাই ঐশ্বরিক দণ্ড-পুরস্কারের আভ্যন্তরিক আদর্শ। পরলোকের ভাব—স্বর্গের ভাব আমাদের হৃদয়েতেই প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গ-কল্পনা করিবার সময় আমরা আমাদের হৃদয়কেই স্বর্গে স্থাপিত করি।

কোন সৎকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া (সেই সৎকার্য্যের কর্ত্তা আমিই

হই কিংবা অন্যই হউক) আমার অন্তরে একটি সুখ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। সুন্দর পদার্থ দেখিয়া যেরূপ সুখ হয়, ইহা কতকটা সেই প্রকারের সুখ। আবার কোন কুকার্য্য দেখিলে, আমাদের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হয়; কোন কুৎসিৎ বস্তু দেখিলে যে ভাব হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ ভাব। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে প্রীতিজনক অপ্রীতিজনক অনুভূতি বলি, ইহা তাহা হইতে খুবই ভিন্ন।

কোন ভাল কার্য্য করিয়া আমাদের মনে যে সন্তোষ জন্মে, উহা অন্য কোন সুখের মত নহে। ইহা স্বার্থ কিংবা গর্ব্বের উল্লাস নহে। ইহা ধর্ম্মজনিত বিমল আত্ম-প্রসাদ। কোন কুকার্য্য করিলে আমাদের পীড়িত অন্তরাত্মা একটা ব্যথা অনুভব করে; আমাদের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হয়।

অন্যকৃত সৎকার্য্য দেখিলেও আমাদের আত্মা অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। অন্যের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উত্তম—তাহার সহিত আমাদের হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সায় দেয়, তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি হয়। স্বার্থের দ্বারা বিচলিত না হইলে, আমরা স্বভাবতই,—যে ভাল কাজ করে, তাহার স্থানে আপনাকে স্থাপন করি; সে যে ভাবে উত্তেজিত, আমরাও কতকটা সেই ভাবে উত্তেজিত হই।

মন্দ কার্য্য দেখিলে সেইরূপ আমাদের মনে বিরাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। যিনি মানব-প্রকৃতির স্রষ্টা, তিনি আমাদের মঙ্গল অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার উদ্দেশেই এই সকল ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন। এই সকল ভাব ধর্ম্মের পত্তনভূমি না হইলেও, উহারা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরম সহায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, উহারাই তাহার কল্যাণকর সাক্ষী।

নীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমরা যথাযথরূপে বিবৃত করিলাম। যাহা কিছু প্রকৃত তথ্যের বাহিরে—তৎসমস্ত শশ-বিষাণ সদৃশ নিতান্তই অলীক। সেই সব তথ্যের মধ্যে প্রভেদ নির্ণীত না হইলে সমস্তই বিশৃঙ্খলা।

আমরা এই নৈতিকতত্ত্বের আলোচনায় সহজ জ্ঞান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি। কারণ, সহজজ্ঞানকে অবিশ্বাস করা প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে, তাহাকে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এবং সেই জন্যই সহজ জ্ঞানকে গোড়ায় মানিয়া লইতে হয়। প্রথমে আমরা স্থূলভাবে নৈতিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছি। পরে, নীতির উপাদান সকল বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ কি, তাহাও দেখাইয়াছি।

সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটি সর্ব্বাদিম তথ্যে উপনীত হইয়াছি—সে তথ্যটি নিজের উপরেই নির্ভর করে—সে তথ্যটি কি?—না, মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের বিচারক্রিয়া। আমরা এই তথ্যের নিকট অন্যান্য তথ্যকে বলিদান দিই নাই। আমরা শুধু বলিয়াছি, কালের হিসাবে ও গুরুত্বের হিসাবে এইটিই সর্ব্বপ্রথম।

সত্য ও সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচারক্রিয়ার সহিত ইহার একটা গভীর সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আমরা তাই দেখিতে পাই,—নীতি, দর্শন ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগ আছে। মূলে, মঙ্গলের সহিত সত্যের মিল থাকিলেও সত্যের সহিত মঙ্গলের পার্থক্য এইটুকু যে—মঙ্গল ব্যবহারিক সত্য। সৎকার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য। সৎকার্য্য ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা—এই দুইটি ভাব অবিচ্ছেদ্য হইলেও সর্ব্ব-

তোভাবে এক নহে। কেন না, অবশ্য-কর্ত্তব্যতা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতেই, মঙ্গল হইতেই অবশ্যকর্ত্তব্যতা,—বিশ্বজনীন ভাব ও স্ব-সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্য—ইহাই নৈতিক নিয়ম। ইহাই সমস্ত নীতির ভিত্তিভূমি। এই জন্য আমরা স্বার্থের নীতি ও ভাবের নীতিকে প্রকৃত নীতি হইতে পৃথক্ করিয়াছি। আমরা সকল তথ্যই মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু এক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করি নাই।

মানুষের জ্ঞানে যেরূপ নৈতিক নিয়ম, মানুষের কাজে সেইরূপ স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে অবশ্য-কর্ত্তব্যতা হইতে সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা যায়; শুধু তাহা নহে, উহাই স্বাধীনতার একটি অকাট্য প্রমাণ।

মানুষ স্বাধীন জীব হইয়াও কর্ত্তব্যের অধীন;—ইহাতেই মানুষ নীতিমান্ পুরুষ। পুরুষ—এই ধারণাটির মধ্যে অনেকগুলি নৈতিক ভাবের সমাবেশ আছে। তাহার মধ্যে অধিকারের ভাব একটি। পুরুষেরই অধিকার থাকিতে পারে।

এই সকল ধারণার মধ্যে, পাপ পুণ্যের ধারণাকেও ধরিতে হইবে।

অন্য ধারণাগুলি এই পাপপুণ্যের ধারণা হইতে যেন 'মঞ্জুরী' প্রাপ্ত হয়।

পাপপুণ্য বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দের ভেদ, অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, স্বাধীনতা—এই সমস্ত বুঝাইয়া যায়, এবং উহা হইতেই দণ্ড-পুরস্কারের ধারণাটিও উৎপন্ন হয়।

মঙ্গল যদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তবেই উহা অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে। তাই, মঙ্গলের প্রকৃতি জ্ঞানমূলক—এই কথা

আমরা বারম্বার বলিয়াছি, অথচ উহার মধ্যে যে ভাবের উপাদানটি আছে তাহাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।

আমাদের প্রত্যেক নৈতিক বিচার-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সেই সব বিচার-ক্রিয়ার সহিত হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সায় দেয়। যে কার্য্য আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি, সে কার্য্যে আমাদের সুখানুভব হয়; কোন একটা কর্ত্তব্যকাজ সাধন করিয়াছি মনে করিলে আমাদের মনে একপ্রকার অপূর্ব্ব সন্তোষ জন্মে।

যদিও কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে—কর্ত্তব্যের সহিত হৃদয়ের ভাব যদি সংযোজিত না হইত, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্যের নিয়মরূপ উচ্চ আদর্শটি দুর্ব্বল মানবের পক্ষে প্রায় দুরধিগম্য হইয়া পড়িত। আমাদের জ্ঞানের অনিশ্চিত আলোকের অভাব পূরণ করিবার জন্যই হউক, অথবা কোন অস্পষ্ট কিংবা কষ্টকর কর্ত্তব্যস্থলে আমাদের দুর্ব্বল সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই হউক,—হৃদয়ের ভাবরূপ ঈশ্বরের একটি মহৎ দান আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহের প্রচণ্ড আবেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক। যেমন সত্যের দ্বারা মন আলোকিত হয়, তেমনি ভাবের দ্বারা আত্মা উত্তেজিত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। বীর-প্রবর Assas স্বায় সৈন্যকে বাঁচাইবার জন্য, আপনাকে যে বলিদান দিয়াছিলেন সে কেবল জলন্ত হৃদয়ের আবেগে—প্রশান্ত জ্ঞানের প্ররোচনায় নহে। অতএব ভাবের আধিপত্যকে যেন আমরা দুর্ব্বল করিয়া না ফেলি; হৃদয়ের উৎসাহকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করি—সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করি। এই হৃদয়ের উৎস হইতেই মহৎ-কার্য্য-সকল প্রসূত হয়।

আমাদের নীতিতন্ত্র হইতে স্বার্থকে কি একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে?—না। মানব-আত্মার মধ্যে একটা সুখের বাসনা আছে—ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই বাসনটি—একটা বাস্তব তথ্য; অতএব যে নীতিতন্ত্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এই বাসনাটিরও একটা স্থান থাকা আবশ্যক। মানব-প্রকৃতির নানা লক্ষ্যের মধ্যে সুখও একটি; তবে, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য কিংবা মুখ্য লক্ষ্য নহে।

মানবের নৈতিক প্রকৃতির ব্যবস্থা অতি চমৎকার! মঙ্গলই তাহার চরম উদ্দেশ্য, ধর্ম্মই তাহার নিয়ম। অনেক সময় ইহার দরুণ মানুষকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, কিন্তু এই কষ্টের দ্বারাই মনুষ্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সত্য, এই ধর্ম্মের নিয়মটি বড়ই কঠোর এবং ইহা সুখস্পৃহার বিরোধী। কিন্তু ভয় নাই:—যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা, সেই মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর এই কঠোর কর্ত্তব্যের পাশাপাশি, হৃদয়ের ভাবরূপ একটি কমনীয় ও মধুর শক্তি আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয়াছেন। তিনি সাধারণত ধর্ম্মের সহিত সুখকে সংযোজিত করিয়াছেন;—অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমস্থলও আছে—এবং সেই জন্য তিনি আর একটা জিনিস দিয়াছেন,—জীবনপথের শেষ প্রান্তে আশাকে স্থাপন করিয়াছেন!

আমাদের নীতিপদ্ধতিটি কি—এক্ষণে তাহা জানা গেল। প্রত্যেক তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করা, তথ্যসমূহের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা ব্যক্ত করা—ইহাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা।

ইহা ব্যতীত, নীতিসম্বন্ধে আমরা কোন নূতন কথা বলি নাই। একটিমাত্র তথ্য স্বীকার করা এবং সেই তথ্যের নিকট অন্যান্য তথ্যকে বলিদান দেওয়া—ইহাই প্রচলিত পন্থা। যে সকল তথ্য

আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি, আমাদের নৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তাহার প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ কাজ প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় বড় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই সত্যের একটা দিক্‌মাত্র দেখিয়াছেন।

আজিকার দিনে, কে আবার এপিকিউরসের মতে ফিরিয়া আসিতে পারে—যে এপিকিউরাস, সমস্ত প্রত্যক্ষ তথ্যের বিরুদ্ধে, সহজ জ্ঞানের বিরুদ্ধে, এমন কি সমস্ত নৈতিক ভাবের বিরুদ্ধে, একমাত্র সুখলিপ্সার উপরেই কর্ত্তব্যকে, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন? কেহ যদি ঐ মতে আবার ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার ঘোর অন্ধতা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতারই পরিচয় দিবেন। পক্ষান্তরে মঙ্গলের (abstract idea) সার-ধারণার নিকট, সুখকে, সকল প্রকার পুরস্কারের আশাকে কি আমরা বলিদান দিব? ষ্টোয়িক সম্প্রদায় তাহাই করিয়াছিল। ক্যাণ্টের ন্যায় আমরা কি সমস্ত নীতিকে অবশ্যকর্ত্তব্যতার মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিব? তাহা হইলে নীতিকে আরও সংকীর্ণ করিয়া ফেলা হইবে।

এক-ঝোঁকা সিদ্ধান্তের দিন চলিয়া গিয়াছে; আবার উহা আরম্ভ করিলে, দার্শনিক সংগ্রামকে চিরস্থায়ী করা হইবে। প্রত্যেক দর্শনই একটা-না-একটা বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকেই সেই তথ্যটিকে কোন প্রকারে বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; সুতরাং প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে একবার জয়ী ও আর একবার পরাজিত হয়; এইরূপে একই দর্শনতন্ত্র ফিরিয়া-ঘুরিয়া পুনঃ পুনঃ জনসমাজে আবির্ভূত হয়। যতক্ষণ সমস্ত দর্শনতন্ত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইয়া আর একটা নূতন দর্শন প্রকাশিত হইবে, ততক্ষণ এই সংগ্রাম কখনই থামিবে না।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন—এরূপ দর্শনতন্ত্রের কোন একটা চরিত্রগত বিশেষত্ব থাকিবে না। কিন্তু সত্য ছাড়া, দর্শনের নিকট হইতে আর কোন বিশেষত্ব দাবী করিলে, দর্শনকে লইয়া ছেলেখেলা করা হয় না কি? এই বলিয়া কি কেহ আক্ষেপ করেন যে, যেহেতু আধুনিক রসায়নের অনুশীলন কেবল তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং উহা একটি মাত্র মূলপদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হয় না, অতএব উহার কোন চরিত্রগত বিশেষত্ব নাই? মানব-প্রকৃতির সমস্ত অবয়বগুলি যথাপরিমানে অঙ্কিত করিয়া মানব-প্রকৃতির একটি যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করাই প্রকৃত দর্শনের কাজ। আমাদের দর্শনতন্ত্রের যে একতা—সে মানব-আত্মার একতা। মানব-আত্মা মাত্রই মঙ্গলকে উপলব্ধি করে; মঙ্গলকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া জানে; মঙ্গলকে ভালবাসে; জানে—ভালমন্দ কাজ করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে; জানে—তাহার কর্ম্ম অনুসারে সে দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, সুখ দুঃখ ভোগ করিবে। আমাদের দর্শনতন্ত্রে আর এক প্রকারের একতা আছে—অর্থাৎ সমস্ত তথ্যের মধ্যে একটা অখণ্ড ঘনিষ্ঠ যোগ আছে;—সকল তথ্যই পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পরকে পোষণ করে।

একটিমাত্র তত্ত্ব ছাড়া আর কোন তত্ত্বকে দর্শনের মধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না—ইহাকে যদি একতা বলে, তবে এরূপ একতা স্থাপন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কেবল বিশুদ্ধ গণিতরাজ্যেই এরূপ একতা সম্ভব। গণিতশাস্ত্র তথ্য লইয়া ব্যস্ত নহে; গণিত যে পদার্থের অনুশীলন করে, সরলীকরণের উদ্দেশে তাহাকে সংক্ষেপ করিবার জন্যই তাহার ক্রমাগত চেষ্টা;—এইরূপে উহা কতকগুলি সার-ধারণামাত্রে পরিণত হয়। তথ্যমূলক বিজ্ঞান কতকগুলি সমী-

করণের (equation) সমস্যা মাত্র নহে। পদার্থসমূহের মধ্যে যে প্রাণ আছে এই বিজ্ঞান সেই প্রাণকে সন্ধান করে, এবং প্রাণের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহারও অন্বেষণ করে।

পঞ্চম উপদেশ।

আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমরা জানিয়াছি—নৈতিক হিসাবে, আমাদের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে; আমরা জানিয়াছি এই ভাল মন্দের প্রভেদ হইতেই অবশ্যকরণীয়তার উৎপত্তি, একটা নিয়মের উৎপত্তি, অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা এখনও জানিতে পারি নাই—এই কর্ত্তব্যগুলি কি? শুধু কর্ত্তব্য-নীতির সাধারণ মূলতত্বটি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, কার্য্যত ইহার কিরূপ প্রয়োগ হয়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশ্যক।

যদি, কোন সত্য অবশ্যকরণীয় হইলেই তাহা কর্ত্তব্য নামে অভিহিত হয় এবং যদি শুধু প্রজ্ঞার দ্বারাই সেই সত্য জানা যাইতে পারে, তাহা হইলে, কর্ত্তব্য-নিয়মকে মানিয়া চলাও যা', প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলাও তা'—একই কথা।

কিন্তু "প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলা"—এই কথাটি বড়ই অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মধারণামূলক। আমাদের কোন কার্য্য প্রজ্ঞার অনুযায়ী কিংবা প্রজ্ঞার অনুযায়ী নহে, তাহার কিরূপে নিশ্চয় হইবে?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার একটি লক্ষণ সার্ব্বভৌমতা; আমাদের কার্য্য এই প্রজ্ঞার অনুযায়ী হইতে হইলে, এই কার্য্যেতেও কতকটা সার্ব্বভৌমের লক্ষণ থাকা আবশ্যক। আবার আমাদের কার্য্যপ্রবর্ত্তক অভিপ্রায়ের উপর আমাদের কার্য্যের নৈতিকতা নির্ভর করে; যদি কোন কাজ ভাল হয়, তবে সেই কাজের অভিপ্রায় হইতেও প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রতিভাত হয়। কি নিদর্শন দেখিয়া বুঝা যাইবে যে অমুক কাজ প্রজ্ঞার অনুযায়ী—কিংবা সেই কাজ ভালো? যদি

কার্য্যপ্রবর্ত্তক কোন অভিপ্রায়কে বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এমন একটি নীতিসূত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, যাহা প্রজ্ঞা সমস্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীবের অন্তরে স্থাপিত করিয়াছেন—তাহা হইলে বুঝিব উহাই প্রজ্ঞানুযায়ী কাজের নিদর্শন—ভাল কাজের নিদর্শন। তদ্বিপরীতই মন্দ কাজ। যদি এইরূপ কোন অভিপ্রায়কে সার্ব্বভৌম নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিব সেই কাজ ভালও নহে মন্দও নহে,—উহা উপেক্ষণীয়। জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট এইরূপ মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যের নৈতিকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ন্যায়ের কঠোর অবয়বপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেরূপ যুক্তির দ্বারা সত্য ও ভ্রান্তি নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ উক্ত নৈতিক মানদণ্ডের দ্বারা, আমাদের কি কর্ত্তব্য, ও কি কর্ত্তব্য নহে, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

প্রজ্ঞাকে অনুসরণ করা—ইহা নিজেই একটি কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্যটি—প্রজ্ঞার সহিত স্বাধীনতার যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এমন কি, একথা বলা যাইতে পারে,—আমাদের শুধু একটিমাত্র কর্ত্তব্য, সেটি কি?—না প্রজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা। কিন্তু মানুষ, বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায়, এই সাধারণ কর্ত্তব্যটি, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমার নিজের সহিত আমার যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ এরূপ আর কাহারও সহিত নহে। অন্যান্য কার্য্যের যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ মানুষ যে সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও বিষয়, তাহারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে। এই শ্রেণীর কার্য্যের যে কর্ত্তব্য উহাই মানুষের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

প্রথম দৃষ্টিতে উহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় যে, নিজের প্রতি মানুষের আবার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে।

মানুষ স্বাধীন বলিয়া, মানুষ আপনার নিজস্ব। আমার সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় কে?—না, আমি নিজে;—ইহাই আমার প্রথম স্বত্বাধিকার; ইহার উপর অন্যান্য স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত। স্বত্বাধিকারের মূল কথাটি কি?—না স্বত্বাধিকারী নিজ ইচ্ছামত তাঁহার সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারেন; অতএব আমার নিজের সম্বন্ধে আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কি আমি করিতে পারি না?

না, তাহা পারি না। মানুষ স্বাধীন, নিজের উপর মানুষের অধিকার আছে বটে—তাই বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে, যে, মানুষ আপনার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। বরং মানুষের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই,—বুদ্ধি আছে বলিয়াই, আমার মনে হয়, মানুষ তাহার স্বাধীনতার ও তাহার বুদ্ধির অবনতি সাধন করিতে পারে না। স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করাই স্বাধীনতার অপব্যবহার করা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি:—স্বাধীনতা যে শুধু অন্যের নিকটেই পূজ্য তাহা নহে, উহা নিজের নিকটেও পূজ্য।

কর্ত্তব্যের উদার অনুশাসনে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে বদ্ধিত না করিয়া, যদি আমরা তাহাকে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমরা অভ্যন্তরস্থ এমন একটি জিনিসকে হীন করিয়া ফেলি, যাহা আমাদের নিজের ও অপরের শ্রদ্ধার বিষয়। মানুষ একটা জিনিস নহে. সুতরাং নিজের প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করিবার অধিকার মানুষের নাই।

যদি আমার নিজের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, তবে সে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নহে—সে সেই স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কর্ত্তব্য

—যে স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া আমার নৈতিক "পুরুষটি" সংগঠিত হইয়াছে।

কোন্ জিনিসটি আমাদের নিজের, এবং কোন্ জিনিসটি বিশ্বমানবের তাহা ভাল করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে মানবপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সমস্ত উপাদানগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু এই সকল উপাদানগুলি বিশেষবিশেষ ব্যক্তির অন্তরে বিশেষ-বিশেষ প্রকারে সন্নিবিষ্ট। এই বিশেষত্ব হইতেই ব্যক্তি গঠিত হয়, কিন্তু পুরুষ গঠিত হয় না। আমাদের অন্তরে যে পুরুষটি আছেন কেবল সেই পুরুষই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ও পবিত্র, কারণ সেই পুরুষই বিশ্বমানবের একমাত্র প্রতিনিধি। যাহাতে নৈতিক পুরুষের কোন আস্থা নাই, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে, তাহা উপেক্ষণীয়। ভালও নহে, মন্দও নহে—এই সীমা-গণ্ডির মধ্যেই আমি আমার যাহা অভিরুচি তাহা করিতে পারি, এমন কি আমার খেয়ালও চরিতার্থ করিতে পারি, কারণ উহার মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই,—উহার মধ্যে ভালও নাই—মন্দও নাই। কিন্তু যখনই কোন কার্য্য, নৈতিক পুরুষের সংস্পর্শে আসে, তখনই আমার ইচ্ছা তাঁহার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়, প্রজ্ঞার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়—যে প্রজ্ঞা স্বাধীনতাকে কিছুতেই নিজের বিরুদ্ধে যাইতে দেয় না। তাহার দৃষ্টান্ত,—যদি আমি কোন খেয়ালের বশে, কিংবা বিষাদের আবেগে, কিংবা আর কোন অভিপ্রায়ে, আমার শরীরকে অত্যন্ত নিগ্রহ করি; যদি দীর্ঘকাল অনিদ্রায় যাপন করি, সমস্ত নির্দোষ সুখ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করি, এবং এইরূপে যদি আমি আমার স্বাস্থ্যের হানি করি, জীবনকে বিপন্ন করি, বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করি—তাহা হইলে এই সব কাজ আর উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তখন

সেই সব কাজের পরিণাম-স্বরূপ আমাদের রোগ, মৃত্যু, কিংবা উন্মাদ মহাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, কেন না আমরা স্বেচ্ছাক্রমেই উহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি।

আমার অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য ;—এই বাধ্যতা, এই অবশ্যকরণীয়তা আমি নিজে স্থাপন করি নাই, সুতরাং আমি নিজে উহাকে ধ্বংস করিতেও পারি না। চুক্তিকারী দুই পক্ষ রাজি হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যেমন স্বীয় চুক্তি রহিত করিতে পারে, সেইরূপ স্বেচ্ছাকৃত কোন চুক্তির উপর কি এই আত্মশ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত? এই চুক্তির দুই পক্ষই কি "আমি"?—না। ইহার এক পক্ষ আমি নহি, ইহার এক পক্ষ বিশ্বমানব ;—বিশ্বমানবের প্রতিনিধি আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষ। এবং এস্থলে ইহা কোন বন্দোবস্তও নহে, চুক্তিও নহে। নৈতিক পুরুষটি শুধু আমাদের অন্তরে আছেন বলিয়াই আমরা তাঁহার শাসন মানিতে বাধ্য ;—তাঁহার সহিত আমাদের কোন বন্দোবস্ত নাই—কোন চুক্তি নাই। এ বাধ্যতার বন্ধন অচ্ছেদ্য।

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষকে শ্রদ্ধা করা—এই সাধারণ মূলতত্ত্বটি হইতেই আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সমুৎপন্ন। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

যে কর্ত্তব্যটি সর্ব্বপ্রধান, যে কর্ত্তব্যটি আর সমস্ত কর্ত্তব্যের উপর আধিপত্য করে, সে কর্ত্তব্যটি কি?—না আপনার প্রভূ হইয়া থাকা। দুই প্রকারে আপনার উপর প্রভুত্ব আমরা হারাইতে পারি ;—এক কাম ক্রোধ প্রভৃতি উন্মাদনী প্রবৃত্তিসমূহের দ্বারা নীয়মান হইয়া, আর এক—বিষাদ প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া। উভয়ই সমান দুর্ব্বলতা। আমার নিজের উপর ও সমাজের উপর উহাদের কিরূপ কার্য্যফল, তাহা এস্থলে আমি কিছুই বলিতেছি না।

উহারা স্বতই মন্দ; কেন না, উহারা মানুষের প্রকৃত গৌরবের উপর আঘাত করে, স্বাধীনতার লাঘব করে, বুদ্ধিকে বিক্ষুব্ধ করে।

অগ্রপশ্চাদ্ বিবেচনা বা পরিণাম-বুদ্ধি—ইহা একটি উচ্চতর সদ্-গুণ। আমি সেই সুবিবেচনার কথা বলিতেছি, যাহা সকল কাজেরই মানদণ্ডস্বরূপ;—সেই প্রাগ্‌দৃষ্টি, সেই দূরদৃষ্টি—যাহা বীরত্বনামধারী "গোঁয়ার্ত্তিমি" হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করে; বীরত্বনামধারী এইজন্য বলিতেছি, কেননা, কখন কখন, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতাও এই নামটি অন্যায়রূপে দখল করিয়া বসে। বীরত্ব যুক্তির দ্বারা চালিত হয় না সত্য; কিন্তু যুক্তির দ্বারা চালিত না হইলেও, বীরত্বের যুক্তিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। আমরা সময়ে সময়ে বীর হইতে পারি, কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনে, সুবিবেচক ও পরিণামদর্শী হইতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের জীবনের রাশরজ্জু আমাদের হাতে থাকা চাই, উপেক্ষা কিংবা গোঁয়া-র্ত্তিমির দ্বারা আমরা যেন অনর্থক বাধা বিঘ্ন প্রস্তুত না করি, অনর্থক নূতন বিপদের সৃষ্টি না করি। অবশ্য, সাহসী হওয়া প্রার্থনীয়, কিন্তু এই পরিণামদর্শিতাই—সাহসের মূলতত্ত্ব না হউক, সাহসের একটা নিয়ম; কেননা, প্রকৃত সাহস একটা অন্ধ আবেগ মাত্র নহে; ইহা সুখ্যাত ধীরতা,—বিপদকালে বিচলিত না হওয়া, আপনার উপর দখল হারাইয়া না ফেলা। এই পরিণামবুদ্ধি, মিতাচারিতা সম্বন্ধেও শিক্ষা দেয়; ইহা আমাদের আত্মার সেই সাম্যভাব রক্ষা করে, যাহার অভাবে আমরা ন্যায়কে ঠিক্ চিনিতে পারি না, ন্যায়বুদ্ধি-অনুসারে কাজ করিতে পারি না। পুরাকালের লোকেরা এই জন্যই পরিণাম-দর্শিতাকে সকল সদ্‌গুণের জননী ও রক্ষক বলিতেন। এই পরিণাম-বুদ্ধি, স্বাধীন ইচ্ছাকে সুবিবেচনার দ্বারা পরিশাসন করা ভিন্ন আর

কিছুই নহে; আবার যে স্বাধীনতা বুদ্ধিবিবেচনার হাত-ছাড়া হয়, তাহাই অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর; একদিকে সুশৃঙ্খলা, আমাদের মনোবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা-অনুসারে ন্যায্য অধীনতা সংস্থাপন; অন্য দিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা ও বিদ্রোহিতা।

সত্যবাদিতা আর একটি মহদ্‌গুণ। সত্যের সহিত মনুষ্যের যে একটা স্বাভাবিক বন্ধন কাছে, মিথ্যাবাদিতা সেই বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্যের গৌরব নষ্ট করে। এই জন্যই মিথ্যা কথনের ন্যায় গুরুতর অপমান আর নাই, এবং এই জন্যই অকপটতা ও ঋজুতা এত সম্মানিত হইয়া থাকে।

আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষের যাহা সাধন-যন্ত্র সেই সাধন যন্ত্রকে আঘাত করিলে, স্বয়ং নৈতিক পুরুষটিকেই আঘাত করা হয়। এই অধিকারসূত্রেই, স্বকীয় শরীরের প্রতি মানুষের কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য আছে। এই শরীর আমাদের একটা বাধাও হইতে পারে, কার্য্যসাধনের একটা উপায়ও হইতে পারে। যাহার দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, শরীরের বলাধান হয়, তাহা যদি শরীরকে না দেওয়া হয়, যদি শরীরকে অতিমাত্র উত্তেজিত করিয়া তাহা হইতে অধিক কাজ আদায় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শরীর অবসন্ন হইবে, শরীরের অপব্যবহারে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। আবার যদি শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দেও, যদি তাহার সমস্ত উদ্দাম বাসনাকে চরিতার্থ করিতে দেও, যদি তুমি শরীরের দাস হইয়া পড়—সে আরও খারাপ। যে শরীর আসলে আত্মার দাস সেই শরীরকে যদি দুর্ব্বল করিয়া ফেল, তাহা হইলে আত্মারই হানি করা হইবে; আরও হানি করা হইবে যদি তুমি আত্মাকে শরীরের দাস করিয়া ফেল।

কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটিকে সম্মান করিলেই

যথেষ্ট হইবে না, উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট হইতে যেমনটি পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের হাতে যাহাতে প্রত্যর্পণ করিতে পারি, তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। আবার নিত্য সাধনা ব্যতীত এই বিষয়ে সুসিদ্ধ হওয়াও সুকঠিন। প্রকৃতিরাজ্যে সর্ব্বত্রই দেখা যায়,—নিকৃষ্ট জীবেরা, ইচ্ছা না করিয়া, ও না বুঝিয়া, বিনাচেষ্টাতেই স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে অন্যরূপ নিয়ম। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্য মনোবৃত্তিসমূহ অবসাদগ্রস্ত ও জড়তাগ্রস্ত হইয়া কলুষিত হইয়া পড়ে; তখন উদ্দাম অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হইয়া, ঐ সকল মনোবৃত্তি অপথে গমন করে। ফলত, আপনার দ্বারা শাসিত হইয়াই, আপনার দ্বারা শিক্ষিত হইয়াই, মানুষ বড় হইয়াছে।

সর্ব্বাগ্রে, স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া মানুষের ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। ফলত একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই সত্য ও মঙ্গলকে স্পষ্টরূপে দেখিতে আমাদিগকে সমর্থ করে, এবং একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই স্বাধীনতাকে স্বকীয় প্রযত্নের ন্যায্য বিষয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে যথাপথে চালিত করে। বুদ্ধিবৃত্তি মনকে সর্ব্বদাই কোন প্রকার কাজে নিযুক্ত রাখে, শরীরের ন্যায় মনকেও সুদৃঢ় করে, নিদ্রালু হইলে তাহাকে জাগাইয়া তুলে; যখন দুষ্ট অশ্বের ন্যায় রাশরজ্জু না মানিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখে, এবং তাহার নিকট নূতন নূতন বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে। কেননা, মনকে সর্ব্বদাই বিবিধ সম্পদে বিভূষিত করিতে পারিলেই মনের দৈন্য নিবারিত হয়। আলস্য মনকে অসাড় ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সুনিয়মিত কাজ মনকে উত্তেজিত করে, সুদৃঢ় করে; এবং এইরূপ

কাজ করা আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আমাদের অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় স্বাধীনতারও একটা শিক্ষা আছে। কখন শরীরকে দমন করিয়া, কখন স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে শাসন করিয়া, বিশেষত প্রবৃত্তিসমূহের আবেগকে প্রতিরোধ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে শিক্ষা করি। বাধাবিঘ্নের সহিত প্রতিপদে আমাদিগের সংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়াই আমরা স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হই।

এমন কি, আমাদের ভাববৃত্তিরও একটা শিক্ষা আছে। ভাগ্যবান তাহারা যাহাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহরূপ স্বর্গীয় অগ্নি স্বভাবতই বিদ্যমান। ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য। এমন কোন আত্মা নাই যার অন্তরের প্রচ্ছন্ন স্তরে কোন একটা উচ্চভাবের খনি সঞ্চিত নাই। ইহাকে আবিষ্কার করা চাই, অনুসরণ করা চাই, এই পথে যদি কোন বাধা থাকে তাহাকে অপসারিত করা চাই, যদি কোন অনুকূল জিনিস থাকে, তাহার অনুসন্ধান করা চাই, এবং অবিশ্রান্ত যত্নের দ্বারা তাহা হইতে অল্পে অল্পে রত্ন উদ্ধার করা চাই। যদি কোন একটা বিশেষ উচ্চভাব তাহার অন্তরে স্পষ্টাকারে নাও থাকে, অন্তত যে উচ্চভাবের অঙ্কুর তাহার অন্তরে নিহিত আছে, তাহারই পুষ্টিসাধন করা আবশ্যক। সেই ভাবের স্রোতে সময়ে সময়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কি বুদ্ধিবৃত্তিকেও তাহার সাহায্যার্থে আহ্বান করিতে হইবে; কেননা সত্য ও মঙ্গলকে যতই জানা যায়, ততই তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের ভাববৃত্তি হইতে যাহা কিছু ধার করে, পরে তাহা আবার সুদসমেত ফিরিয়া পায়। মহৎভাবসমূহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তি, জমী

দার্শনিকদিগের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়।

অন্যের সহিত সংশ্রব যদি রহিতও হয়, তবু মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে। যতক্ষণ তাহার কতকটা বুদ্ধি থাকে, কতকটা স্বাধীনতা থাকে, ততক্ষণ তাহার অন্তরে মঙ্গলের ধারণা এবং সেই সঙ্গে কর্ত্তব্যের ধারণাও বিদ্যমান থাকে। যদি আমরা কোন মরুদ্বীপে নিক্ষিপ্ত হই, সেখানেও কর্ত্তব্য আমাদিগকে অনুসরণ করে। স্বকীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীনতার প্রতি কোন বুদ্ধিমান ও স্বাধীন জীবের যে কর্ত্তব্য আছে,—কতকগুলি বাহ্য অবস্থা, সেই কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিবে,—এ একটা অসঙ্গত কথা। কোন গভীর বিজনতার মধ্যে থাকিয়াও সে অনুভব করে—সে একটা নিয়মের অধীন, তাহার উপরে সেই নিয়মের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি সতত নিপতিত রহিয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে যেমন একটা বিষম যন্ত্রণা তেমনি আবার গৌরবের বিষয়।

আমার অন্তরে আছে বলিয়াই যে নৈতিক পুরুষটি আমার নিকট পবিত্র তাহা নহে,—নৈতিক পুরুষ বলিয়াই পবিত্র। নৈতিক পুরুষটি স্বতই শ্রদ্ধেয়; নৈতিক পুরুষ সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার পাত্র।

এই নৈতিক পুরুষটি যেমন আমার মধ্যে আছেন, তেমনি তোমার মধ্যেও আছেন;—উভয়ত্রই আছেন একই অধিকার-সূত্রে। আমার নিজের সম্বন্ধে, তিনি আমার উপর যে কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত করেন, সেই কর্ত্তব্যটি আবার তোমার মধ্যে একটি অধিকারের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়; এবং এই সূত্রে আবার তোমার সম্বন্ধে, আমার একটি নূতন কর্ত্তব্য আসিয়া পড়ে।

সত্য যেমন আমার পক্ষে আবশ্যক, তেমনি তোমার পক্ষেও

আবশ্যক। কেন না, সত্য যেমন আমার বুদ্ধিবৃত্তিব নিয়ম, তেমনি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিরও নিয়ম। সত্যই বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব ধন। তাই, তোমার চিত্তবৃত্তির বিকাশের প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য ; সত্যের পথে তোমার চিত্ত যাহাতে বাধা না পায়, এমন কি, সত্যের অর্জ্জনে সুবিধা সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তৎপ্রতিও আমার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তোমার স্বাধীনতার প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কি, তোমার কোন দোষ ত্রুটি নিবারণ করিবারও সকল সময়ে আমার অধিকার নাই। স্বাধীনতা এমনি একটি পবিত্র সামগ্রী যে, উহা যখন বিপথগামী হয়, তখনও উহাকে একেবারে বাধা না দিয়া, কতকটা উহাকে বাগাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হয়। অনেক সময় আমরা কোন মন্দ নিবারণ করিবার জন্য অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভুল করি। ভাল মন্দ দুই ঈশ্বরের বিধান। কোন আত্মাকে বলপূর্ব্বক সংশোধন করিতে গিয়া তাকে আমরা আরও পশুবৎ করিয়া ফেলি।

যে সকল অনুরাগবৃত্তি তোমারই অংশরূপে অবস্থিত, সেই সকল অনুরাগের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য ; এবং যত প্রকার অনুরাগ আছে তন্মধ্যে পারিবারিক অনুরাগ-গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। আপনাকে আপনার বাহিরে প্রসারিত করা, (বিক্ষিপ্ত করা নহে) সুসংযত ও ধর্ম্মপূত কোন একটি অনুরাগের দ্বারা কতকগুলি আত্মার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা— এইরূপ একটি দুর্নিবার প্রয়োজন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পরিবারমণ্ডলীর দ্বারাই আমাদের এই প্রয়োজন চরিতার্থতা লাভ করে। মানুষের প্রতি অনুরাগ—ইহা একটি সাধারণ অনুরাগ।

পারিবারিক অনুরাগ—কতকটা আত্মানুরাগ হইলেও নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুরাগ নহে। যে পরিবারবর্গ প্রায় আমাদের নিজেরই মত, সেই পরিবারবর্গকে নিজেরই মত ভালবাসিবে—ইহাই পারিবারিক অনুরাগ। এই অনুরাগ,—পিতা, মাতা, সন্তান ইহাদের পরস্পরকে একটি সুমধুর অথচ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে; পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা পাইয়া সন্তানগণ অমোঘ আশ্রয় লাভ করে, এবং পিতামাতারও চিত্ত আশা ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তাই, দাম্পত্য-অধিকারের প্রতি কিংবা পিতামাতার অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিলে, আত্মা-পুরুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহাকেই আক্রমণ করা হয়।

তোমার ধনসম্পত্তির প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, কেন না উহা তোমার শ্রমের ফল। তোমার শ্রমের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; কারণ, স্বাধীনতাকে কাজে খাটানোই শ্রম। তুমি যদি তোমার ধনসম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া থাক, তাহা হইলেও, যে স্বাধীন ইচ্ছা ঐ ধন সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া গিয়াছে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাকেও আমার সম্মান করা কর্ত্তব্য।

অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেই ন্যায়াচরণ বলে। কাহারও অধিকার লঙ্ঘন করাই অন্যায়াচরণ।

সকল প্রকার অন্যায়াচরণই আমাদের অন্তরস্থ নৈতিক পুরুষটির প্রতিই উৎপীড়ন; আমাদের লেশমাত্র অধিকার খর্ব্ব করিলেই, আমাদের নৈতিক পুরুষটিকেই খর্ব্ব করা হয়; অন্তত উহার দ্বারাই পুরুষকে জিনিসের পদবীতে নামাইয়া আনা হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায়াচরণ কি?—না দাসত্ব। কেন না, সকল অন্যায়াচরণই এই দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর একজনের

লাভের জন্য, কোন ব্যক্তির সমস্ত মনোবৃত্তিকে তাহার সেবায় নিযুক্ত করাই দাসত্ব।

দাসের যে টুকু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হয়—সে কেবল বিদেশী প্রভুর স্বার্থের জন্য। দাসের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভুর কাজে আসিবে বলিয়াই তাহাকে কতকটা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে দেওয়া হয়। কখন-কখন ভূমির সহিত আবদ্ধ দাসকে সেই ভূমির সহিত বিক্রয় করা হয়; কখন বা দাসকে প্রভুর শরীরের সহিত শৃঙ্খলিত করা হয়। যেন তাহার কোন স্নেহ মমতা থাকা উচিত নহে, যেন তাহার কোন পরিবার নাই, তাহার পত্নী নাই, তাহার সন্তানসন্ততি নাই, এইরূপ মনে করা হয়। তাহার কাজকর্ম্ম তাহার নহে, কেন না, তাহার পরিশ্রমের ফল অন্যের ভোগ্য। শুধু তাহাই নহে; দাসের অন্তর হইতে স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাবকে উন্মূলিত করা হয়, সর্ব্বপ্রকার অধিকারের ধারণাকে নির্ব্বাপিত করা হয়; কারণ, এই ভাবটি দাসের অন্তরে থাকিলে, দাসত্বের স্থায়িত্বের প্রতি দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না; কেন না তাহা হইলে, এক সময়ে প্রভুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার জাগিয়া উঠিতে পারে।

ন্যায়-ব্যবহার, এবং যাহার উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন,—ইহাই মানুষের প্রতি মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাই কি একমাত্র কর্ত্তব্য?

আমরা যদি অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, যদি তাহার স্বাধীনতায় বাধা না দিই, তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উচ্ছেদ না করি, যদি তাহার পরিবারের প্রতি কিংবা তাহার ধনসম্পত্তির প্রতি আক্রমণ না করি, তাহা হইলেই কি আমরা বলিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে আমরা সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিলাম? মনে কর,

একজন হতভাগ্য ব্যক্তি তোমার চোখের সাম্‌নে কষ্ট পাইতেছে; আমরা তাহার কষ্টের কারণ নহি,—এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারিলেই কি আমাদের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়? না; কে যেন আমাদিগকে বলে,—তাহাকে একটু অন্নদান করা, আশ্রয় দান করা, সান্ত্বনা দান করা আরও ভাল।

এইখানে একটি গুরুতর প্রভেদ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যদি তুমি অন্যের দুঃখ কষ্টকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কঠোর-হৃদয় হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার অন্তরাত্মা তোমাকে ভৎর্সনা করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া, যে ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছে, এমন কি মরিতে বসিয়াছে,—তোমার প্রভূত ধনসম্পত্তি থাকিলেও সেই ধন সম্পত্তির উপর সেই ব্যক্তির লেশমাত্র অধিকার নাই; এবং সে যদি একগ্রাস অন্নও তোমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে। এই স্থলে আমরা এমন এক শ্রেণীর কর্ত্তব্য দেখিতে পাই—যাহার অনুরূপ অন্যের কোন অধিকার নাই। কোন ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের প্রতি সম্মান আদায় করিবার জন্য বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যতটুকুই হোক্ না কেন,—সে অন্যের নিকট হইতে ত্যাগ আদায় করিতে পারে না। ন্যায়পরতা অন্যের সম্মান বজায় রাখে, অন্যের অধিকার পুনরুদ্ধার করে। দয়াধর্ম্ম দান করে—স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক দান করে।

দয়াধর্ম্ম অন্যকে দান করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে নিজেকে বঞ্চিত করে। যখন দানশীলতা এতটা প্রবল হয় যে, আমাদের প্রিয়তম স্বার্থসমূহকেও বিসর্জ্জন করিতে আমরা উত্তেজিত হই—তখন সেই দানশীলতা আত্মত্যাগ নামে অভিহিত হয়।

অবশ্য এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে; কিন্তু ন্যায়-ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যের নিয়ম যেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ও দুর্দম্য, দানধর্ম্মের কর্ত্তব্য ঠিক্ সেরূপ নহে। দান কি?—না অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকার। ত্যাগের নিয়ম, কিংবা আত্মবিসর্জ্জনের মূলসূত্রটি কেহ কি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারে? কিন্তু ন্যায়ের মূলসূত্রটি সুস্পষ্ট:—অন্যের অধিকারকে সম্মান করা। দানধর্ম্মের কোন নিয়মও নাই, কোন সীমাও নাই। ইহা সকল বাধ্যতাকে অতিক্রম করে। উহার স্বাধীন চেষ্টাতেই উহার সৌন্দর্য্য।

কিন্তু একটি কথা এইখানে স্বীকার করা আবশ্যক:—দানধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কতকগুলি বিপদ আছে। দানধর্ম্ম যাহার উপকার করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চেষ্টার স্থলে আপনার চেষ্টাকে স্থাপন করিবার দিকে তাহার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কখন কখন, দানধর্ম্ম সেই দানপাত্রের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে, সে একপ্রকার তাহার বিধাতা-পুরুষ হইয়া দাঁড়ায়—যাহা মানুষের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। অন্যের প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া, দানধর্ম্ম তাহাদের প্রভু হইয়া বসে এবং তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেও পারে এইরূপ আশঙ্কা হয়। অবশ্য অন্যকে কোন কাজে প্রবৃত্ত কিংবা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করা নিষিদ্ধ নহে। অনুনয় বিনয়ের দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আবার যদি কেহ অপরাধের কাজ কিংবা নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াও সে কাজ হইতে আমরা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারি। যখন কেহ কুপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগে নীয়মান হইয়া তাহার স্বাধীনতা হারায়, তাহার ব্যক্তিত্ব হারায়, তখন তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবারও আমাদের অধিকার আছে।

কেহ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকেও আমরা এই-রূপে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারি। যখন আমরা কাহারও সম্বন্ধে আত্মকর্তৃত্বের পরিবর্তে পরকীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করা আবশ্যক মনে করি, তখন দেখিতে হইবে তাহার কতটা স্বাধীনতার শক্তি আছে; কিন্তু ইহা কি করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যাইবে? যখন কোন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির উপকার করিতে গিয়া, আমরা তাহার আত্মাকে একেবারে দখল করিয়া বসি, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে আমরা আরও বেশী দূর অগ্রসর হইব না?—যাহার উপর আমাদের প্রেমের প্রভুত্ব, সেই ব্যক্তির উপর হইতে প্রেম চলিয়া গিয়া, অব-শেষে তাহার স্থলে আমাদের প্রভুত্বের প্রেম আসিয়া পড়িবে না ইহা কে বলিতে পারে? অনেক সময়, পরসম্পত্তি দখল করিবার উদ্দেশে, দানধর্ম্ম একটা ছুতামাত্র, একটা ছলমাত্র হইয়া থাকে। দয়ার উত্তেজনায়, অবাধে দান করিবার অধিকার আমাদের তখনই হয় যখন আমরা ন্যায়ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া আপনার উপর দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অন্যের অধিকারকে সম্মান করা, এবং অন্যের উপকার করা,—যুগপৎ ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল হওয়া—ইহাই সামাজিক ধর্ম্মনীতি; এই দুই উপাদানেই সামাজিক ধর্ম্মনীতি গঠিত।

আমরা সামাজিক নীতির কথা বলিতেছি, কিন্তু সমাজ জিনিসটা কি তাহা এখনও বলা হয় নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি-পাত করা যাক্‌।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সমাজ বিদ্যমান। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে মানুষ মানুষের মধ্যেই গণ্য নহে। সমাজ একটি সার্ব্বভৌম তথ্য, অতএব সমাজের একটা সার্ব্বভৌম পত্তনভূমি থাকা আবশ্যক।

সমাজের উৎপত্তির মূল কি, এই প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব না। গত শতাব্দীর দার্শনিকেরা এই প্রশ্নটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। যে প্রদেশটি তমসাচ্ছন্ন, সেখান হইতে কি প্রকারে আলোক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? একটা অনুমানের আশ্রয় লইয়া কিরূপে বাস্তব তথ্যের হেতু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিবার জন্য, একটা আনুমানিক আদিম অবস্থায় আরোহণ করিবার প্রয়োজন কি? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অবিসম্বাদিত প্রকৃতি ও লক্ষণগুলি কি আলোচনা করিতে পারা যায় না? যাহার পূর্ণ অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তাহা অঙ্কুরাবস্থায় কিরূপ ছিল,—অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি? তা ছাড়া, সমাজের মূল-উৎপত্তির সমস্যায় হস্তক্ষেপ করায় একটা সঙ্কট আছে। সমাজের উৎপত্তির মূল কেহ কি অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছে? যাঁহারা বলেন পাইয়াছেন তাঁহারা করেন কি?—না, তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত আদিম সমাজের আদর্শ-অনুসারে তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন; রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের হস্তে নির্দ্দয়রূপে সমর্পণ করেন। কেহ বা কল্পনা করেন,—সমাজের আদিম অবস্থা একটা বলপ্রয়োগের অবস্থা, জবরদস্তির অবস্থা; এবং এই অনুমান হইতে সূত্রপাত করিয়া তাঁহারা বলেন, "জোর যার মুলুক তার", এবং এই রূপে যথেচ্ছারকে তাঁহারা একটা পূজ্য আসন প্রদান করেন। আবার কেহবা মনে করেন,—সমাজের আদিম রূপটি পরিবারের মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তাঁহারা রাজশক্তিকে পিতৃস্থানীয় ও প্রজামণ্ডলীকে সন্তানের স্থানীয় মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে, সমাজ যেন একটি নাবালক, তাহাকে পিতৃশাসনের অধীনে,

বরাবর থাকিতে হইবে, এবং যে হেতু, গোড়ায় পিতাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, অতএব তাঁহার এই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব বরাবর বজায় রাখিতে হইবে। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত সীমায় গিয়া উপনীত হন; তাঁহাদের মতে, সমাজ একটা চুক্তির ব্যাপার; এই চুক্তির বন্দোবস্তে, সর্ব্বজনের কিংবা অধিকাংশের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্মের সনাতন নিয়মকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব অধিকারকে, জনতার চির-চঞ্চল ইচ্ছার হস্তে সমর্পণ করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সমাজের শৈশবদশায়, শক্তিমান ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব, ন্যায়ত পুরোহিত সম্প্রদায়েতেই কর্ত্তৃত্বের প্রকৃত অধিকার বর্ত্তে; ঈশ্বরের গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহারাই অবগত আছেন এবং তাঁহারাই ঐশ্বরিক শাসনকর্ত্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি। এইরূপে, একটা দার্শনিক ভ্রান্ত মত, শোচনীয় রাষ্ট্রনীতিতে উপনীত হয়; একটা অনুমান হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাদের মতবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা যথেচ্ছাচারিতায় আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

যে অতীতকাল চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহার কোন চিহ্ন-মাত্র নাই, সেই অতীতের অন্ধকারের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের অন্বেষণ করিয়া, সেই তথ্যের উপর প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কখনই দাঁড় করান যাইতে পারে না। প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

যেখানেই সমাজ আছে কিংবা ছিল—সেইখানেই সমাজের নিম্নলিখিত পত্তনভূমিটি দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়, মানুষের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সহজ সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে; (২) ন্যায় ও অধিকার সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ধারণা আছে।

অসহায় দুর্ব্বল মানব যখন একাকী থাকে, তখন তাহার মনো-

বৃত্তির পুষ্টিসাধনের জন্য, তাহার জীবনকে বিভূষিত করিবার জন্য, এমন কি তাহার প্রাণধারণের জন্য, অন্য মানুষের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া তাহার অন্তরে একটা গভীর অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করিয়া, সে তাহার সদৃশধর্ম্মী জীবদিগের নিকট হইতে বাহুবল, অভিজ্ঞতা, ও প্রেমের সাহায্য দাবী করিয়া থাকে। শিশু যখন মাকে না চিনিয়াও মাতৃসাহায্যলাভের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন তাহার সেই প্রথম ক্রন্দনেই সামাজিক সহজ-সংস্কারের ঈষৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অনুকম্পা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি যে সকল ভাব অন্যের জন্য প্রকৃতি-দেবী আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাবগুলির মধ্যে এই সামাজিক সহজ-সংস্কারটি বিদ্যমান। ইহা স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণের মধ্যে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যে, পিতামাতার অপত্য-স্নেহের মধ্যে, এবং অন্যান্য সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত। বিধাতা বিজনতার সহিত বিষাদের সংযোগ ও সজনতার সহিত হর্ষের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন;—তাহার কারণ, মানুষের সংরক্ষণ ও সুখসাধনের জন্য, জ্ঞান ও নীতির পরিপুষ্টির জন্য, সমাজ নিতান্তই আবশ্যক।

কিন্তু মানুষের অভাব ও সহজ সংস্কার হইতে যে সমাজের সূত্রপাত হয়, ন্যায়বৃত্তিই তাহার পূর্ণতা বিধান করে।

একজন মানুষকে যখন আমরা সম্মুখে দেখি, তখন কোন বাহ্য নিয়মের আবশ্যক হয় না, কোন চুক্তি বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় না,—সে মানুষ, অর্থাৎ, সে বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হয়; তাহলেই আমরা তাহার অধিকারগুলিকে সম্মান করি—সেও আমার অধিকারগুলিকে সম্মান করে। আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের কর্ত্তব্য ও অধিকার সমান। সে যদি এই অধি-

কারসাম্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকীয় বলের অপব্যবহার করে, তাহা হইলে আমিও আমার আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার নিকট হইতে সম্মান আদায় করিবার অধিকার জারি করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং যদি আমাদের দুইজনের অপেক্ষা বলবান আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি, এই সময়ে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে, যাহার এই বিবাদ-কলহে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই,—তখন সেই তৃতীয় ব্যক্তি বলপ্রয়োগের দ্বারা, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, এমন কি, অন্যায়াচরণের জন্য অত্যাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান করা তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাই সমাজের পূর্ণ আদর্শ; এবং ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, শাসন ও দণ্ড এইগুলি সমাজের অন্তর্নিহিত মুখ্যতত্ত্ব।

ন্যায়পরতাই স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, পরন্তু যাহা আমার করিবার অধিকার আছে তাহা করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রচণ্ড আবেগের স্বাধীনতা ও খেয়ালের স্বাধীনতার পরিণাম কি?—না, যাহারা খুব দুর্ব্বল, তাহারা বলবানের অধীন হয়, এবং যাহারা খুব বলবান তাহারা স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খল বাসনার বশীভূত হইয়া পড়ে। প্রচণ্ড আবেগকে দমন করিয়া ও ন্যায়ের অনুগত হইয়াই মানুষ স্বকীয় অন্তরাত্মার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। উহাই আবার প্রকৃত সামাজিক স্বাধীনতারও আদর্শ। সমাজ আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে—এই যে একটি মত, ইহার ন্যায় ভ্রান্ত মত আর দ্বিতীয় নাই। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা দূরে থাকুক, সমাজই স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, পরিপুষ্ট করে; সমাজ স্বাধীনতাকে দমন করে না, প্রত্যুত মনের প্রচণ্ড আবেগকে দমন করে। সমাজ যেরূপ স্বাধীনতার কোন হানি করে না, সেইরূপ ন্যায়েরও কোন হানি করে

না। কেননা, সমাজ আর কিছুই নহে—ন্যায়ের ভাব, বাস্তবে পরিণত হইলেই সমাজ হইয়া দাঁড়ায়।

ন্যায় স্বাধীনতাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজকেও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে। মানসিক শক্তি ও দৈহিক বলসম্বন্ধে সকল মনুষ্যের মধ্যে সমতা না থাকিলেও, তাহারা সকলেই স্বাধীন জীব;—এই স্বাধীনতার হিসাবেই সকল মনুষ্যই সমান, সুতরাং সকলেই সম্মানের যোগ্য। যখনই মানুষের মধ্যে পবিত্র নৈতিক পুরুষের লক্ষণ উপলব্ধি করা যায়, তখনই মানুষ মাত্রই একই অধিকারসূত্রে ও সমান পরিমাণে সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্বাধীনতার সীমা স্বাধীনতার মধ্যেই বিদ্যমান; অধিকারের সীমা কর্ত্তব্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত। স্বাধীনতা ততক্ষণই সম্মানের যোগ্য হয় যতক্ষণ অন্যের স্বাধীনতার হানি না করে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহা অবাধে করিতে পার—শুধু এই একটি মাত্র সর্ত্তে যে, তুমি আমার স্বাধীনতা আক্রমণ করিবে না। কেননা তাহা হইলে, স্বাধীনতার সাধারণ অধিকারসূত্রেই, আমার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি তোমার বিপথগামী স্বাধীনতাকে দমন করিতে বাধ্য হইব। সমাজ, প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রতিভূস্বরূপ; অতএব যদি একজন অপরের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে স্বাধীনতার নামেই তাহাকে দমন করা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা একটি পবিত্র জিনিস; এমন কি, তোমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে, কোন একটা উদ্ভট উপধর্ম্মকেও তুমি পোষণ করিতে পার; কিন্তু যদি তুমি কোন দুর্নীতিমূলক ধর্ম্মমত প্রকাশ্যে প্রচার করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার সহরাষ্ট্রিকদিগের স্বাধীনতা ও বিবেকবুদ্ধির প্রতি আক্রমণ করা হইবে। তাই এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার নিষিদ্ধ।

এইরূপ দমনের আবশ্যকতা হইতেই দমনের সুব্যবস্থিত প্রভুশক্তির আবশ্যকতা প্রসূত হয়।

ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, এই প্রভুশক্তি কতকটা আমার মধ্যেও আছে :—কারণ, আমাকে অন্যায়রূপে কেহ আক্রমণ করিলে, আমারও আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান নহি, দ্বিতীয়তঃ আপনার কার্য্য সম্বন্ধে কেহই অপক্ষপাতী বিচারক হইতে পারে না; যাহাকে আমি বৈধ আত্মরক্ষার চেষ্টা বলিয়া মনে করি, তাহা হয়ত অন্যের প্রতি অত্যাচার বা জবর্দ্দস্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অতএব প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার জন্য এমন একটা অপক্ষপাতী প্রভুশক্তির প্রয়োজন যাহা ব্যক্তিবিশেষের সমস্ত শক্তি হইতে উচ্চতর।

এই প্রভুশক্তি, এই অপক্ষপাতী তৃতীয়, যাহা সকলের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতার দ্বারা সুসজ্জিত,—এই প্রভুশক্তিকেই রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি বলা যায়।

রাজশক্তিই সকলের ও প্রত্যেকের অধিকারের প্রতিনিধি। যে ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার, ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে সমর্থিত হইতে পারে না—তাহা এমন একটা সর্ব্বোচ্চ প্রভুশক্তির হস্তে সমর্পিত হওয়া আবশ্যক, যে শক্তি সাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে, নিয়মিতরূপে ও ন্যায্যরূপে বল প্রয়োগ করিতে পারে।

অতএব রাজশক্তি সমাজ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু এই সম্বন্ধে দুই লেখক-সম্প্রদায়ের দুই বিভিন্ন মত; এক সম্প্রদায় রাজশক্তির নিকট সমাজকে বলিদান দিতে চাহেন, আর এক সম্প্রদায় মনে করেন, রাজশক্তি সমাজের শত্রু। যদি রাজশক্তি সমাজের

প্রতিনিধিস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে সে শক্তি শুধু ভৌতিক শক্তি মাত্র,—সে শক্তি শীঘ্রই বলহীন হইয়া পড়ে; আবার, রাজশক্তির অবিদ্যমানে, সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ বাধিয়া সমাজ একটা বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমাজ রাজশক্তিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে, এবং রাজশক্তি সমাজকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করে। প্যাস্‌কাল যে বলিয়াছেন, "যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহাকে বলবান করিতে না পারিয়া, যাহা বলবান তাহাকে ন্যায়সঙ্গত করা হইয়াছে"—এ কথা ঠিক্ নহে। প্যাস্‌কালের কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে,—বাহুবলের দ্বারা বলীয়ান ন্যায়ই রাজশক্তি।

যে রাষ্ট্রনীতি, কর্ত্তৃত্বশক্তি ও স্বাধীনতাকে পরস্পর-বিরোধী মনে করিয়া, মূলত বিভিন্ন মনে করিয়া, রাজশক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়, সে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি নহে। আমি অনেকসময় এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রভুতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তত্ত্ব, এবং প্রভুশক্তির বৈধতা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্যই প্রভুর সৃষ্টি। ইহা একটা বিষম ভুল। সহসা মনে হইতে পারে, এই কথার দ্বারা প্রভু-তত্ত্বকে স্থাপন করা হইতেছে; কিন্তু তাহা দূরে থাক, প্রভুত্বের যে সুদৃঢ় ভিত্তি সেই ভিত্তিটিকেই প্রভুত্ব হইতে অপসারিত করা হইতেছে। প্রভুত্ব—অর্থাৎ বৈধ ও নৈতিক প্রভুত্ব—উহা ন্যায় ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং ন্যায়ও, স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ ঐ দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত তত্ত্ব নহে, উহা একই তত্ত্ব। সকল অবস্থাতেই, সকল প্রয়োগস্থলেই উহাদের সমান ধ্রুবত্ব—সমান মহত্ত্ব।

কেহ কেহ বলেন প্রভুশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে: অবশ্য ঈশ্বরের নিকট হইতেই আসিয়াছে। ভাল—স্বাধীনতা

কোথা হইতে আসিয়াছে? পৃথিবীতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সবই ত ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে উৎকৃষ্ট জিনিস আর কি আছে?

প্রভুশক্তির মূল ভিত্তিটি জানিতে পারিলে, প্রভুর বল আরও বৃদ্ধি পায়। প্রভুর আজ্ঞা পালন করা কত সহজ হয়,—যদি জানিতে পারি, ঐ আদেশ পালনে আমার হীনতা হইবে না, প্রত্যুত আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে; এই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দাসত্বের সাদৃশ্য ধারণ না করিয়া, বরং স্বাধীনতার অপরিহার্য্য নিয়মরূপে, স্বাধীনতার প্রতিভূ-রূপে প্রকাশ পাইবে।

রাজশক্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও চরম লক্ষ্য কি?—না, সার্ব্বজনিক স্বাধীনতার রক্ষক যে ন্যায়ধর্ম্ম সেই ন্যায়ধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং অন্যের স্বাধীনতাকে দমন করিবার অধিকার কাহারও নাই। অতএব, মিথ্যাকথন, অমিতাচার, অপরিণামদর্শিতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত চারিত্রদোষ যতক্ষণ না অন্যের অনিষ্টজনক হয়, ততক্ষণ রাজশক্তি তাহার জন্য কাহাকে দণ্ডিত করিতে পারে না। আবার রাজশক্তিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাও বিহিত নহে।

সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ-সরকারও একটি—পুরুষ; ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় তাহারও একটা হৃদয় আছে; তাহার উদারতা আছে, সাধুভাব আছে, বদান্যতা আছে। এমন কতকগুলি বৈধ ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত তথ্য আছে যাহার কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, —যদি প্রজার অধিকার সংরক্ষণই রাজসরকারের একমাত্র কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যাহাতে প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, তাহা-দের বুদ্ধিশুদ্ধি পরিপুষ্ট হয়, তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি দৃঢ়ীভূত হয়, জন-

সমাজের ও বিশ্বমানবের স্বার্থের উদ্দেশে—তৎপ্রতি রাজসরকারের কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য কখন কখন, মানুষের হিতকল্পে, রাজসরকারের বলপ্রয়োগ করিবারও অধিকার আছে। কিন্তু এই বলপ্রয়োগে বিশেষ বিবেচনা ও বিজ্ঞতা আবশ্যক—কেননা, অপব্যবহারে এই বলপ্রয়োগ অত্যাচারে পরিণত হইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাক, রাজসরকার কিরূপ নিয়মে রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। যে শক্তি রাজসরকারের হস্তে বিশ্বস্তভাবে অর্পিত হইয়াছে, রাজসরকার যদৃচ্ছাক্রমে কি সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন? সদ্যোজাত সমাজেই,—শাসনতন্ত্রের শৈশব দশাতেই, সেই শক্তির এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তির প্রয়োগে মানুষ নানা প্রকারে বিপথগামীও হইতে পারে;—এক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, আর এক, বলের আতিশয্য প্রযুক্ত। অতএব এমন একটি নিয়ম চাই যাহা মানুষের নিজের চেয়ে উচ্চতর, এমন একটি সর্ব্বজন-বিদিত বিধি চাই, যাহা প্রজাগণের পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইতে পারে এবং রাজসরকারের পক্ষে যুগপৎ আটক ও আশ্রয় উভয়ই হইতে পারে। এই নিয়ম বিধিকেই আইন বলে।

আইনের আইন—সেই সর্ব্বোচ্চ আইন কি?—না স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ধর্ম্ম; উহা লিখিত হয় না; উহার বাণী প্রতিজনের অন্তরে শ্রুত হয়। স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম্ম অমুক অমুক স্থলে কি আদেশ করে, লিখিত আইন তাহাই অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে মাত্র।

উত্তম আইনের প্রধান লক্ষণ, অপরিহার্য্য লক্ষণ এই যে উহাতে একটা বিশ্বজনীন ভাব থাকে। যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, সেই প্রত্যেক অবস্থাতে ন্যায়ধর্ম্মের আদেশ কি হইতে পারে, তাহাই সাধারণভাবে নির্দ্ধারণ করা আইন-প্রণেতার প্রথম

কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ঐরূপ কোন একটি অবস্থা উপস্থিত হইলে তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট আদেশ অনুসারেই দেশ-কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে সেই অবস্থার বিচার করিতে সমর্থ হন।

যে সকল নিয়ম কিংবা আইন ব্যক্তিগণের সামাজিক সম্বন্ধ নিয়মিত করে, সে সমস্তের সমবায়কে সামাজিক ব্যবহার বলে, সামাজিক ব্যবহার স্বাভাবিক সম্বন্ধজনিত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত; স্বাভাবিক অধিকারই উহার ভিত্তি, উহার মানদণ্ড, উহার সীমা। সমস্ত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার প্রধান নিয়ম এই যে, উহা স্বাভাবিক ব্যবহার-বিধির বিরোধী হইবে না।

কোন আইনই আমাদের স্কন্ধে একটা মিথ্যা অধিকার চাপাইতে পারে না, কিংবা একটা সত্য অধিকার হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে না।

আইনের শাসনশক্তি কিসে প্রকাশ পায়?—না, দণ্ডবিধানে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের ধারণা হইতে দণ্ডের উৎপত্তি। বিশ্বশাসনতন্ত্রে ঈশ্বর স্বয়ং সকল প্রকার অপরাধের জন্য দণ্ড বিধান করেন। সমাজ তন্ত্রে রাজসরকার, শুধু সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্যই দণ্ডবিধানের অধিকার পাইয়াছেন; রাজসরকার তাহাদিগকেই দণ্ড দেন যাহারা অন্যের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে। অতএব যে কোন দোষ ন্যায়ধর্ম্মের বিরোধী নহে এবং স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারী নহে, সেই দোষের জন্য সমাজ কোন প্রতিশোধ লয় না। তা ছাড়া, দণ্ডবিধানের অধিকার ও প্রতিশোধ লইবার অধিকার এক নহে। মন্দ কাজের প্রতিশোধ লইবার জন্য মন্দ কাজ করা, চক্ষের বদলে চক্ষু ও দন্তের বদলে দন্তের দাবী করা,—ইহা জ্ঞানালোক-বর্জ্জিত এক প্রকার বর্ব্বরোচিত ন্যায়বিচার। কেননা, তুমি আমার

যে অনিষ্ট করিয়াছ, তোমার অনিষ্ট করিয়া আমি সে অনিষ্টকে কখনই অপসারিত করিতে পারি না।

অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তির কষ্ট হইয়াছে বলিয়া অত্যাচারীকে যে তাহার অনুরূপ কষ্ট দিতে হইবে, একথা ঠিক্ নহে ; পরন্তু যে ব্যক্তি ন্যায়কে লঙ্ঘন করে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে সমুচিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে—ইহাই দণ্ডের প্রকৃত নীতি। দণ্ড ক্ষতিপূরণ নহে। যদি আমি অজ্ঞাতসারে তোমার কোন ক্ষতি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী। তাহাতে কোন দণ্ড বর্ত্তে না, কেন না, এস্থলে আমি জ্ঞাতসারে অপরাধ করি নাই। কিন্তু আমি যদি কোন বদমাইসির কাজ করিয়া থাকি, আর সে কাজে যদি কাহারও ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আর্থিক ক্ষতি-পূরণের জন্য ত দায়ী আছিই, তাহা ব্যতীত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তরূপ আমাকে উপযুক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত দণ্ডনীতি।

দণ্ড ও অপরাধের মধ্যে ঠিক্ অনুপাতটি কি? এই প্রশ্নের একটা সম্পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে যেটুকু ধ্রুব ও অপরিবর্ত্তনীয় তাহা এই—যাহা ন্যায়-বিরুদ্ধ তাহাই দণ্ডনীয়, এবং অন্যায় যতই গুরুতর হইবে, তাহার দণ্ডও সেই পরিমাণে কঠোর হওয়া উচিত। কিন্তু দণ্ডবিধানের অধিকারের পাশাপাশি, অপরাধ-সংশোধনের একটা কর্ত্তব্যও আছে। অপরাধীকে দোষ-সংশোধনের একটা অবসর দেওয়া উচিত। মানুষ যতই অপরাধী হউক না, তবু সে মানুষ ; মানুষ ত একটা জিনিস নহে যে তাহার দ্বারা কিছুমাত্র আমাদের হানি হইলেই আমরা তাহাকে সরাইয়া ফেলিব। আমাদের মাথায় একটা পাথর পড়িলে আমরা তাহাকে দূরে নিঃক্ষেপ করি, পাছে উহা আর কাহাকে আঘাত করে। মনুষ্য বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব,

মানুষ ভাল মন্দ বুঝিতে পারে, কোন-না-কোন দিন তার অনুতাপ হইতে পারে, আবার সুপথে ফিরিয়া আসিতে পারে। এই সকল তত্ত্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাহাতে করিয়া ঐ দুই শতাব্দী বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। সংশোধনালয়ের কথা উল্লেখ করিতে গেলে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রারম্ভকাল মনে পড়িয়া যায়। তখন দণ্ড প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ছিল। অপরাধীরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অনুতাপ করিয়া আবার সাধুর শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। এই স্থলে, উদার মৈত্রীর হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এই মৈত্রীতত্ত্ব ন্যায়-তত্ত্ব হইতে অনেকটা ভিন্ন। দণ্ডবিধান করা ন্যায়ের কাজ, দোষসংশোধন করা মৈত্রীর কাজ। কিরূপ পরিমাণে এই দুই তত্ত্বকে সম্মিলিত করা বিধেয়?—ইহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন,—অতীব সূক্ষ্মবিচার-সাপেক্ষ। তবে, এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, ঐ দুই তত্ত্বের মধ্যে ন্যায়েরই প্রাধান্য থাকা উচিত। অপরাধীকে সংশোধন করিবার কালে অনেক সময় রাজসরকার, ধর্ম্মের অধিকারকে দখল করিয়া বসেন। কিন্তু রাজসরকারের যাহা বিশেষ কাজ, যাহা নিজস্ব কর্ত্তব্য—রাজসরকার যেন তাহা বিস্মৃত না হন।

যাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি বলে, এখন সেই রাষ্ট্রনীতির প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া একটু থামা যাক্। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি ছাড়া আর কিছুই ধ্রুব নহে, কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে, বাকি আর সমস্তই আপেক্ষিক। জনসাধারণের কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য অধিকারকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করাই রাজশক্তির কাজ; অতএব অধিকার সংরক্ষণের সংস্রবেই রাজ্যতন্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা কিছু ধ্রুবত্ব। কিন্তু রাজ্যতন্ত্রসমূহের একটা আপেক্ষিক দিক্‌ও আছে। দেশ কাল পাত্র অনুসারে, আচার

ব্যবহারও ইতিহাসের বিশেষত্ব অনুসারে, রাজ্যতন্ত্রের রূপান্তর হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্রকে যে পরম নীতিটি অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন তাহা এই—সমস্ত অবস্থা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া, সমাজের এরূপ গঠন ও ব্যবস্থাদি বিধান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে, যতটা সম্ভব নিত্য ও ধ্রুবতত্বসমূহের সহিত তাহাদিগের মিল থাকে। সমাজের সেই সকল গঠন, সেই সকল ব্যবস্থাকেও ধ্রুব-নিত্য বলা যাইতে পারে, কেননা উহা কোন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অনুমান-বুদ্ধি হইতে প্রসূত নহে, পরন্তু উহা অপরিবর্ত্তনীয় মানব-প্রকৃতির উপর, হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ প্রবৃত্তি-সমূহের উপর, ন্যায়ের অবিনশ্বর ধারণার উপর, মহোন্নত মৈত্রীভাবের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির উপর, কর্ত্তব্য ও অধিকারবুদ্ধির উপর, পাপপুণ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রকৃত সমাজ, যাহা মানব-সমাজ নামে অভিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে সমাজ স্বাধীন ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের দ্বারা পরিগঠিত,—উক্ত তত্বগুলি ঐরূপ সমাজেরই প্রতিষ্ঠাভূমি। যে রাজ্যতন্ত্র ইহা জানে যে, কতকগুলা পশুর সহিত তাহার ব্যবহার নহে, পরন্তু বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের সহিত ব্যবহার; যে রাজ্যতন্ত্র মানুষকে সম্মান করে, প্রীতি করে, সেইরূপ রাজ্যতন্ত্রই স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য। প্রাগুক্ত নীতিসূত্রগুলিই এই প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রকেই পরিচালিত করিয়া থাকে।

ঈশ্বরের কৃপায়,—ফরাসী সমাজ এবং যে রাজবংশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে, সেই রাজবংশ বরাবর ঐ অবিনশ্বর আদর্শের আলোক ধরিয়া চলিয়াছে। (Louis le Gros) রাজা 'মোটা'-লুই, পৌর-সাধারণ-সভাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; রাজা 'রূপবান'ফিলিপ পার্লেমেণ্ট

স্থাপন করেন এবং বিচারালয়ে স্বাধীন বিচার ও বিনামূল্যের বিচার প্রবর্ত্তিত করেন; চতুর্থ হেনরী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন; ত্রয়োদশ লুই ও চতুর্দ্দশ লুই যেমন একদিকে ফ্রান্সের স্বাভাবিক প্রান্তগুলি ফ্রান্সকে প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনি ফরাসী জাতির সকল অংশকে একত্রীভূত করিবার জন্য, সামন্ততন্ত্রের অরাজকতার স্থানে নিয়ন্ত্রিত শাসনকার্য্য প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, মাতৃভূমির সাধারণ হিতকল্পে বড় বড় সামন্তদিগের অধিকার ক্রমশ খর্ব্ব করিয়া, তাহাদিগকে আমীর-ওম্‌রার শ্রেণীতে আনয়ন করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন ফ্রান্সের রাজাই, দেশে অভিনব অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া, তৎকালের সাধারণ উন্নতির সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে, বিশৃঙ্খল ও গঠনহীন প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থানে সভ্যজাতির উপযুক্ত প্রকৃত প্রতিনিধিশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, নানা কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া লোমহর্ষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হয়; কিন্তু সেই গৌরবান্বিত চেষ্টা ব্যর্থ হইত না, যদি সে সময়ে রিশ্‌লিউ কিংবা ম্যাজ্যারাঁার মত কোন ব্যক্তি রাজ্যের কর্ণধার থাকিত! সর্ব্বশেষে, ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া ফ্রান্সকে এমন একটি স্বাধীন ও জনহিতকর শাসনতন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যাহা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের স্বপ্নের বিষয় ছিল, এবং মন্‌টেস্‌কিউ স্বকীয় গ্রন্থে যাহার আভাস দিয়া গিয়াছিলেন; সেই রাজ্যতন্ত্র অংশত কার্য্যে পরিণত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, বর্ত্তমান কালের ও দূর ভবিষ্যৎ কালেরও উপযোগী হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত অধিকারের ঘোষণা-পত্রে সেই সকল বীজসূত্রের উল্লেখ আছে যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। ফ্রান্সের উদ্দেশে ও বিশ্বমানবের উদ্দেশে

আমরা যে সকল স্পৃহা ও আশা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি তৎসমস্তই সেই অধিকার-পত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলা ইতিপূর্ব্বে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা এখন নৈতিক সত্যকে পাইয়াছি, মঙ্গলের ধারণাকে পাইয়াছি, এবং মঙ্গলের ধারণার সহিত যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা সংযুক্ত আছে তাহাও পাইয়াছি। সার-সত্যে পৌঁছিয়াও যে তত্ত্ব আমাদিগকে থামিতে দেয় নাই, যে তত্ত্ব বাস্তব সত্তার মধ্যেও পরম প্রজ্ঞার অনুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছে,—সেই একই তত্ত্ব, সেই পরম পুরুষের সহিত মঙ্গলভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে,—যিনি মঙ্গলভাবের প্রথম ও চরম পত্তনভূমি।

অন্যান্য সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্যও বস্তুহীন কেবল একটা সূক্ষ্মভাবের অবস্থায় থাকিতে পারে না। আমাদের অন্তরে এই নৈতিক সত্য কেবল ধারণার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু এমন কোন পুরুষ আছেন—এই নৈতিক সত্য যাঁহার শুধু ধারণার বিষয় নহে, পরন্তু নৈতিক সত্যই যাঁহার স্বরূপ।

যেমন, সমস্ত সত্যের সহিত একটি অখণ্ড মূল-সত্যের যোগ আছে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের সহিত একটি অখণ্ড মূল-সৌন্দর্য্যের যোগ আছে, সেইরূপ সমস্ত নৈতিক তত্ত্বের সহিত একটি অখণ্ড মূলতত্ত্বের যোগ আছে—সেই মূলতত্ত্বটি মঙ্গল। এইরূপে আমরা ক্রমশ এমন একটি মঙ্গলের ধারণায় উত্থিত হই, যে মঙ্গল স্বরূপত মঙ্গল, যে মঙ্গল পরিপূর্ণ মঙ্গল, যাহা সমস্ত বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য হইতে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ এবং যাহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য সকল নির্দ্ধারিত হইয়া

থাকে। অতএব যথাযথরূপে বলিতে গেলে, এই পূর্ণমঙ্গল—মঙ্গল-স্বরূপ পূর্ণপুরুষ ছাড়া আর কাহার উপাধি হইতে পারে?

অনেকগুলি পূর্ণ পুরুষ থাকা কি সম্ভব? যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি পূর্ণ সুন্দর, তিনিই কি পূর্ণ মঙ্গল নহেন? পূর্ণতার ধারণার সহিত, পূর্ণ অখণ্ডতা, পূর্ণ একতার ধারণা সংজড়িত। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল—এই তিন তত্ত্ব স্বরূপত পৃথক্ নহে। ইহারা আসলে একই; তিন প্রধান উপাধিরূপে ইহারা পৃথক্ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে মাত্র। আমাদের মনই এইরূপ ভেদ স্থাপন করে; কেন না, ভেদ না করিয়া, বিভাগ না করিয়া, আমাদের মন কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই তিন তত্ত্ব যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, সেখানে এই তত্ত্বগুলি এক ও অখণ্ড; এবং সেই পুরুষ যিনি "তিনে এক, একে তিন," যিনি একাধারে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সুন্দর ও পূর্ণ মঙ্গল—তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নহেন।

সৃষ্ট জীবদিগের যে সকল সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে, তাহার মধ্যে এমন কোন বাস্তব সদ্‌গুণ বা উপাধি আছে কি—যাহা স্রষ্টার মধ্যে নাই? কারণ ছাড়া কার্য্য আর কোথা হইতে স্বকীয় বাস্তবতা ও সত্তা প্রাপ্ত হইতে পারে? কার্য্যের যে বাস্তবতা, কার্য্যের যে সত্তা, সে তাহার কারণ হইতেই প্রসূত হইয়া থাকে। অন্তত, কার্য্যের যাহা কিছু বাস্তবতা, তাহা তাহার কারণের মধ্যেই অবস্থিত। কার্য্যের যে বিশেষত্ব—সে বিশেষত্ব, কার্য্যের নিকৃষ্টতাতে, কার্য্যের হীনতাতে, কার্য্যের অপূর্ণতাতে। কেবল উহার দ্বারাই কার্য্যের পরাধীনতা, কার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। কার্য্যের মধ্যে অধীনতার নিদর্শন, অধীনতার নিয়ম বিদ্যমান। অতএব যদিও কার্য্যের অপূর্ণতা হইতে কারণের অপূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে আমরা বৈধরূপে

উপনীত হইতে পারি না, কিন্তু আমরা কার্য্যের উৎকৃষ্টতা হইতে কারণের পূর্ণতারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নচেৎ কার্য্যের মধ্যে এমন কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস থাকিয়া যায় যাহার কোন কারণ নাই।

আমাদের ঈশ্বরবাদের ইহাই মূলতত্ত্ব। ইহার মধ্যে কোন নূতনত্বও নাই, অতিসূক্ষ্মত্বও নাই। তবে কিনা, এই তত্ত্বটিকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া, এখনও পর্য্যন্ত আলোকে আনা হয় নাই এই মাত্র। আমাদের নিকট এই তত্ত্বটি অতীব সারবান্ ও প্রমাণিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটির সাহায্যেই আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর কোন ন্যায়শাস্ত্র-সিদ্ধ সত্তা নহেন, ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান-যুক্তির দ্বারা অথবা বীজগণিতের সমীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের ব্যাখ্যা করা যায় না। যখন কেহ, জ্যামিতিবেত্তা ও নৈয়ায়িকের পদ্ধতি অনুসারে, কোন একটি প্রধান উপাধি হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরের অন্যান্য উপাধি নির্ণয় করেন, আমি জিজ্ঞাসা করি—তখন তিনি কতকগুলি বস্তু-নিরপেক্ষ সূক্ষ্মভাবের কথা ছাড়া আর কিছু কি প্রাপ্ত হন? বাস্তব ও জীবন্ত ঈশ্বরে উপনীত হইতে হইলে, এই প্রকার নিষ্ফল তর্ক-বিদ্যার জল্পনা-জাল হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের যে প্রথম ধারণা, অর্থাৎ অসীম-পুরুষের ধারণা, এই ধারণাটিও আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সত্তা ও সসীম সত্তা—এই যে নিজের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইহা হইতে আমরা অব্যবহিতরূপে এমন একটি সত্তার ধারণায় উপনীত হই, যে সত্তা আমাদের সত্তার মূলতত্ত্ব,

যে সত্তা অসীম। এই সারবান্ অথচ সরল যুক্তি-প্রণালীটি আসলে দেকার্টের যুক্তি-প্রণালী,—তিনি যে যুক্তির পথটি খুলিয়া দিয়াছেন, সেই পথটি আমরা অনুসরণ করিব। তিনি একস্থানে আসিয়া শীঘ্র থামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা থামিব না। আমরা যেমন আমাদের সসীম সত্তার কারণরূপে একটি অসীম সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমাদের উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি সমূহের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াও আমরা একটি অসীম কারণে গিয়া উপনীত হই। অতএব ঈশ্বর আমাদের নিকট শুধু অসীম নহেন, তিনি এমন কোন অনির্দ্দেশ্য সূক্ষ্ম ভাবমাত্র-সার ঈশ্বর নহেন যাঁহাকে আমাদের হৃদয় ও মন গ্রহণ করিতে পারে না, পরন্তু তিনি সুনির্দ্দিষ্ট বাস্তব ঈশ্বর, আমাদের ন্যায় তিনি নৈতিক পুরুষ।

অতএব, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্য ও সুন্দরের ন্যায় তিনি মঙ্গলেরও মূল কারণ ও চরম ভিত্তি। আমরা যেরূপ নৈতিক পুরুষ, সেইরূপ নৈতিক পুরুষের তিনি মূল-আদর্শ। আমাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নাই যাহার মূল-প্রস্রবণ তিনি নহেন, এবং যাহা অনন্ত পরিমাণে তাঁহাতে নাই।

যেমন মনে কর,—মানুষের স্বাধীনতা আছে, আর ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই—ইহা কি কখন হইতে পারে? ইহা কেহই অস্বীকার করে না যে, যিনি সকল পদার্থের কারণ, যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু Spinoza, ঈশ্বরকে সমস্ত বাহ্য বাধার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া একটা সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতার বন্ধনে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন,—যে আভ্যন্তরিক অবশ্যম্ভাবিতাকে তিনি সত্তার পূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সে সত্তা, পুরুষ-সত্তা নহে। কিন্তু স্বাধীনতাই পুরুষের অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার

মুখ্য ধর্ম্ম। অতএব ঈশ্বরের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর মানুষ হইতেও নিকৃষ্ট। ইহা কি অত্যন্ত অদ্ভুত নহে,—সৃষ্ট জীব যে আমরা, আমরা আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারি, আর যিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি একটা অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি-নিয়মের অধীন; অবশ্য সেই অভিব্যক্তির কারণ তাঁহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই কারণটি একপ্রকার বস্তু-নিরক্ষেপ সূক্ষ্ম শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, দার্শনিক শক্তি মাত্র; এই যান্ত্রিক কারণটি, আমাদের অনুভূত স্বাধীন পুরুষ-গত কারণ অপেক্ষা অতীব নিকৃষ্ট। অতএব ঈশ্বর স্বাধীন, কেননা আমরা স্বাধীন; কিন্তু আমরা যেরূপ স্বাধীন, তিনি সেরূপ স্বাধান নহেন; কেননা ঈশ্বর সমস্তই আমাদের মতন, অথচ তিনি আমাদের মতন কিছুই নহেন। আমাদের মত সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহার আছে, কিন্তু সেই সব সদ্‌গুণ আমাদিগের অপেক্ষা অনন্তগুণে উন্নত। তাঁহার অসীম স্বাধীনতার সহিত, অসীম জ্ঞান সংযুক্ত। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া যেরূপ অব্যর্থ,—চিন্তা আলোচনার অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত, তিনি যেরূপ এক কটাক্ষেই মঙ্গলকে উপলব্ধি করেন—সেইরূপ তাঁহার স্বাধীনতার ক্রিয়াও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অযত্ন-সম্পাদিত। ("স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ"—উপনিষৎ)।

আমাদের আত্মার ভিত্তিভূমি যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা যেরূপ আমরা ঈশ্বরেতে আরোপ করি, সেই একই প্রকারে ন্যায় ও মৈত্রীও আমরা তাঁহাতে আরোপ করিয়া থাকি। মানুষের মধ্যে, ন্যায় ও মৈত্রী মানুষের ধর্ম্মরূপে অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরের উহা উপাধি। আমাদের মধ্যে যে স্বাধীনতা শ্রমার্জ্জিত, সেই স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বরূপগত। অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি ন্যায়ের মূলগত ভাব হয় এবং আমাদের আত্মমর্য্যাদার নিদর্শন হয়, তবে ইহা

কখনই হইতে পারে না—সেই পূর্ণ পুরুষ, ক্ষুদ্রতর জীবদিগের অধিকারসমূহকে অবজ্ঞা করিবেন; কেন না ঐ সকল অধিকার তাঁহা হইতেই জীবেরা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার উচিত প্রাপ্য প্রদান করে সেই পরম ন্যায় ঈশ্বরেতেই অবস্থিত। এই যে সীমাবদ্ধ জীব মানুষ, এই মানুষের যদি আপনা হইতে বাহির হইবার শক্তি থাকে, আপনাকে ভুলিবার শক্তি থাকে, আর একজনকে ভালবাসিবার শক্তি থাকে—অন্যের প্রতি আত্মসমর্পণ করিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে এই নিঃস্বার্থ প্রেম, এই মৈত্রী—যাহা মনুষের একটি পরম ধর্ম্ম—তাহা কি ঈশ্বরের স্বরূপে অনন্তগুণে থাকিবে না? হাঁ, জীবের প্রতি ঈশ্বরের অসীম প্রেম: সেই বিশ্ব-বিধাতার বিশ্ববিধানের অসংখ্য নিদর্শনে এই প্রেম পরিব্যক্ত। ঈশ্বরের এই প্রেমের কথা প্লেটো বিলক্ষণ অবগত ছিলেন; সেই প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যে মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন তাহা এই:—"সেই পরম বিধাতা, কি কারণে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলি শুন:—তিনি মঙ্গলস্বরূপ। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তাই তাঁহার কোন প্রকার ঈর্ষ্যা নাই; যেহেতু তিনি ঈর্ষ্যা হইতে মুক্ত—তিনি ইচ্ছা করিলেন, সকল পদার্থ যতটা সম্ভব, তাঁহার সদৃশ হউক।" ঈশ্বরের মৈত্রীরও অন্ত নাই—ঈশ্বরের স্বরূপেরও অন্ত নাই। জীবকে আরও বেশী দান করা অসম্ভব; সীমাবদ্ধ জীব হইয়া যতটা পাইতে পারে, ঈশ্বর জীবকে ততটাই দিয়াছেন। ঈশ্বর জীবকে সমস্তই দান করিয়াছেন—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন; যতটা সম্ভব ততটাই দান করিয়াছেন। এত দান করিয়াও তাঁহার কিছুই ক্ষয় হয় না; কেন না তিনি পূর্ণ, নিত্য ও অক্ষয়; তিনি আপনাকে প্রসারিত করিয়াও—আপনাকে প্রদান

করিয়াও অক্ষুণ্ণ থাকেন—সমগ্র থাকেন। তাঁহার অনন্ত মৈত্রী অনন্ত শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই অমৃত-আদর্শ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি,—যার যতটা আছে, সেই পরিমাণে সে দান করুক। কিন্তু মানবের প্রেম এত দুর্ব্বল যে তাহার সহিত একটু অহমিকা,—একটু স্বার্থপরতা মিশ্রিত থাকেই থাকে। যেমন আমাদের অন্তরে একদিকে পরসেবানিষ্ঠা ও আত্ম-বিসর্জ্জনের উদার ভাব নিহিত আছে, তেমনি আবার তাহার পাশাপাশি এই স্বার্থপরতারও দুর্জ্জয় মূল সকলের হৃদয়ে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

যদি ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল ও পূর্ণ ন্যায়স্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি মঙ্গল ও ন্যায় ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না; আবার যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন,—সুতরাং তাহাই তিনি করিয়া থাকেন। এই জগৎ ঈশ্বরেরই রচনা; অতএব ইহা সম্যক্‌রূপে তাঁহার উদ্দেশ্যের উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছে।

তথাপি, এই জগতে এমন একটা বিশৃঙ্খলাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ঈশ্বরের ন্যায় ও মঙ্গলভাবের প্রতি দোষারোপ করে বলিয়া মনে হয়।

মঙ্গলের ধারণার সহিত যে একটি নিয়ম সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই নিয়মটি এই কথা বলে যে, নৈতিক কার্য্যের কর্ত্তামাত্রই ভাল কাজ করিলে পুরস্কার পায় ও মন্দ কাজ করিলে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। এই নিয়মটি সার্ব্বভৌমিক, অবশ্যম্ভাবী, ও অকাট্য। এ জগতে যদি এই নিয়মের প্রয়োগ না হয় তবে, হয় এই নিয়মটির কথা মিথ্যা, নয় এই জগৎ সুব্যবস্থিত নহে।

এখন,—ইহা একটা বাস্তব তথ্য যে ভালো কাজের অব্যর্থ পরিণাম সকল সময়ে সুখ নহে, এবং মন্দ কার্য্যের অব্যর্থ পরিণাম সকল সময়ে দুঃখ নহে।

এ কথাটা সত্য হইলেও, ঈশ্বরের প্রসাদে, ইহা অতীব বিরল ও ইহা কতকটা ব্যতিক্রম স্থলের মত' বলিয়া মনে হয়।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ধর্ম্ম; এই সংগ্রাম যেমন গৌরব-পূর্ণ তেমনি কষ্টকর; কিন্তু পাপের কষ্ট অতীব দারুণ, সে কষ্টের শেষ নাই, সে অশান্তির অন্ত নাই।

ধর্ম্মের কতকগুলি কষ্ট থাকিলেও ধর্ম্মের সহচর—পরমসুখ, যেমন অধর্ম্মের সহচর—মহা দুঃখ। কি ক্ষুদ্র কি বৃহতের মধ্যে, কি আত্মার গুপ্ত স্থানে, কি জীবনের প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে, সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য—সুখ দুঃখের একটা বৃহৎ অংশ বই আর কিছুই নহে।

এই সম্বন্ধে, মিতাচারের সহিত অমিতাচারের, সুশৃঙ্খলার সহিত বিশৃঙ্খলার, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের তুলনা করিয়া দেখ। আমি মিতাচারের অর্থে বুঝি—পরিমিত আচরণ, উহা কঠোর তপশ্চরণ নহে। আমি ধর্ম্ম অর্থে বুঝি, যুক্তি সঙ্গত ধর্ম্ম, তাহা নিষ্ঠুর পৈশাচিক ধর্ম্ম নহে।

Hufeland নামক একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বলেন যে, সাধুভাবসমূহ স্বাস্থ্যের অনুকূল এবং অসাধুভাবগুলা তাহার বিপরীত। প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঈর্ষা যেমন শরীরকে উত্তেজিত করে, দগ্ধ করে, বিক্ষুব্ধ করে, সেইরূপ সাধুভাব সকল, সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে।

আরও তিনি বলেন, যাঁহাদের সাধু জীবন, সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হয়েন।

এইরূপ স্বাস্থ্যের পক্ষে, বলের পক্ষে, জীবনের পক্ষে,—অধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মই উপযোগী। আমার মনে হয়, এই কথাতেই অনেকটা বলা হইল।

তার পর পাপপুণ্যের সাক্ষী আমাদের অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মার শান্তি কিংবা অশান্তির উপর আমাদের আভ্যন্তরিক সুখ দুঃখ নির্ভর করে। এই হিসাবে, আবার সুশৃঙ্খলার সহিত বিশৃঙ্খলার, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের তুলনা করিয়া দেখ।

আবার অন্তরাত্মার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি জনসমাজের কথা ধরা যায়,—জনসমাজে শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, মান অপমান কিসের উপর নির্ভর করে? অবশ্য লোকমতের কখন কখন ভুলও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভুল অধিক কাল স্থায়ী হয় না। সাধারণত,—ভণ্ড ও প্রবঞ্চকেরা, কখন কখন লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেও, একথা স্বীকার করিতে হইবে, লোক-সমাজে সততাই সুযশ লাভের ধ্রুব ও অমোঘ উপায়।

পাপপুণ্যের যে একটি চমৎকার নিয়ম আছে সেই নিয়মটির দ্বারাই বিশ্বমানবের অদৃষ্ট নিয়মিত হইয়া থাকে। এই পাপপুণ্যের নিয়মের উপরেই সমস্ত জনসমাজের, সমস্ত রাজ্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, এবং ধর্ম্মই সুখলাভের একমাত্র ধ্রুব উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহাই সক্রেটিস ও প্লেটোর মত; ইহাই ফ্র্যাঙ্কলিনের মত। এবং আমিও মানবজীবন মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া, আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই মতে উপনীত হইয়াছি। তবে

এ কথা স্বীকার করি, ইহার কতকগুলি ব্যতিক্রমস্থলও আছে। একটিমাত্র ব্যতিক্রমস্থল থাকিলেও তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক।

একটা দৃষ্টান্ত। মনে কর, একজন সুশ্রী, ধনশালী, লোকপ্রিয় সৌম্য যুবক একটা বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে—হয় তাহার ফাঁসি কাষ্ঠকে বরণ করিতে হইবে, নয় বিশ্বাসঘাতক হইয়া একটা পবিত্র সদনুষ্ঠানের পক্ষকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাই হোক, অবশেষে তাহার ২০ বৎসর বয়সে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ফাঁসিকাষ্ঠকেই বরণ করিল। সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে যে আপনাকে বলিদান দিল—ইহার সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে? এস্থলে পাপপুণ্যের নিয়মানুসারে ত কোন কার্য্য হইল না। তুমি কি ধর্ম্ম-নিয়মের নিন্দা করিতে সাহসী হইবে? অথবা, কেমন করিয়া তাহার উচিত-প্রাপ্য অযাচিত পুরস্কার তাহাকে এই পৃথিবীতে প্রদান করিবে?

ভাবিয়া দেখিলে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এই জগতের সমস্ত নিয়মই সাধারণ নিয়ম, কাহারও জন্য এই নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ পুণ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই নিয়মসকল আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বদ্‌ মেজাজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কোন দুর্জ্ঞেয় অথচ সুনিশ্চিত ভৌতিক নিয়মই তাহার কারণ। কি জীব জন্তু, কি বৃক্ষলতা, সকলেই এই নিয়মের অধীন। যে নিজে নির্দ্দোষ তাহাকেও হয়ত চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মহামারী, ব্যাপক রোগ, মহাবিপদ—কি সাধু কি অসাধু—সকলকেই যদৃচ্ছাক্রমে আক্রমণ করে।

মানব-ন্যায়বিচার, নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বড় একটা দণ্ডিত করে না বটে, কিন্তু অনেক সময়ে দোষীকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেয়। তা ছাড়া

মানুষ-বিচারক মানুষের অনেক দোষ আদৌ জানিতেই পারে না। কত অপরাধ, কত নীচ অপকর্ম্ম অন্ধকারের আবরণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং দণ্ডিত হয় না! আবার এরূপ নিঃস্বার্থ পর-সেবার কত কাজ গোপনে অনুষ্ঠিত হয়—ঈশ্বরই যাহার একমাত্র সাক্ষী ও বিচার কর্ত্তা। অবশ্য, পাপ পুণ্যের সাক্ষী অন্তরাত্মার দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়াইয়া যায় না, এবং অপরাধী আত্মা স্বকীয় অপরাধের জন্য অনুতাপের যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু অনুতাপের মাত্রা, সকল সময়ে অপরাধের মাত্রার অনুরূপ হয় না। এই অনুতাপবোধের তীব্রতা অনেকটা অন্তঃকরণের কোমলতার উপর, শিক্ষার উপর, অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। এক কথায় এই জগতে সাধারণত পাপ পুণ্যের নিয়মানুসারে কাজ হইলেও, উহা গনিতের গণনার ন্যায় "কড়ায়-গণ্ডায়" ঠিক্ হয় না।

ইহা হইতে কী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? এই জগৎ সুগঠিত নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত? না, তাহা হইতেই পারে না,—আসলেও তাহা ঠিক্ নহে। কারণ, ইহা নিঃসংশয় যে, এই জগতের যিনি স্রষ্টা তিনি মঙ্গলময় ও ন্যায়বান্; তাছাড়া, সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে একটা সুশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। যে সুশৃঙ্খলা আমরা চতুর্দ্দিকে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, কতকগুলি ঘটনাকে আমরা তাহার সামিলে আনিতে পারি না বলিয়াই কি সেই সুশৃঙ্খলাকে একেবারে অস্বীকার করিতে হইবে?—ইহা যার পর নাই অসঙ্গত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখনও টিকিয়া আছে—অতএব ইহা সুগঠিত।

ভল্‌টেয়ারের ন্যায় একদল বলেন, জগৎ ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাইতেছে; আবার একদল বলেন, জগতের কিছুই খারাপ

নহে—সবই ভাল। একটা—বিশ্ব-মঙ্গলবাদ; আর একটা,—বিশ্ব-অমঙ্গলবাদ। জগতের তথ্যসমষ্টি বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উহা মঙ্গলবাদ অপেক্ষা অমঙ্গলবাদেরই প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়। এই দুই বিপরীত মতবাদের মধ্যস্থলে বিশ্বমানব, পারলৌকিক আশাকে স্থাপন করিয়াছে। বিশ্বমানব দেখিয়াছে যে, নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রমস্থল আছে বলিয়া একটা মূল-নিয়মকে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; তাই বিশ্বমানব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, ঐ সকল ব্যতিক্রমস্থলগুলিকে একদিন নিয়মের মধ্যে আনা যাইতে পারিবে, একদিন তাহার কোনপ্রকার প্রতিবিধান অবশ্যই হইবে। হয় এই সিদ্ধান্তটিকে স্বীকার করিতে হইবে, নয় পূর্ব্বস্বীকৃত দুইটি মহা-তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে হইবে। সেই দুইটি মহাতত্ত্ব কি? না, ঈশ্বর ন্যায়বান এবং পাপপুণ্যের নিয়মটি অনতিক্রম্য ও অকাট্য।

এই দুইটি মহাতত্ত্বকে অস্বীকার করিলে, বিশ্বমানবের সমস্ত বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করা হয়।

আবার এই দুইটি মহাতত্ত্বকে স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে পরজন্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়।

কিন্তু দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও, আত্মা থাকিবে—ইহা কি সম্ভব?

বস্তুত,—যে নৈতিক আত্মা, ভাল মন্দ কাজ করিয়া দণ্ডপুর-স্কারের পাত্র হয়, সেই নৈতিক আত্মা একটা জড়-শরীরের সহিত এখানে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই আত্মা শরীরের সহিত একত্র বাস করিতেছে, কিয়ৎপরিমাণে শরীরের উপর নির্ভর করিয়া আছে, তথাপি সেই আত্মা শরীর নহে। শরীর কতকগুলি অংশে বিভক্ত; শরীরের বৃদ্ধিও হইতে পারে, হ্রাসও হইতে পারে; শরীর

বিভাজ্য,—শরীর অসীম অংশে বিভক্ত হইতে পারে। বিভাজ্যতাই শরীরের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু সেই যে একটা-কিছু যে আপনাকে আপনি জানে, যে আপনাকে "আমি" বলিয়া, "অহং" বলিয়া অভিহিত করে; যে আপনার স্বাধীনতা, আপনার দায়িত্ব অনুভব করে, সে কি ইহাও অনুভব করে না যে, তাহার "আমি"র মধ্যে কোন খণ্ডতা নাই, কোন খণ্ডতা থাকা সম্ভবও নহে,—সে একটি অখণ্ড "আমি"? "আমি" কি কখন কম "আমি" বা বেশী "আমি" হইতে পারে? "আমি"র কি অর্দ্ধভাগ হইতে পারে?—সিকি ভাগ হইতে পারে? আমার "আমি"কে আমি কখনই ভাগ করিতে পারি না। হয়, এই "আমি" যাহা আছে তাহাই আছে—নয়, এই "আমি" একেবারেই নাই। এই "আমি" বিচিত্র ব্যাপার প্রকটিত করিলেও, ইহা যে আমি সেই আমি,—ইহার তদাত্মতা সম্পূর্ণরূপ বজায় থাকে। "আমি"র এই তদাত্মতা, এই অভাজ্যতা, এই অখণ্ডতাই "আমি"র আধ্যাত্মিকতা। অতএব অধ্যাত্মিকতাই "আমি"র মূলগত ভাব। "আমি"র এই তদাত্মতাসম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সহিত, আত্মার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটি জড়িত রহিয়াছে; কোন জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব আমরা যখন বলি, আত্মার সহিত শরীরের মূলগত প্রভেদ আছে—উহা শুধু একটা অনুমানের কথা নহে। তাছাড়া, আমরা যখন আত্মার কথা বলি, তখন এই "আমি"র কথাই বলিয়া থাকি। মনন ও ইচ্ছাশক্তি এই দুইটিই "আমি"র উপাধি। অতএব আমি মনন করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি—এইরূপ আমার যে আত্ম-চৈতন্য,—এই আত্মচৈতন্যের সহিত "আমি"র কোন প্রভেদ নাই। কোন আত্মচৈতন্যহীন জীবের আমিত্ব থাকিতে পারে না। এই

আমিত্বই তাদাত্ম্যবিশিষ্ট, অখণ্ড ও অমিশ্র। উপাধির দ্বারা "আমি" পরিপুষ্ট হইলেও, "আমি"র বিভাগ হয় না। এই "আমি" অবিভাজ্য, ধ্বংসহীন, এবং বোধ হয় অমর। অতএব ঐশ্বরিক ন্যায়ের সার্থকতার জন্য যদি আত্মার অমরত্ব নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে এ আবশ্যকতা অসম্ভব নহে। আত্মার আধ্যাত্মিকতাই, আমাদের অমরতার অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি। পাপপুণ্যের নিয়মটিই ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ। প্রাগুক্ত আধ্যাত্মিকতার প্রমাণটিকে দার্শনিক প্রমাণ এবং পাপপুণ্যের প্রমাণটিকে নৈতিক প্রমাণ বলা যায়। এই নৈতিক প্রমাণটাই সমধিক প্রসিদ্ধ, সমধিক লোকপ্রিয়, সমধিক প্রত্যয়জনক ও হৃদয়গ্রাহী।

সকল বস্তুরই একটা সীমা আছে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে—এই মূল সূত্রটির যেরূপ কোন স্থলেই অন্যথা হয় না, সেইরূপ সকল বস্তুরই একটা সীমা আছে—এই মূল সূত্রটিরও কোথাও ব্যতিক্রম হয় না। অতএব মানুষেরও একটা সীমা আছে। এই সসীমতা, মানুষের সমস্ত চিন্তায়, সমস্ত ব্যবহারে, সমস্ত জীবনে প্রকাশ পায়। আবার আর এক দিকে, মানুষ যাহাই করুক, যাহাই অনুভব করুক, যাহাই চিন্তা করুক না কেন, মানুষ অসীমকেই চিন্তা করে, অসীমকেই ভালবাসে, অসীমের দিকেই তাহার প্রবণতা। এই অসীমের অভাববোধই,—বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের প্রধান উদ্দীপক, সমস্ত আবিষ্ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। প্রেমও অসীমে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে। যাত্রারম্ভে প্রেম কতকগুলি আপাত-রম্য জলন্ত সুখ সম্ভোগ করে বটে, কিন্তু সেই সুখের সহিত যে গুপ্ত গরল মিশ্রিত থাকে, তাহাতে ক্রমশঃ মানুষ পার্থিব সুখের অতৃপ্তি ও শূন্যতা শীঘ্রই অনুভব করে।

অনেক সময়ে তাহার সকল সৌভাগ্যের মধ্যে, সকল সুখের মধ্যে একটা অতৃপ্তি আসিয়া, নৈরাশ্য আসিয়া, তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপ অতৃপ্তি, এইরূপ নৈরাশ্য কোথা হইতে আইসে? যদি কাহারও অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে,—সংসারের কোন বস্তুই যে তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না, তাহার কারণ,—তাহার প্রাণের বাসনা আরও উচ্চতর, অসীম পূর্ণতার প্রতিই তাহার আন্তরিক স্পৃহা। মানুষের চিন্তা ও প্রেমের যেমন সীমা নাই, সেইরূপ মানুষের চেষ্টা উদ্যমেরও সীমা নাই। মানুষের চেষ্টা উদ্যম কোথায় গিয়া থামিবে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? ইহলোকের সহিত আমাদের একরকম চেনা-পরিচয় যদি হইয়া থাকে তবে শীঘ্রই আমাদের লোকান্তরে যাওয়া আবশ্যক হইবে। মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তকে মানুষ ক্রমাগতই অনুসরণ করিতেছে। মানুষ অসীমের ধারণা করিতেছে, অসীমকে অনুভব করিতেছে,—এমন কি, অসীমকে আপনার অন্তরে বহন করিতেছে বলিলেও হয়। অতএব অসীম ছাড়া মানুষের আর কোন্ দিকে গতি হইতে পারে? ইহা হইতেই মানুষের সেই অমরত্বের দুর্নিবার অনুভূতি, সেই পরলোকের বিশ্বজনীন আশা—যাহা সকল ধর্ম্ম, সকল কাব্য, সকল ঐতিহ্য সাক্ষ্য দিতেছে। অসীমের দিকেই আমাদের প্রবল প্রবণতা। এই অসীমের পথে মৃত্যু আসিয়া আমাদের যাত্রাভঙ্গ করিয়া দেয়; আমাদের জীবনের কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে থাকিতে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। অতএব মৃত্যুর পরেও কিছু আছে ইহাই সম্ভব। কেন না, মৃত্যুতে আমাদের কিছুরই পরিসমাপ্তি হয় না। এই ফুলটিকে দেখ, এই ফুলটি

কাল আর থাকিবে না। আজই ইহা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে। এটি যে-জাতীয় ফুল, সেই জাতীয় ফুলের পক্ষে ইহা যতটা সুন্দর হইবার তাহা হইয়াছে; ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আমার যে পূর্ণ পরিণতি, আমার যে নৈতিক পরিণতি, তাহার সম্বন্ধে আমার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। যাহার দুর্জ্জয় অভাব আমি অনুভব করি, এবং যাহার জন্য আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়, সেই পূর্ণপরিণতি পাইবার জন্য আমার কতনা আগ্রহ ও কতনা চেষ্টা; কিন্তু ইহলোকে সে পূর্ণতায় আমি কখনই উপনীত হইতে পারি না, কেবল সেই পূর্ণতা লাভের আশামাত্র আমার মনে থাকিয়া যায়। এই আশা কি একদিন পূর্ণ হইবে না? এই আশা কি একটা মিথ্যা আশা? আর সকল জীবই স্বকীয় জীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, আর শুধু মানুষই কি তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে? জীবের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার প্রতিই কি এইরূপ অবিচার হইবে? মানুষ যদি অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তাহার সমস্ত সহজ-সংস্কার যে লক্ষ্যের প্রতি তাহাকে আহ্বান করিতেছে সেই লক্ষ্য যদি তাহার সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে ত এই সুব্যবস্থিত সৃষ্টির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সৃষ্টিছাড়া জীব। অতএব, আত্মার অমরত্ব ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান আর কিছুতেই হইতে পারে না। আমাদের মতে,—আমাদের সমস্ত বাসনার—সমস্ত চিত্তবৃত্তির এই যে অসীমের দিকে প্রবণতা, ইহা আত্মার অমরত্বের নৈতিক প্রমাণকে ও দার্শনিক প্রমাণকে আরও সুদৃঢ় করে।

পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবার অনুকূলে যখন আমরা সমস্ত

যুক্তি সংগ্রহ করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব একপ্রকার সন্তোষজনকরূপে সপ্রমাণ করিয়াছি, তখন আর একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত। সেই বাধাটিকেও অতিক্রম করা আবশ্যক। কল্পনা যখন সেই অজ্ঞাত-রহস্য মৃত্যুকে চিন্তা করে, তখন ভয় না করিয়া থাকিতে পারে না। প্যাস্কাল বলেন, যত বড় তত্ত্বজ্ঞানী হউন না কেন,—একটা বড় তক্তার উপর দিয়া চলিবার সময় কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও তাহার নীচে যদি একটা অতলস্পর্শ গহ্বর থাকে, তাহা হইলে তাঁহার হৃৎকম্প না হইয়া যায় না। কোন আশঙ্কা নাই যুক্তিতে জানিলেও, কল্পনা তাঁহাকে ভীত করিয়া তুলে। মৃত্যুর সান্নিধ্যে আমরা যে ভয় পাই, ইহাও কতকটা কল্পনার ভয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তা সত্ত্বেও এই ভয়কে দমন করা সহজ নহে। তত্ত্ব-জ্ঞানীও এই ভয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পান না; তবে তিনি এইমাত্র জানেন, এই ভয় কোথা হইতে উৎপন্ন হয়; এবং তিনি কতকগুলি সুদৃঢ় আশালতাকে অবলম্বন করিয়া সক্রেটিসের ন্যায় এই ভয়কে অতিক্রম করেন। আমাদের কল্পনা, শিশুর ন্যায়। উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের শাসনাধীনে রাখিয়া কল্পনাকে শিশুরই ন্যায় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মনে করিয়া দেখ একটা ভীষণ অতলস্পর্শকে উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। এই অজানা অনন্তকালের সম্মুখে আসিয়া আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। অতএব, যতটা পারি আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয় হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, কল্পনাকে বশীভূত করা আবশ্যক। এই কথাটি যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি যে, যেমন জীবনে তেমনি মরণেও ঈশ্বরই আত্মার ধ্রুব অবলম্বন; আর ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ন্যায়—তাহাই মঙ্গল।

আমরা এখন জানিয়াছি প্রকৃত ঈশ্বর কিরূপ। আমরা ইতি-

পূর্ব্বেই ঈশ্বরের বিশ্ববিমোহন দুইটি মুখ সন্দর্শন করিয়াছি, সে কি ?—না, সত্য ও সুন্দর। ঈশ্বরের স্বরূপগত যে সর্ব্বোচ্চ ভাবটী আমাদের নিকট প্রকাশ পায় সেটি—ঈশ্বরের পবিত্রতা। ধর্ম্মনীতি ও মঙ্গলের জন্মদাতারূপে, স্বাধীনতার মূলতত্ত্বরূপে, ন্যায় ও মৈত্রীর মূলাধাররূপে, দণ্ডপুরস্কারের বিধাতারূপে, ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, "পাবনের পাবন," "পাবনং পাবনানাং।" এরূপ ঈশ্বর শুধু কতকগুলি সূক্ষ্ম-গুণ-মাত্র-সার ঈশ্বর নহেন; তিনি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট পুরুষ—যিনি আমাদিগকে তাঁহার নিজের আদর্শে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যিনি আমাদের অদৃষ্টের নিয়ন্তা, যাঁহার বিচারের উপর আমরা নির্ভর করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রীতিই আমাদিগকে তাবৎ শুভকর্ম্মে প্রণোদিত করে; ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের ন্যায়-বুদ্ধিকে পরিচালিত ও পরিশাসিত করে। তিনি অসীম এই কথা যদি আমরা পুনঃপুনঃ স্মরণ না করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিব। আবার যদি তাঁহার অসীম স্বরূপের মধ্যে এরূপ কতকগুলি উপাধি না থাকে যাহাতে করিয়া তাঁহার সহিত আমরা একটা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি তাহা হইলে তিনি আমাদের পক্ষে না থাকারই সামিল হইয়া পড়েন; কেননা, তাঁহার সেই সকল উপাধি আমাদেরও জ্ঞানের ও ভাবের মূলসূত্র।

এইরূপ পূর্ণ পুরুষের চিন্তা করিয়া, মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবই প্রকৃত ধর্ম্মভাব।

অন্য যাহাদিগের সন্নিধানেই আমরা গমন করি, তাহাদের যেরূপ গুণ, সেই গুণ অনুসারেই আমাদের মনে বিচিত্র ভাবসমূহ জাগিয়া উঠে। তবে যাঁহাতে সকল গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাঁহার সন্নিকর্ষে আমাদের কি কোন বিশেষ ভাবের উদয় হইবে না ? যখন আমরা

ঈশ্বরকে অনন্তস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করি, সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া উপলব্ধি করি, যখন আমরা স্মরণ করি, ধর্ম্মনিয়মের মধ্যে তাঁহারই ইচ্ছা বিদ্যমান এবং এই ধর্ম্মনিয়মের পালন ও লঙ্ঘনের সহিত তিনি দণ্ড পুরস্কার সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার দুর্ণম্য ন্যায়, এই সকল দণ্ডপুরস্কার যথাযথরূপে সকলের প্রতি বিধান করিতেছে, তখন তাঁহার এই রাজ-মহিমা সন্দর্শনে আমাদের চিত্ত ভয় ও ভক্তির ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার পর, যখন আমরা ভাবিয়া দেখি, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না,—আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তিনি আমাদের কত সুখে সুখী করিয়াছেন, নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য তিনি এই চমৎকার ব্রহ্মাণ্ড আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; অন্য জীবনের সম্মিলনে যাহাতে আমাদের জীবন সংবর্দ্ধিত হয় এই জন্য তিনি আমাদিগকে জনসমাজ দিয়াছেন, চিন্তা করিবার জন্য বুদ্ধি দিয়াছেন, ভাল বাসিবার জন্য হৃদয় দিয়াছেন, কর্ম্ম করিবার জন্য স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন আর একটি মধুর ভাবে আমাদের এই ভয় ও ভক্তির ভাব অনুরঞ্জিত হয়; সেই ভাবটি—প্রেম। প্রেম যখন দুর্ব্বল ও সসীম জীবের প্রতি প্রযুক্ত হয় তখন সেই প্রেম প্রিয় জনের তুষ্টিসাধন করিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করে, সে প্রেম প্রিয়জনের নিকট হইতে কোন উপকার প্রত্যাশা করে না। যখন আমরা কোন সুন্দর বা গুণবান পাত্রকে ভালবাসি, তখন প্রথমে এ কথা ভাবি না,—এই প্রেম আমার প্রেমাস্পদের কিংবা আমার নিজের কোন কাজে আসিবে কি না। এই প্রেম যখন আবার সত্য সুন্দর মঙ্গলের আধার সেই ঈশ্বরে উত্থান করে, তখন তাঁহার পূর্ণতায় মুগ্ধ হইয়া

আমরা তাঁহাকে যে প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করি তাহা আরও কত বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হইবার কথা।

যিনি অনন্ত গুণে আমাদের প্রেমাস্পদ তাঁহার দিকে আমাদের আত্মা স্বভাবতই বিকশিত হইয়া উঠে।

ভক্তি ও প্রীতি লইয়াই আরাধনা। এই দুই ভাব ব্যতীত প্রকৃত আরাধনা হইতেই পারে না।

যদি ঈশ্বরকে শুধু সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া, শুধু দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রভু বলিয়া, শুধু ন্যায়ের প্রবর্ত্তক ও পাপের শাস্তা বলিয়াই দেখা যায়, তাহা হইলে মানুষ তাঁহার মহিমা-ভারে প্রপীড়িত ও নিজের দুর্ব্বলতায় অভিভূত হইয়া পড়ে; ঐশ্বরিক বিচারের ভয়ে সর্ব্বদাই কম্পমান হয়, আর এই জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি, আপনার প্রতি বীতরাগ হইয়া সমস্তই দুঃখময় বলিয়া অনুভব করে। ইহা ঐশ্বরিক স্বরূপের একটা দিকমাত্র। Port Royal এই দিক্ পানেই ঝুঁকিয়াছেন। তাঁহার "প্যাস্কালের চিন্তাবলী" পাঠ করিয়া দেখ। অতি-নম্রতা প্রদর্শন করিয়া (Pascal) প্যাস্কাল দুইটি জিনিস ভুলিয়াছেন;—একটি, মানুষের পদগৌরব,—আর একটি, ঈশ্বরের করুণা। আবার পক্ষান্তরে, যদি ঈশ্বরকে শুধু করুণাময় বলিয়া, প্রশ্রয়দাতা স্নেহময় পিতা বলিয়াই ভাবি, তাহা হইলে আর এক প্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়। ভয়ের স্থানে প্রেমকে বসাইলে, ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে ভক্তিও অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা। তখন আর ঈশ্বর প্রভু নহেন; এমন কি, পিতাও নহেন; কেননা, পিতৃভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি-মিশ্র ভয়ও জড়িত আছে; তিনি তখন শুধু সখা,—এমন কি, স্থলবিশেষে, প্রণয়ী। প্রকৃত আরাধনায়, ভক্তি ও প্রেমের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ

হয় না ;—এই স্থলে ভক্তি প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

এই আরাধনার ভাবটি বিশ্বজনীন। তবে, লোকের প্রকৃতি-অনুসারে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে,—ইহা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায় ; এমন কি অনেক সময়ে, ইহা আপনাকে আপনি জানে না ; কখন কখন, বিশ্বপ্রকৃতির ও জীবনক্ষেত্রের মহান্ দৃশ্যসমূহ দেখিয়া মানুষের হৃদয় হইতে এই ভাবটি উচ্ছ্বাস-বাক্যরূপে স্বতঃ বাহির হইয়া পড়ে ; কখনও বা তাহার নীরব আত্মার মধ্যে নিস্তব্ধ ভাবে সমুত্থিত হয়। এই আরাধনার ভাষায় ভ্রান্তি হইতে পারে, আরাধনার পাত্রসম্বন্ধেও ভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু আসলে ইহা সেই একই জিনিস। ইহা আত্মার একটা স্বতোনিসৃত অনিবার্য্য আবেগ। তাহার পর, যখন ইহার প্রতি বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, তখন আমাদের বুদ্ধি ইহাকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া প্রতিপাদন করে এইমাত্র। যখন আমরা ভাবি, তিনি পবিত্রস্বরূপ, তিনি আমাদের কার্য্য ও মনোগত অভিপ্রায় সকলই জানিতেছেন, এবং তিনি পরম ন্যায়ানুসারে আমাদের সেই সকল অভিপ্রায় ও কার্য্যের বিচার করিবেন,—তখন তাঁহার সেই বিচারকে ভয় করা অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত আর কি হইতে পারে ? আবার যিনি পূর্ণমঙ্গল, যিনি সমস্ত প্রেমের প্রস্রবণ, তাঁহাকে প্রীতি করা অপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত আর কি হইতে পারে ? গোড়ায়, আরাধনা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; পরে বুদ্ধি তাহাকে কর্ত্তব্যে পরিণত করে, কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এইমাত্র।

আরাধনার যে প্রবৃত্তিটি, আত্মার নিভৃত মন্দিরে অধিষ্ঠিত, তাহাই আভ্যন্তরিক আরাধনা, তাহাই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি।

যে হিসাবে, জনসমাজ, রাজ্যশাসনতন্ত্র, ভাষা ও শিল্পকলাদি মানুষের স্বেচ্ছাসাপেক্ষ—সামাজিক উপাসনা-প্রণালী তাহা অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে। এই সকল ব্যাপারের মূল, মানব-প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। আরাধনার প্রবৃত্তিটিকে যদি তাহার নিজের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, হয়—উহা নিষ্ফল ধ্যানে ও উন্মত্ত ভাবের উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়া সহজেই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, নয়—সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও দৈনন্দিন প্রয়োজন-সমূহের প্রবল প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া যায়। আরাধনার আবেগ যতই প্রবল হয় ততই উহা কতকগুলি ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। তখন আরাধনা একটা প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়মিত আকার ধারণ করিয়া, যে হৃদয়ভাব হইতে গোড়ায় উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হৃদয়-ভাবের দিকে আবার ফিরিয়া যায়। তখন আরাধনার প্রবৃত্তিটা একটু নিদ্রালু হইলে, আরাধনার সেই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলে; ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে; এবং দুর্ব্বল ও নিরঙ্কুশ কল্পনা-প্রসূত সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হইতে উহাকে রক্ষা করে। অতএব দর্শনশাস্ত্র, আভ্যন্তরিক আরাধনার ক্ষেত্রেই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির স্বাভাবিক ভিত্তি স্থাপন করে।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্র পরমার্থবিদ্যার স্থান দখল করিয়া বসিবে, দর্শনশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে; দর্শনশাস্ত্র আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া, স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। সে উদ্দেশ্য কি?—না, যাহা কিছু মানুষকে উন্নত করিতে পারে, তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাহার সহায়তা করা।